লীলাদেবী

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড এলাহাবাদ

১৯২২

মূল্য ২৲ টাকা

প্রকাশক

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ

প্রাপ্তিস্থান :—

১। ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, লিমিটেড—এলাহাবাদ।

২। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্,
২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

২২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত
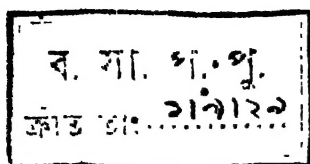
উৎসর্গ-পত্র

আমার

এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থখানি

শ্রদ্ধা-ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপে

মদীয় শিক্ষাগুরু

রাজসাহী বি, এন এক্যাডেমীর সুযোগ্য অধ্যাপক,

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কাব্যতীর্থ মহাশয়ের

করকমলে

উৎসর্গ

করিলাম।

নিবেদন

মহাস্থান-রাজকুমারী শীলাদেবীর স্মৃতি রক্ষাই গ্রন্থখানির মূল উদ্দেশ্য। প্রচলিত ইতিহাস ও অন্যান্য জন-প্রবাদ অবলম্বনে "শীলাদেবী" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম,— সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিলাম কি না বলিতে পারি না। ইহার পরে যদি বরেন্দ্র-ভূমির অন্যান্য রত্নগুলির পুনরুদ্ধারের সূচনা হয় তাহাহইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

বিপ্রবোয়ালিয়া
রাজসাহী।
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯।

শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী

চিত্র-সূচী

শীলাদেবী

প্রথম খণ্ড

শীলাদেবী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সিংহিনী

দিবা দ্বিপ্রহর। নিবিড় অরণ্য-পথে, এক অশ্বারোহী ধীরে ধীরে অশ্বচালনা করিতেছেন। অশ্বারোহীর শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন তপ্তকাঞ্চননিভ গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল পথশ্রমজনিত পরিশুষ্ক ও ম্লান। অসি চর্ম্ম অঙ্গত্রাণে অশ্বারোহী বীর-বেশে সজ্জিত। মস্তকে লৌহনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ, তদুপরি বহুমূল্য উষ্ণীষ। আবার এ কি? মণিমুক্তাখচিত সুদৃপ্ত বেণী সর্পাকারে পৃষ্ঠদেশে দোদুল্যমান কেন? অবয়ব নিরীক্ষণ করিয়া অশ্বারোহী পুরুষ কি স্ত্রী বুঝিতে পারা যাইতেছে না কেন? যাহাই হউক অসময়ে এ-হেন দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য-পথে অশ্বারোহী কোথায় চলিয়াছেন?

অশ্ব আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইল। অদূরে বনমধ্যে, দক্ষিণে কি বামে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। অশ্বারোহী স্তম্ভিত

পাইলেন, বনান্তরাল হইতে কে বলিতেছে—আর না, আর এক পদ অগ্রসর হইবেন না, ঐখানে অশ্বের গতি সংযত করুন।

—কে তুমি?

—পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। মহাস্থান রাজকুমারি! আপনি মহাস্থান-রাজের অধিকার-সীমা ছাড়াইয়া আসিয়াছেন—লাল পতাকা অতিক্রম করিয়াছেন।

—লাল পতাকা কি?

—দেবী খাল্‌তেশ্বরীর বিজয়-পতাকা। এই বনরাজ্যের অধীশ্বর মায়ের চিরাকঙ্কর বিজয় সিংহ।

—ওঃ, এতক্ষণে বুঝিয়াছি দস্যুপতি বিজয়ের এই আড্ডা; পাপ সহচরগণ-পরিবৃত ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার এই বনে অবস্থান করে। তুমি কি ধনলোভে আমার অনুসরণ করিয়াছ? ভ্রম,—আমার সঙ্গে ধনরত্ন কিছুই নাই।

—ক্ষমা করিবেন রাজকুমারি! আমরা ধনের প্রার্থী নই। আপনি লাল-পতাকা অতিক্রম করিয়াছেন,—সন্ধিবন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, তাই আপনাকে বন্দী করিতে আসিয়াছি।

—কেন? অসহায়া বলিয়া? বেশ সুযোগ পাইয়াছ,—যাও তোমার দস্যুপতিকে পাঠাও, তুমি সামান্য অনুচরমাত্র, শীলাদেবীকে বন্দী করিবার মত বল তোমার সামান্য দেহে নাই।

—দেবি! পাঠাইতে হইবে না—আমিই বিজয় সিংহ।

এক সশস্ত্র যোদ্ধ, পুরুষ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া অশ্বের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

রাজকুমারী কহিলেন—তুমি বিজয় সিংহ? দস্যুরাজ! আমি সঙ্গিহীন হইয়া, পথভ্রমে এই পথে আসিয়া পড়িয়াছি। একাকিনী পাইয়া রমণীর উপর বীরত্ব দেখাইতেছ? এ তোমার কেমন বীরপণা!

—ক্ষমা কর রাজকুমারি! বিজয় সিংহ কাপুরুষের মত তোমার গৌরবের—মর্যাদার হানি করিতে আইসে নাই। তুমি বারেন্দ্র রমণী-কুলের শীর্ষস্থানীয়া, রূপে গুণে লোকললামভূতা, শৌর্য্যে বীর্য্যে জগতে অতুলনীয়া। তোমার খ্যাতি, তোমার গৌরব শুনিয়া, তোমার ঐ দেবী-মূর্ত্তি মনে মনে নিয়ত ধ্যান করি।

—তবে আমার পথরোধ করিলে কেন? আমায় বন্দী করিতে চাহিলে কেন?

—মার্জ্জনা করিয়ো দেবি! আমার সাধ্য কি তোমায় বন্দী করি। কেবল আতিথ্যধর্ম্ম পালনার্থ এইটুকু কষ্ট দিতেছি। মায়ের প্রাঙ্গণে আসিয়া অভুক্ত ফিরিয়া যাইবেন?

—মায়ের চরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম। কিন্তু দস্যুরাজ! মহাস্থান-রাজকুমারী কখনও পরস্বাপহারী দস্যুর অন্ন গ্রহণ করিবে না।

—আমার অন্ন নয়—দেবী অন্নপূর্ণার অন্ন।

—হউক, কিন্তু অধর্ম্ম-অর্জ্জিত।

—না, বীরের বীরত্ব-লব্ধ অর্থে মায়ের সেবা হয়। মহাস্থান-রাজকুমারি! তোমার পিতা মহাস্থান-রাজ তাঁর রাজ্য নিরাপদে রক্ষার জন্য, দেবী থালুভেশ্বরীর নামে, বিজয় সিংহের করে, করস্বরূপ বহু অর্থ দান করেন।

—এ অতি-বড় স্পর্দ্ধার কথা। এই আমি চলিলাম, সাধ্য থাকে বিজয় সিংহ! আমার গতিরোধ কর।—এই বলিয়া রাজকুমারী শীলাদেবী অশ্ব-বল্গা ধারণ করিলেন এবং সজোরে অশ্ব-পৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন। অমনি চকিতে এক শর আসিয়া অশ্বের গ্রীবাদেশে আমূল-বিদ্ধ হইল। অশ্ব চীৎকার করিয়া ভূপতিত হইল। রাজকুমারীও এক লম্ফে ভূতলে অবতরণ করিয়া কহিলেন,—পশুবল প্রয়োগে

পশু হত্যা করা যায়, বিজয় সিংহ! পুরুষোচিত বীরত্ব দেখাও। দ্বৈত-যুদ্ধে, মহাস্থান রাজকুমারীকে পরাভূত কর।

—শীলাদেবি! অবলার উপর বল প্রয়োগের জন্য, বিজয় সিংহ অস্ত্র ধারণ করে নাই।

—তবে পথ দেখাইয়া দাও। আমায় যাইতে দাও।

—এস দেবি! এই দীনের কুটীরে পদধূলি দাও, মায়ের প্রসাদ গ্রহণ কর, দীনের পূজা সার্থক কর। আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হ'ক।

—বিজয় সিংহ! তাহ'লে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর: মহাত্মা পরশুরাম নরসিংহের শাসন-চ্ছত্রতলে, তোমার গৌরবময় মস্তক অবনত কর।

—বুঝিলাম, অপরাধ লইয়ো না। তাহ'লে এস শক্তিময়ি! দাসের শক্তিপরীক্ষা কর। শুন মহাস্থান রাজকুমারি! যদি পরাজিত হই, স্বেচ্ছায় মহাস্থানের আনুগত্য স্বীকার করিব। "জয় মা থাল্‌তেশ্বরী!" বিজয় সিংহ ঝন্ ঝন্ শব্দে অসি কোষমুক্ত করিলেন।

শীলাদেবী পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। উভয়ের অসি শন্ শন্ শব্দে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। বিজয় সিংহ সুনিপুণ যোদ্ধা; শীলাদেবী যত বার তাঁহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, বিজয় তত বারই অব্যর্থ কৌশলে সে আঘাত প্রতিহত করিতেছেন।

সুবিধাসত্ত্বেও রাজকুমারীর অঙ্গে বিজয় সিংহ আঘাত করিতেছেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রাজকুমারীর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে—দর দর ধারে শোণিত-প্রবাহ ছুটিতেছে; বিজয়ের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। শীলাদেবী তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন বিজয় সিংহ! এখনও ক্ষান্ত হও. পলে পলে তোমার জীবন বিপন্ন হইতেছে।

বিজয় সিংহ কহিলেন—দেবি! আমার বড় সৌভাগ্য। আজ আমার অস্ত্রশিক্ষা সার্থক। প্রাণ যায় যাউক, তবুও তোমার ঐ নবনীত-কোমল অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিব না।

তবে ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ কর, তোমার মৃত্যু সন্নিকট।

—মৃত্যু-ভয়ে ক্ষত্রিয়-সন্তান কাতর হয় না। কিন্তু নারীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিয়া, বীর নামে কলঙ্ক আরোপ করিব না। জয় মা খাল্‌তেশ্বরী!

কথার শেষ হইতে না হইতে, বিজয় সিংহ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলশায়ী হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত।

শীলাদেবী কহিলেন—ধন্য বিজয়! ধন্য তোমার সমর-কৌশল। পরাজিত বীর! এ বিজয়-গৌরব তোমার। চিররণজয়ী মহাবীর চিহ্লন তোমারই বাহুবলে পরাজিত! তোমার বীরত্বে, তোমার গুণে; কে না মুগ্ধ বিজয়? তোমার শক্তি পরীক্ষা করিয়া আমিও তোমার একান্ত পক্ষপাতিনী হইলাম।

অতঃপর রাজকুমারী অঙ্গাবরণীর মধ্য হইতে, একটী সুদৃশ্য কৌটা বাহির করিলেন এবং বিজয় সিংহের অচেতন দেহ নিকটস্থ কূপের নিকট লইয়া গেলেন। জল দিয়া অগ্রে ক্ষতস্থানগুলি ধৌত করিলেন। পরে কৌটা হইতে কি ঔষধ বাহির করিয়া ক্ষতস্থানগুলিতে উত্তমরূপে লেপন করিলেন। তার পর সেই সংজ্ঞাহীন দেহ, এক বৃক্ষতলে রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। অঙ্গাবরণী-মধ্য হইতে লেখনী, মস্যাধার বাহির করিলেন। শুষ্কপত্রে কত কি লিখিলেন এবং তাহা বিজয় সিংহের পরিধেয় বসনাঞ্চলে বাঁধিয়া দিলেন—স্বীয় অঙ্গুলি হইতে হীরকাঙ্গুরী খুলিয়া লইয়া, বিজয় সিংহের অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলেন। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, একটী বৃক্ষের সহিত, শ্বেত অশ্ব বাঁধা। রাজকুমারী আর কাল-বিলম্ব না করিয়া, সেই অশ্বে আরোহণ করিলেন। সেই বনপথে অশ্ব তীরবেগে ছুটিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওগো, ইট-পাথর কুড়াই কেন? সেই পুরাতন স্মৃতিখানির দাগ লেগে আছে বলে'? শুষ্ক মরুভূমি দেখে, সাগরের স্বপ্ন দেখি কেন? ঐ ধূ ধূ মরীচিকা কি তার, তরঙ্গের রঙ্গ-ভঙ্গ আমার প্রাণে নাচাইয়া দিতেছে?

করতোয়ার তটভূমির উপর ঐ ইষ্টক-প্রস্তরের স্তূপরাশিতেই কি, ধনজনপূর্ণ গড় মহাস্থাননগরী বিদ্যমান ছিল! হায় ধনী! তোমার ঐশ্বর্য্যের স্মৃতি কি এইরূপ প্রস্তরখণ্ড, অথবা ইষ্টক-স্তূপেই বিদ্যমান? মহারাজ পরশুরাম! তোমার অতীত গৌরবের নিদর্শন, মহাস্থান গড আজ হিন্দুর মহাতীর্থ।

বগুড়ার কয়েক ক্রোশ দূরে এই গড়ের ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীরও বহু পূর্ব্বে গৌড়াধীপ ধর্ম্মপালের ভ্রাতা, বাক্‌পালের অধস্তন অষ্টম পুরুষ, সম্রাট্ জয়পাল দেবের অধীনে ভোজ গৌড়বংশীয় মহাসামন্ত পরশুরাম নরসিংহ মহাস্থানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালে তিনি দ্বাদশ জন সামন্ত নৃপতির উপর, আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য মহাসামন্ত আখ্যায় ভূষিত হন। সেনরাজগণের অভ্যুত্থান হওয়ায় ক্রমাগত যুদ্ধে সম্রাট্ জয়পাল দেব হীনবল;—সুতরাং মহাসামন্ত পরশুরাম একপ্রকার সমগ্র বরেন্দ্র ভূমিই আপন শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। নামেমাত্র গৌড়াধীপের অধীনে, অথচ এক প্রকার স্বাধীন ভাবেই তিনি গড় মহাস্থানে রাজত্ব করিতেন।

এই মহানগরীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে স্কন্দ ও গোবিন্দ নামে দুইটী দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিগ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ন্যূনাধিক দশক্রোশ পরিমিত

স্থান মহাস্থাননগরী নামে আখ্যাত হইত। মহারাজ পরশুরামের রাজত্ব-কালে মহাস্থাননগরীর শোভা ও সমৃদ্ধি দশগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। এই নগরীর মধ্যভাগে অবস্থিত দুই ক্রোশেরও অধিক, সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীর ও পরিখাদিবেষ্টিত রাজপুরী বা মহাস্থান গড়। রাজপুরীর পূৰ্ব্বদিকে প্রাচীরের পাদমূল ধৌত করিয়া পুণ্যতোয়া করতোয়া প্রবাহিতা। করতোয়ার পূর্ব্ব নাম বাঘমতী। বাঘমতী এইখানে দক্ষিণবাহিনী। করতোয়ার তীর বাহিয়া তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে একটী প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূৰ্ত্তি স্থাপিত। ঐ মূৰ্ত্তি গোবিন্দদেব। মন্দিরটী ঠিক করতোয়ার তীরভূমিতে স্থাপিত। মন্দিরের নিম্নেই বাধাঘাট—সোপানশ্রেণী ক্রমশঃ করতোয়ার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। করতোয়ার চপলা তরঙ্গবালাগণ যেন ঐ সোপানশ্রেণীতে নাচিয়া পড়িত; আবার ছুটিয়া পলাইত। অধুনা তাহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান; মন্দিরের চিহ্নও নাই। গোবিন্দ মন্দির হইতে অল্পদূর গেলেই নিবিড় অরণ্য। এই অরণ্য করতোয়ার তীর ব্যাপিয়া চারি পাঁচ ক্রোশ পরিমিত স্থান বিস্তৃত। এই মহারণ্য পূর্ব্বকালে 'গুপ্তবৃন্দাবন' নামে খ্যাত ছিল।

প্রায় ৮৭৬ বৎসর পূৰ্ব্বে কোনও এক সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে দুই ব্যক্তি এই বন হইতে বহির্গত হইল ও গোবিন্দ-মন্দিরের সন্নিহিত অশ্বত্থ বৃক্ষ-তলে উপবেশন করিল। আকার দেখিলে উভয়কেই সৈনিক পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। উভয়েই যুবক, উভয়েরই কটিদেশে কোষ-নিবদ্ধ অসি, হস্তে সুদীর্ঘ বর্শা, লোহ বর্ম্মে অঙ্গ আবৃত। একজনের বর্ণ গৌর, মুখমণ্ডল বীরত্বব্যঞ্জক। অপরের শ্যাম শান্ত মুখমণ্ডল, সুদীর্ঘ চিক্কণ কেশদাম, অনাবৃত মস্তক।

অল্পক্ষণ বিশ্রামান্তে সুন্দর উষ্ণীষধারী গৌরবর্ণ যুবক সহচরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—কিছু বুঝিতে পারিলে কি?

—কিছুই বুঝি নাই।

—তবে শোন মোরাদ দুই বন্ধু একত্র হইয়া কেন আজ গড় মহাস্থানে পদার্পণ করিলাম। আমি আজ আত্মসমর্পণ করিব,—আমি আজ বন্দী হইব।

স্বেচ্ছায়,—কাপুরুষের মত?

—না, যার ইচ্ছায় দস্যুতার চিরকলঙ্ক ললাটে লেপন করিয়াছি—তারই ইচ্ছায়। অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে যার ইচ্ছা চিরজাগরূক সেই খাল্‌তেশ্বরার ইচ্ছার বিজয় সিংহ আত্মসমর্পণ করিবে।

প্রয়োজন?

রাজ্যের হিত—মানব-সমাজের মঙ্গলসাধন।

উত্তম। তুমি কায়া—আমি ছায়া। তোমার মঙ্গলে আমার মঙ্গল। তুমি যদি মরিতে চাও রাজা! আমি তোমার অন্নে পালিত দেহ তোমারি জন্য বিসর্জন করিব।

প্রাণ অতি তুচ্ছ মোরাদ! তার চেয়েও মূল্যবান্ তোমার হৃদয়খানি। তোমার অনাবিল প্রীতির রাজ্যখানি যে আমায় দিয়াছ ভাই। আমি আমাদের জন্য কিছুই করি নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম যা কিছু করিয়াছি সব রাজ্যের জন্য। আমাদের কার্য্যে মানবসমাজের কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণ সাধিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে অরাজকতা—দীন আর্ত্তের করুণ ক্রন্দনে অশান্তির দাবানল জ্বলিয়া উঠিতেছে। আত্মবিরোধপরায়ণ সামন্ত-রাজগণ যুদ্ধ-বিগ্রহে রাজাটা ছারেখারে দিতেছে। রাজার সহিত একত্র হইয়া সামন্তরাজগণকে দমন করিয়া রাজ্যে শান্তিসংস্থাপন মানবমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

—আমরা ক্ষুদ্রশক্তি, সমগ্র সামন্তরাজগণকে দমন করা কি আমাদের সাধ্য?

—বীর! চিন্তিত হইয়ো না। একমাত্র সিংহদর্শনে অজকুল যেমন সন্ত্রস্ত হয়, ভীরু সামন্তরাজগণও তদ্রূপ আমাদের প্রতাপে নতশিরে

থাকিবে। তুমি কি জান না মোরাদ! বিজয় সিংহ আর মীর্জ্জা মোরাদের নামে সমগ্র বরেন্দ্র-ভূমি থরথর কম্পিত।

—সত্যই খালতাপতি। এ প্রদেশে আর বীর নাই।

—বীর নাই কেন, আছে! ভাই ভাইয়ের বুকে—পিতা পুত্রের,—পুত্র পিতার কণ্ঠে ধনলোভে ছুরি বসাইতে পারে এমন বীর অনেক আছে। রাজ্যের যে অবস্থা, তাহাতে এই সব রাজারা এখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে স্বরাজ্য রক্ষায়ও সমর্থ নয়।

—বৃদ্ধ রাজা শক্তিহীন, রাজকর্ম্মচারিগণ উচ্ছৃঙ্খল, ধনলোভী। আমরা যদি রাজকার্য্যে আত্মনিয়োগ করি রাজ্যের মঙ্গল হইবে। রাজ্যময় অত্যাচার অনাচারের স্রোত দমন হইতে পারে।

—তাহা হইলে বন্ধু! চল, আমরা মহাস্থান-রাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়া মানবসমাজের মঙ্গল সাধন করি।

—তুমি যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবে, আমার তাহাই কর্ত্তব্য।

—আমার কর্ত্তব্য, প্রতিজ্ঞাপালন; এই দেখ ভাই! শুষ্ক পত্রে রাজকুমারী শীলাদেবীর স্বহস্তলিখিত আদেশ-লিপি।

মোরাদ সেই লিপি পাঠ করিয়া বলিলেন—এ ত আদেশ-লিপি নয়, প্রণয়-লিপি; আর অঙ্গুলির ঐ হীরকাঙ্গুরীয়ক প্রেমের অভিজ্ঞান।

বিজয় সিংহের বদনে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া চকিতে মিলাইয়া গেল। কহিলেন—আকাশকুসুম কল্পনা কেন বন্ধু! সে অমূল্য রত্ন রাজগৃহ উজ্জ্বল করিবে—দরিদ্রের কুটীরে তাহা শোভা পাইবে কেন ভাই! আর রহস্যালাপের সময় নাই। যোগিনী মাতা আসিয়াছেন, এইখানেই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব। তুমি যাও, তাম্রদ্বারে আমার জন্য অপেক্ষা করিও। আমি তাঁহার পদরেণু ও আশীর্ব্বাদ লইয়া শীঘ্রই ফিরিতেছি।

উভয়ে উঠিয়া বিভিন্ন গন্তব্য পথ ধরিলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাতা পুত্র

নিবিড় অন্ধকার; সেই অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া, দানবের মত মস্তক উত্তোলন করিয়া, গোবিন্দ-মন্দির দণ্ডায়মান। গগনে অগণিত তারকা, নীলশাড়িতে সোনার চুম্‌কির মত দীপ্যমান। মৃদু পবন-হিল্লোলে বৃক্ষপত্ররাজি ঈষৎ আন্দোলিত। চপলা করতোয়া এখন কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত—মৃদু মৃদু তরঙ্গ তুলিয়া ধীরে বহিয়া যাইতেছে। দেবতার সন্ধ্যারতি সমাপনান্তে পুরোহিত ও দেবদাসীগণ চলিয়া গিয়াছে। এখন এই বিজন দেবমন্দির নীরব। নিকটেই মহাশ্মশান, ভূতের ভয়ে রাত্রিকালে কেহ এই দিকে আইসে না। রাত্রি অর্দ্ধপ্রহর অতীত। সহসা এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, শ্মশানের কোন্ অজানা দিক্ হইতে, রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত ওঙ্কার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। অন্য দিক হইতে শব্দ হইল—"মা!"

দূর হইতে উত্তর আসিল,—আসিয়াছ বৎস! সন্তান! ভাবিলাম, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়াই রাজধানীতে গিয়াছ। আবার ভাবিলাম, হয় ত তুমি আমায় ভুলিয়াছ।

পু—ভুলি নাই মা। কেমন করিয়া ভুলিব? যে দিকে নয়ন ফিরাই, সে-দিকেই যে তোর করুণার ছবিখানি দেখি। পল্লীর বিজন কুটীরে চাহিয়া দেখি, তোর করুণার হস্ত দুখানি সন্তানের ক্ষুধা নিবারণে নিযুক্ত। সাবিত্রী! দেবীরূপিণী মা আমার, কোথাও দেখি, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখার মত মৃতকল্প পতির দেহে, তোর সেবা-যত্নে প্রাণ ফিরিয়া আসিতেছে। আবার দেখি, আশ্রয়হীনা গৃহহীনা মা তুই, শিশু সন্তান বুকে

দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিস্! আবার দেখি, ঐশ্বর্য্যময়ী দুঃখকাতরা দেবী মূর্ত্তিতে করুণার হস্ত দুখানি পরদুঃখ-মোচনে নিরত রাখিয়াছিস্। ঐ যে দেখি, হাস্যময়ী আনন্দময়ী মা,—সবুজ সাড়ী পরিয়া পাগল হাওয়ার তালে তালে, তরঙ্গিণীর কলরোলে গান গাস্, আবার দেখি, মহাশ্মশানে ভীমাভৈরবী-বেশে রুদ্রতালে নেচে বেড়াস্। মা—মা আমার, ভুলি নাই মা! তোর স্নেহ, তোর করুণা, আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা। অযোগ্য সন্তান, ভক্তিহীন আমি, তাই কি মা সন্তানকে ফেলে দূরে চলে' যাস্। ভক্ত নই সাধক নই,—কাঙ্গাল আমি,—কেবল অশ্রুধারায় তোর পাদপদ্ম পূজা করি। তাই কি মা, আঁধারে লুকাস্? আমি মাতৃহীন সন্তানের মত মা মা বলে' সারা বিশ্ব খুঁজে বেড়াই। দেবী আমার—জননী আমার—গৌরব আমার—হৃদয়-পদ্মে জাগো মা!

—ভক্ত! পুত্র! উঠ, দাঁড়াও। ঐ দেখ সম্মুখে কর্ম্মক্ষেত্র। সন্তান! আলস্য করিয়ো না। নরসিংহের পুণ্যরাজত্বে, পাপ শতবাহু বিস্তার করিয়াছে। দেবমন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট, বিলাস-পঙ্কে মহাস্থান মগ্নপ্রায়। চৌর্য্যে লাম্পট্যে পুরুষ পৌরুষ হারাইতেছে—আর শক্তিময়ী নারী—কি ঘৃণার কথা—শক্তিহীনা, আচারভ্রষ্টা, ব্যাভিচার-দোষ দুষ্টা। মহাস্থানরাজ আত্মবিরোধে শক্তিহীন। ঐ শোন, নিরন্ন প্রজাগণের শ্রবণভেদী হাহাকার—ঐ শোন, অত্যাচারীর পদতলে নিষ্পেষিত আর্ত্তের করুণ ক্রন্দন। বিজয়! বাপ আমার! এই মাৎস্যন্যায়পূর্ণ মহাস্থানে কি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না?

—হবে না কেন মা! হৃদয়ে শক্তি দাও—যে-শক্তিতে প্রকৃত পুরুষত্ব জাগিয়া উঠে; মনে বল দাও—যে-বলে অসাধু অত্যাচারী দলিত হয়।

—বিজয়! শোন, বৃদ্ধ মহাস্থানরাজ তোমাদের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন। রাজার সাহায্য কর—দেশ হইতে অশান্তির অনল নির্ব্বাপিত কর।

—আশীর্ব্বাদ কর মা! এই অযোগ্য সন্তান প্রাণ দিয়াও যেন মায়ের আদেশ পালন করে।

—বৎস! পুনঃপুনঃ কুঠারাঘাতে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ হইয়া আসিতেছে। একবার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল সংঘর্ষে সনাতন ধর্ম্ম লুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। এখনও বরেন্দ্রভূমির পবিত্র দেবমন্দিরের উপর বৌদ্ধদিগের মঠ, সংঘারাম মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান। যদি ভোজবংশ প্রবল না হইত, তাহা হইলে হয়ত বরেন্দ্রভূমি হইতে সনাতন ধর্ম্ম লুপ্ত হইত। মহমুদের অত্যাচার-ভীতি এখনও দেশ হইতে অপসারিত হয় নাই। বহু ভগ্ন দেবমন্দির এখনও সেই অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। আর আত্মবিরোধে শক্তি ক্ষয় করিয়া কাজ নাই। প্রাণপণে মহাস্থানরাজের সাহায্য কর; শান্তেশ্বরী তোমার মঙ্গল করিবেন।

—মা! প্রণাম গ্রহণ কর। আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার যোগ্য সন্তান হইতে পারি।

—মোরাদ কোথায়?

—আমার সঙ্গেই মহাস্থানে আসিয়াছে।

—দুষ্ট ছেলে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎও করিল না।

—না মা! মোরাদ তোমার তেমন ছেলে নয়। ধন্য মা, তোর পালিনী শক্তি। মা! তুমি যাকে পালন করেছ সে ছেলে কি দুষ্ট হয়? অথবা যাহাকে বেশী ভালবাস, তাকেই তুমি স্নেহবশে দুষ্ট ছেলে বল।

—বিজয়! বাপ আমার। মোরাদকে ভাইয়ের মত দেখিয়ো। ভুলিয়াও যেন ঘৃণা অশ্রদ্ধা করিয়ো না।

—না মা! তেমন বন্ধুত্ব—তেমন অনাবিল ভ্রাতৃস্নেহ আর বুঝি জগতে পাব না। সদ্গুণের আধার করিয়া তুমি তাহার হৃদয় গঠন করিয়াছ।

—বাবা বিজয়! মোরাদ আমার কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে। স্তন্য প্রাপ্তি অবধি সে তোমার মত আমাকেই মা বলিয়া জানে। মোরাদকে সঙ্গে লইয়া কাল রাজদরবারে রাজ-সাক্ষাৎ করিয়ো। আমি আজই খাল্‌তায় ফিরিয়া যাইব। তোমরা দুইজনে রাজ-অতিথিশালায় নিশা যাপন করিয়ো।

—তাহ'লে আসি মা।

বিজয় সিংহ গাঢ় অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া কোথায় দাড়াইয়াছিলেন। তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিভূষিত, ললাটে রক্তবর্ণ ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র, শাণিত ত্রিশূলধারিণী এক ভৈরবী মূর্ত্তি বাঁধা ঘাটের সর্ব্ব নিম্ন সোপান হইতে ধীরে ধীরে উপরে উঠিল ও গাঢ় অন্ধকারে কোন্‌দিকে মিলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কমলার বাটী

মহাস্থান গড়ের পূর্ব্বদিকে সমুচ্চ শ্বেতপ্রস্তরবিনির্ম্মিত তোরণদ্বার। এই তোরণ তাম্রদ্বার নামে খ্যাত। তাহার সম্মুখে ঠিক করতোয়ার তীর-ভূমির উপর দিয়া প্রশস্ত রাজপথ ক্রমশঃ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। এই তাম্রদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিলে করতোয়ার পর পারে যে একটী দ্বিতল মর্ম্মর প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রসিদ্ধ দেবনর্ত্তকী কমলার বাটী। মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার মত কমলা রূপে-গুণে অতুলনীয়া। ঐ মর্ম্মর প্রাসাদ হইতে তাহার প্রভূত বিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। কমলা নৃত্য-গীতে তাৎকালিক দেবনর্ত্তকীগণের মধ্যে প্রধানা ছিল।

রাজা কিংবা রাজপুরুষগণের চিত্তবিনোদন ও কোন দৈব উৎসবে নৃত্য গীত ভিন্ন ইহারা সাধারণ ভাবে কোথাও নৃত্যগীত করিত না—এইজন্য পূর্ব্বে ইহাদিগকে দেবনর্ত্তকী বলিত।

একদিকে যেমন কমলার রূপগুণের খ্যাতি, তেমনি চরিত্র সম্বন্ধেও বেশ সুনাম ছিল। মহাস্থাননগরীর অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও ইহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে নাই। লোকে বলিত, কমলা কোন ভদ্রবংশসম্ভূতা; কোন অজ্ঞাত কারণে এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাহার প্রকৃত পরিচয় কেহই অবগত ছিল না।

কমলার মর্ম্মর বাটিকার সম্মুখে মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহাতে যাতি যূথি গোলাপ বেল প্রভৃতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিকে অপূর্ব্ব সৌরভের উৎস ছুটাইত; বর্ণিত আখ্যায়িকার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন এক সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক সুন্দরী পূর্ণাবয়বসম্পন্না যুবতী সাজি-হস্তে ধীরে ধীরে সেই উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল। যুবতীর গায়ের রং দুধে আলতায় গোলা, অধরপুট তাম্বূলরাগরঞ্জিত, পরিধানে একখানি নীল সাড়ী। মণিবন্ধে দুই গাছা হীরক বলয়, বেশ-ভূষার তাদৃশ পারিপাট্য ছিল না। এই সামান্য বেশভূষাতেই যুবতীর রূপলাবণ্য সমধিক বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। এই রূপলাবণ্যশালিনী যুবতী নৃত্যগীত-কুশলা কমলা। কমলা স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করিতেছে, আর আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে।

এমন সময়ে পরিচারিকা তাহার হস্ত হইতে সাজি কাড়িয়া লইয়া বলিল—ঠাকুরাণি! যদি স্বহস্তে ফুল তুলিবেন তবে আমরা আছি কেন?

পরিচারিকা ফুল তুলিতে লাগিল। কমলা একবার উদাস-করুণ দৃষ্টিতে করতোয়ার নীল বারিরাশির পানে চাহিল। একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি পরপার হইতে তাহার বাড়ীর পানে বাহিয়া আসিতেছে দেখিয়া

কমলার রক্তিম অধরে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে হৃষ্টমনে পরিচারিকার হস্ত হইতে সাজি লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। তখন সন্ধ্যার আঁধার একটু ঘনাইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ডিঙ্গিখানি কমলার বাটীর সম্মুখস্থ বাঁধাঘাটে আসিয়া ভিড়িল। এক ভদ্রবেশধারী যুবক ঘাটে অবতরণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে কমলার বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

যুবকের পরিধানে সামান্য সাদা ধুতি, গায়ে একটী জরির কোর্ত্তা। পায়ে এক জোড়া লপেটাদার জুতা। যুবক দ্বার-প্রান্তে আসিয়া দাড়াইলে পরিচারিকা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

দ্বিতলে একটা সুন্দর সুপ্রশস্ত কক্ষ। কক্ষতল বহুমূল্য গালিচায় মণ্ডিত। এক দিকে দুগ্ধফেননিভ শয্যা, আর এক দিকে কারুকার্য্যময় বিচিত্র আসন সারি সারি সজ্জিত। শয্যার এক পার্শ্বে স্বর্ণময় তাম্বুলাধারে তাম্বুল। প্রাচীর গাত্রে স্বর্ণ ফ্রেমে আবদ্ধ নানা দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি। একটা রৌপ্যনির্ম্মিত দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছে। শয্যার একধারে সুবর্ণনির্ম্মিত পুষ্পাধারে সদ্য-প্রস্ফুটিত পুষ্প গুচ্ছ—সৌরভে কক্ষ আমোদিত।

পরিচারিকা যুবককে এই গৃহে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে বলিয়া কমলাকে ডাকিতে গেল। যুবক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘটিকা পরে কমলা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

এখন তাহার মূর্ত্তি আর একরূপ। বহুমূল্য মণিমুক্তাখচিত আভরণে সর্ব্বাঙ্গ সুসজ্জিত। পরিধানে গোলাপী রঙের শাড়ী। করাঙ্গুলিতে তিন চারিটী, হীরকাঙ্গুরীয়ক। বেণী সর্পাকারে পৃষ্ঠোপরি লম্বিত—তাহাতে সারি সারি মুক্তা ঝল্‌মল্ করিতেছে। এখন কমলার রূপ দেখিলে কবি-বর্ণিত অপ্সরাগণের কথা মনে পড়ে। সে মূর্ত্তির দিকে চাহিতে পারা

যায় না—চক্ষু ঝলসিয়া যায়। যুবক ক্ষণকাল কমলার মুখপানে চাহিয়া অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইয়া কহিলেন -কেন ডাকিয়াছ ?

—মুখ ফিরাইলে কেন ?

যুবক কমলার মুখ পানে চাহিলেন – সে চাহনি চঞ্চলতার লেশবর্জ্জিত। স্থির প্রতিজ্ঞার চিহ্ন যুবকের বদনমণ্ডলে দেদীপ্যমান।

—মুখ ফিরাই নাই। তোমার ঘরখানির সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলাম।

কমলা একবার বলিতে চাহিল ঘরের চেয়ে আমার সৌন্দর্য্য কি বেশী নয় ? মনোভাব গোপন করিয়া বলিল—কতদিন—কতদিন পরে—যদি দাসীকে ধন্য করিতে আসিলে তবে মুখ ফিরিয়া থাকিবে কেন ?

—জান ত, আমি বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না, স্বীকৃত হইয়াছিলাম, তাই তোমার অনুরোধ রক্ষার্থে আসিয়াছি। যদি কিছু বলিবার থাকে—বল।

—বল, বিনাদোষে কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ ?

—আবার সেই কথা ? তুমি কুহকিনী—তোমার প্রতি কথায় কুহক-জড়ানো। আবার আমায় ভুলাইতে চাও ? আমি সাধ্যমত তোমা হইতে দূরে থাকি। তোমার ছায়া স্পর্শ করিতেও মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়।

—কেন, আমি তোমার কি করিয়াছি। ধর্ম্ম জানেন, বিধাতা জানেন, আমার মনে কি আছে! ভ্রমেও কখনও পাপ-চিন্তা আমার মনে আইসে নাই।

—প্রাণ হ'তেও তোমায় ভালবাসিতাম - তুমি যথেষ্ট প্রতিদান দিয়াছ। আর কেন ?

—তুমি বড় ভুল করিয়াছ। তোমার একটা ভুলে আমি সমস্ত জীবন পুড়িয়া মরিতেছি! আমাকে চন্দনের সঙ্গে একত্র দেখিয়া অমনি আমার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে—একটী কথা কহিবার সময়ও দাও নাই।

যুবকের মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—আগে যদি জানিতাম, সেইখানেই তোমার সব শেষ করিতাম। কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়াছ, তবু বল তোমার দোষ নাই!

—ঐ এক দোষে দোষী ভিন্ন, আমি অন্য দোষে দোষী নই। দেবতুল্য স্বামী তুমি, রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য তোমার, তোমার আদরে একমাত্র আদরিণী হইয়া ছিলাম। হতভাগিনী আমি ভাগ্য-দোষে সব হারাইলাম। তুমি জান না,—কেউ জানে না—হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও, আজিও আমার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক—তোমার চরণ-চিন্তাই আমার জীবনের সারব্রত। আমার এ হতাশ জীবনের ইহাই একমাত্র অতি-বড় সান্ত্বনা!

—উত্তম, ভোগ লালসা কি এতই প্রবল,—তার জন্য জগৎ-ভরা কলঙ্ক কিনিতে হয়!

—তোমার চরণে আমি ঐ মাত্র দোষে দোষী। কি করিব, এই নৈরাশ্যময় জীবনের ঐ একটা অবলম্বন। ঐ অবলম্বন লইয়া দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর। এতদিন গোপন রাখিয়া তুষানলে দগ্ধ হইতেছি। আজ সব খুলিয়া বলিয়া তোমার পায়ে আত্মসমর্পণ করিব।

—আমার চক্ষু যাহা দেখিয়াছে, তার উপরে নির্দ্দোষিতার প্রমাণ আর কি দিতে পার?

—তুমি ভুল দেখিয়াছ। শোন,—তোমার মনে সন্দেহ রাখিয়া মরণেও শান্তি পাইব না। চিহ্লন আমার সহোদর ভ্রাতা। মলদ্ দেশ আমাদের জন্মভূমি। হয়ত শুনিয়া থাকিবে,—মলদ্-রাজকুমার বীরসিংহ, গুপ্ত শত্রুর অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছেন। সেই গুপ্ত শত্রু আর কেউ নয়, আমার দাদা। যেদিন রাজকুমার নিহত হন, সেইদিন দাদা আমাকে লইয়া পলায়ন করেন। অনেক স্থান ঘুরিয়া শেষে, এই দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা নৌকাপথে আসিতেছিলাম। ঝড়ে

বুড়ীদহের নিকটে আমাদের নৌকাডুবি হয়। তার পর আমার অচৈতন্যা-বস্থায় তুমি আমায় উদ্ধার কর। তোমার কাছে সমস্ত পরিচয় গোপন রাখিয়া, কেবলমাত্র বলিয়াছিলাম, আমি ব্রাহ্মণকুমারী। কত ভালবাসা দেখাইয়া, ক্রমে তুমি আমার হৃদয় অধিকার করিলে—তার পর কিয়দ্দিন পরে আমায় বিবাহ করিলে। দাদার আর কোনও সংবাদই পাইলাম না। কয়েক বৎসর পরে, একদিন আমাদের আবাস-বাটীর ত্রিতলের ছাদ হইতে দেখিলাম, এক অশ্বারোহী সৈনিক—দেখিতে ঠিক আমার দাদার মত, রাস্তা দিয়া দ্রুত বেগে আসিতেছে। আগন্তুক নিকটস্থ হইলে দেখিলাম, সত্যই আমার দাদা। তুমি রাজবাড়ীতে গিয়াছিলে, আমি পরিচারিকা পাঠাইয়া দাদাকে একেবারে অন্তঃপুরেই ডাকাইয়া আনিলাম। যখন আমরা ভাই-ভগিনীতে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, তখন তোমাকে বাহিরে দেখিলাম। মনে ভয় হইল তুমি দেখিয়া পাছে দাদার কোনও অনিষ্ট কর; তাই ভয়ে-ভয়ে তাঁহাকে অন্য পথে বাহির করিয়া দিলাম। সেই দিন হইতেই আমার কাল হইল,—তুমি কেশাকর্ষণ করিয়া, আমায় বাড়ীর বাহির করিয়া দিলে—একটা কথা কহিবারও অব-কাশ দিলে না। আমি তোমার বহির্দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া কত কাঁদিলাম, কাতরস্বরে কত ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তুমি উত্তর দিলে, 'যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও। সাবধান, এ বাড়ীতে আর পদার্পণ করিয়ো না।' আমি কহিলাম, তুমি স্বামী, তুমি আমায় দূর করিয়া দিতেছ। আমার আর এ জগতে স্থান কোথায়? কে শুনিবে—কে উত্তর দিবে, তুমি আর সেখানে নাই। আমি অনেকক্ষণ সেইখানেই বসিয়া থাকিলাম। কত কি ভাবিলাম। একটা দুর্জ্জয় অভিমান আমাকে ঘিরিয়া বসিল। মনের বল হারাইলাম,—ভাবিলাম, হায়, মানুষের এই ভালবাসা! এত সহজেই মানুষ মানুষকে ভুলিতে পারে! যাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিয়া সোয়াস্তি পাইতে না, একটী কথা কহিবারও অবকাশ না দিয়া,

কুকুরের মত বিদায় করিয়া দিলে ! হৃদয়-তন্ত্রী বড় বেসুরো বাজিল। আমি তখন রাজপথ বাহিয়া চলিলাম। আমার পিতৃদেব সঙ্গীতব্যবসায়ী ছিলেন—আমায় তিনি অতি যত্নে নৃত্য-গীতবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, শেষে উহাই আমার জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন হইল। তুমি কত বার আমায় সত্যকথা জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পাও নাই। তোমার কাছে প্রকৃত পরিচয় খুলিয়া বলিতে কখন সাহস পাই নাই। আমার জীবন ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই তোমাকে সব খুলিয়া বলিয়া, হৃদয়-ভারের লাঘব করিব বলিয়া, তোমায় ডাকিয়া আনিয়াছি। সব শুনিলে,—এখন আমায় যে দণ্ড হয় দাও। কিন্তু এমন পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, পোড়াইয়া মারিয়ো না।

—অভাগিনি ! আগে খুলিয়া বল নাই কেন ? তোমায় তাড়াইয়া দিয়া আমি কি যাতনা পাই নাই ? আমি কি তোমার মত দগ্ধ হইতেছি না ? তোমার বুদ্ধিদোষে আমার সাধের সাজান বাগান শুকাইয়া গিয়াছে—আমার জীবন বিড়ম্বনাপূর্ণ হইয়াছে। সংসারী হইতাম, তুমি আমায় সন্ন্যাসী করিয়াছ। বুদ্ধি-দোষে যাহা হারাইয়াছ, আর এ-জনমে তাহা ফিরিয়া পাইবে না।

কমলা উত্তেজিত কণ্ঠে ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল—নিষ্ঠুর ! এই নিষ্ঠুর উত্তর শুনিতে তোমায় ডাকি নাই। এক কাজ কর, আমি সম্মুখে বসিয়া আছি—ঐ দেওয়ালের গায়ে একখানা তলোয়ার আছে—এই বুক পাতিয়া দিলাম !—কমলার বক্ষের বসন শ্লথ হইয়া পড়িল।

কমলার চক্ষু দিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল ; যুবক অঞ্চলে তাহা মুছাইয়া দিতে দিতে কহিলেন—প্রিয়তমে ! আজিও তোমায় ভুলি নাই ! কি করিব, ব্রাহ্মণ হইয়া একজন নর্ত্তকীকে কেমন করিয়া গৃহে স্থান দিব। আমার অবস্থা বুঝিয়া, তুমি আমায় ক্ষমা কর

—দেখ, তোমার গৃহের গৃহিণী হইবার সাহস আমার নাই। আমি তোমায় তা বলিতেছি না। দয়া করিয়া এক একবার চোখের দেখা দিয়ো।

—মহাস্থানরাজ-মন্ত্রিপুত্র পুণ্ডরীকের পক্ষে, তাহাও বড় লজ্জার কথা। হউক—তবুও ধর্ম্মপত্নী তুমি, তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব। রাজ-কার্য্যাবসানে দিনান্তে তোমায় একটীবার দেখিব। লোকলজ্জাভয়ে তোমায় একেবারেই পরিত্যাগ করিব না।

—না, তাহা হইবে না। আমার জন্য, তোমার চাঁদের মত নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ হইবে! আমি হয় মরিব,—না হয় এ-দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। তুমি যে সব শুনিলে, সব বুঝিয়া আমায় ক্ষমা করিলে, এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আর আমার নাই।

—না, তুমি মরিবে কেন? কাল তোমায় গৃহে লইয়া যাইব। এস কমলা, আবার তোমাকে লইয়া সংসার পাতাই।

—স্বামিন্! ইষ্টদেব! সংসারের সুখ চাই না। তুমি জন্ম জন্ম আমায় এমনি করিয়া ভালবাসিয়ো। আমি জন্ম জন্ম যেন তোমায় পতি পাই।

—তাহ'লে অতঃপর কি করিবে আমায় খুলিয়া বল।

—প্রাণেশ্বর! ভোগের মধ্যে তোমায় এ-জনমে পাইলাম না। তোমায় আমার করিতে আর একবার চেষ্টা করিব। আমায় পদধূলি দাও, হয়ত আর তোমায় দেখিতে পাইব না।

কমলা যুবকের পদধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিল। তার পর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, ঘাট পর্য্যন্ত আসিল। যুবক নৌকারোহণ করিলেন। নৌকা ধীরে ধীরে পারে পৌঁছিল। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ কমলা সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। যখন আর দেখা গেল না, তখন ধীরে ধীরে ভিতরে গমন করিল।

পরদিন হইতে সকলেই দেখিল,—দেবনর্ত্তকী কমলার আবাস-ভবন শূন্য। তদবধি অনেকদিন অতীত হইয়াছে, তাহার কথা লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। কেবল অমলধবল মর্ম্মর প্রাসাদ, নব আগন্তুক পথিকের উৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুই সখী

রাজান্তঃপুরের সম্মুখে বিচিত্র অট্টালিকা—তাহার চারিদিকে পুষ্পোদ্যান। এইটা রাজকুমারী শীলাদেবীর বিশ্রামভবন। অট্টালিকামধ্যস্থ এক সুন্দর সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে, বিচিত্র রৌপ্যমণ্ডিত খট্টায় সুকোমল শয্যায় এক ষোড়শ কি সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় পুস্তক পাঠ করিতেছেন; আর এক একবার খোলা জানালায় নীল আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন। পরিচারিকা চামর ব্যজন করিতেছে। এই যুবতী রাজকুমারী শীলাদেবী। পাঠক, অন্য এক মূর্ত্তিতে নিবিড় অরণ্য মধ্যে শীলাদেবীকে দেখিয়াছেন, এখন তিনি অন্য মূর্ত্তিতে। রাজকুমারী পরিচারিকার পানে চাহিয়া বলিলেন—মতিয়া! চঞ্চলা দেবীকে ডাক্।

কিয়ৎকাল পরে এক শ্যামাঙ্গী যুবতী দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। এই যুবতীর নাম চঞ্চলা। মতিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে দেখিয়া, রাজকুমারী ইঙ্গিতে তাহাকে বাহিরে যাইতে বলিলে মতিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। চঞ্চলা ব্রাহ্মণ-কুমারী—রাজকুমারীর প্রিয়-পাত্রী।

—অসময়ে অধিনীকে স্মরণ করিলে কেন?

—আজ তোমায় দণ্ড দিব।

—অপরাধ?

ক'দিন থেকে খবর নাওনি কেন?

—তুমি আমায় ছেড়ে মৃগয়ায় গিয়াছিলে কেন?

—ওঃ, সেই অভিমানে,—সেই খবর জানাইতেই তো, দুপুর বেলায় তোমায় ডাকিয়াছি।

—কিসের খবর!

—মৃগয়ার খবরটাও কি লইতে নাই?

—আমি সব খবর জানি!

—বল দেখি?

—শুনিলাম, দস্যুরাজ বিজয়কে যুদ্ধে হারাইয়াছ। সে নাকি তাহার সৈন্য-সামন্ত লইয়া আত্মসমর্পণ করিতে মহাস্থানে আসিতেছে?

—দেখিতেছি, একটা মিথ্যা জনরব রাজ্যময় রাষ্ট্র হইতেছে।

—তবে কি মিথ্যা কথা?

—কতকটা মিথ্যা বই কি? খালতা-পতি বিজয়, স্বেচ্ছায় মহাস্থানের অধীনতা স্বীকার করিতে আসিয়াছে!

—তুমি যদি যুদ্ধ কর নাই, সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত-চিহ্ন কেন?

শীলাদেবী হাসিয়া বলিলেন, তোমার কাছে মিথ্যা বলিব না। বিজয় সিংহকে বাহুবলে হারাইতে পারি নাই।

চঞ্চলা কটাক্ষ করিয়া বলিল,—তবে কি নয়ন-বাণে?

শীলাদেবী একটা ছোট রকমের কিল দেখাইয়া বলিলেন—তোমার সঙ্গে আজ হইতে আড়ি - আর কথা বলিব না।

—বলি বীরাঙ্গনা! এবারে কি সিংহ শিকার করিলে?

শীলাদেবী একটু চুপ করিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে গম্ভীরভাবে বলিলেন—হ্যা, কতকটা তাই বটে।

—আশ্চর্য্য তোমার শক্তি। মহাস্থান-সেনাপতি যাহার হস্তে লাঞ্ছিত, অপমানিত, তুমি তাহাকে কেমন করিয়া পরাজিত করিলে সখি?

—ঐ ত বলিলাম, আমি পরাজিত করি নাই।

—তবেই ত বলিতে হয়, প্রেমপাশে বন্দী করিয়াছ।

—যাহা ইচ্ছা, তাহাই বল—আমি আর উত্তর দিব না।

—রাজকুমারি! সিংহ শিকার কর, ব্যাঘ্র শিকার কর—একটা শৃগাল মারিতে পার না?

— কোন্ শৃগাল?

—কেন, তোমাদের বিশ্বস্ত সেনাপতি!

—সুবিধা পাইলেই তামাসা দেখিবার জন্য তাহাকে খাঁচায় পুরিব!

—আহা! সে সুদিন কবে আসিবে!

—আর বেশীদিন নয় সখি! পাপিষ্ঠের খেলার শেষ হইয়া আসিয়াছে।

—মহারাজ দুগ্ধ দিয়া কালসর্প পুষিতেছেন, না জানি কবে কাহাকে দংশন করে।

—আর দংশন করিতে হইবে না, বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া দিতেছি।

অকস্মাৎ আকাশ পাতাল কম্পিত করিয়া কামান গর্জ্জন করিল,—ও কি, ও কিসের শব্দ? দিবা দুই প্রহরে তোপ পড়িতেছে কেন?

বিজয় সিংহ ও মীর্জ্জা মোরাদ ধরা দিতে রাজধানীতে আসিতেছেন, তাই রাজকীয় তোপ মহাস্থান-রাজের বিজয় ঘোষণা করিতেছে।

—তার পূর্ব্বেই রাজকুমারী শীলাদেবীর বিজয় ঘোষণা, লোক-মুখে তাড়িত বার্ত্তার মত দিকে দিকে প্রচারিত হইয়াছে।

—এ বড় লজ্জার কথা।

— কেন?

—যে-কথা সর্ব্বৈব ভিত্তিহীন, সে-কথা চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

—প্রতিবাদ কর না কেন?

—মহাস্থানের গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া প্রতিবাদ করিতে চাহি না।

—তবে কি বিজয় সিংহ স্বেচ্ছায় পরাভব স্বীকার করিলেন ?

—অসম্ভব কি ? একটা বন্য দস্যু বই ত নয় ? সে আর কতদিন মহাস্থানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, আপনার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব ধরাতলে বর্ত্তমান রাখিবে ? তুমি কি বিজয় সিংহকে দেখিয়াছ ?

—সে অনেক দিন, মঙ্গলনাথ সঙ্ঘারামে অবস্থান কালে এক সৈনিক-বেশী অতিথিকে দেখিয়াছিলাম। তেমন সৌম্য-শান্ত বদন, প্রশস্ত ললাট, আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু আমার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। দেখিয়াই তাঁহাকে চিনিয়াছিলাম। যখন শুনিলাম এই ব্যক্তি দস্যুরাজ বিজয়,—তখনই তাঁহাকে দস্যু বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না। হা রাজ-কুমারি! বিজয় সিংহ কি সত্যই দস্যু ?

—পরস্বাপহরণ যার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ?

চঞ্চলা বাধা দিয়া কহিল—পরস্বাপহরণ, না পরোপকার ? প্রকৃত প্রস্তাবে দস্যুতাই তার ললাটের কলঙ্করেখা। মহাস্থানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিজয় সিংহ জগতে এই কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছেন। বীরব্রতধারী বিজয় সিংহ, পরস্বাপহরণ করেন না। পাপিষ্ঠ চিল্লনের অত্যাচারে উৎপীড়িত প্রজাপুঞ্জ, বিজয় সিংহের রাজ্যে আশ্রয় লাভ করিতেছে। যদি বিজয় সিংহ না থাকিতেন তাহা হইলে দেবি ! বোধ হয় বরেন্দ্রভূমি শ্মশানে পরিণত হইত।

—দেখিতেছি তুমি বিজয় সিংহের রূপ ও গুণের যথার্থ পক্ষপাতী।

—একজনের অযথা নিন্দা শুনিলে মনে বড় কষ্ট হয়।

—আচ্ছা চঞ্চলা ! তোমাকে যদি কেহ বিজয় সিংহের ও চিল্লনের দোষগুণের বিচার করিয়া, দোষের ও গুণের দণ্ড বা পুরস্কার দিতে বলে, তাহা হইলে তুমি কি কর ?

—মহাস্থান-রাজকুমারী শীলাদেবীর আমাকে এ-কথা জিজ্ঞাসা করা শোভা পায় কি ?

—তথাপি ?

—আমার মনের কথা আমি বলিব, রাগ করিয়ো না।

—না, আমি শুনিতে চাহিতেছি—তামাসা বই ত নয়—রাগ করিব কেন ?

—অন্ধকারময় কারা-কক্ষ চিহ্লনের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিতাম।

—আর বিজয় সিংহের ?

—না,—সে-কথা বলিব না।

—বল না, এই বলিবে ত, বিজয় সিংহকে কোনও রাজকীয় উচ্চপদ অথবা যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করিতে—কেমন ?

—তাহাই হইবে।

—বল না কেন ; বলিতে দোষ কি ?

—শুনিবে ? তবে শোন ;—সুতহিবুক্ যোগে রাজকুমারী শীলাদেবীর কর বিজয় সিংহের করে অর্পণ করিয়া মহাস্থান-সিংহাসনের ভিত্তি-মূল দৃঢ় করিতাম।

এই বলিয়া চঞ্চলা হাসিতে হাসিতে সেই প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজকুমারী শীলাদেবীর মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। একবার তিনি ঊর্দ্ধে অকাশপটে কি চাহিয়া দেখিলেন ; তার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমস্ত হৃদয় খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন। হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে, মানব-চক্ষুর অগোচরে একান্তে বসিয়া কে তুমি ? ওগো ! তুমি কি দেবতা ! না,— এ যে বিজয় সিংহ !

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্ফুলিঙ্গ

—সেনাপতি।

- দেবি!

—রাজা বিজয় সিংহ ও মীর্জ্জা মোরাদের যথাযোগ্য অতিথি সৎকারের ত্রুটি হয় নাই ত?

—আপনার আদেশ রাজবিধির সম্পূর্ণ অনুমোদিত না হইলেও অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছি।

—কেন, আমার আদেশ কি ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে?

—অতিথি সৎকার হিন্দুর পরম ধর্ম্ম, কিন্তু দেবি! সমগ্র বরেন্দ্র-ভূমির শত্রু দস্যুদ্বয়ের প্রতি সদ্ব্যবহার মহাস্থান-রাজের কর্ত্তব্য নহে।

—মহাস্থান রাজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তিনিই বোধ হয় তোমা অপেক্ষা ভাল বোঝেন। প্রভুর কর্ত্তব্যের বিচার করা দাসের কর্ত্তব্য নহে—ইহা কি মহাস্থান সেনাপতি বুঝিতে পারেন না?

—রাজকুমারি! আপনি প্রভুকন্যা, আর মহারাজের আদেশ—তাই দস্যুপতিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাদর সম্ভাষণ করিয়াছি।

—বিজয় সিংহের প্রতি তোমার এরূপ বিদ্বেষের কারণ কি?

- বলিতে পারি না দেবি! কোন্ অশুভক্ষণে বিজয় সিংহের মুখ দেখিয়াছি; তাহাকে দেখিলে আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া যায়।

সেনাপতি!

—দেবি।

—বিজয় সিংহ কে তা জান? চিররণজয়ী তোমাকেও তিনি পরাজিত ও অপমানিত করিয়া পাল্‌তা হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। সে-ও একবার নয়, তিন-তিনবার।

—সে-কথার অবতারণা করিয়া আর লজ্জা দিবেন না। সে দুর-পনেয় কলঙ্ক আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না।

—সেনাপতি! বিদ্বেষ ভুলিয়া যাও—বিজয় সিংহ অদ্বিতীয় শক্তিশালী বীরপুরুষ। তাঁহার বন্ধুত্বে মহাস্থান-রাজের মহান্ উপকার সাধিত হইবে।

—রাজকুমারি! যার ভুজবলে উত্তরে দিক্ষু নদী পর্য্যন্ত মহাস্থান-রাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়াছে,—মলদ, বিরাট, মগধ, সুহ্মা প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজগণ যার বিজয়-কেতনের তলে মস্তক অবনত করিয়াছে,—সেই চিহ্লন বিজয় সিংহের নিকট অপমানিত হইয়া মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। দেবি। জীবিত নয়—চিহ্লনের মৃত-দেহ বিজয় সিংহের কর-প্রার্থী হইবে।

—সেনাপতি! তুমি কি রাজ্যের মঙ্গল কামনা কর না?

—তাহ'লে হৃদয়ের রক্তধারায় মহাস্থান-রাজলক্ষ্মীর পাদ-পূজা করিব কেন?

—তবে নিঃস্বার্থভাবে নয়, কেমন?

—বুঝিলাম না।

—তুমি যে নিঃস্বার্থভাবে মহাস্থানের কল্যাণ-কামনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছ, একথা কি তবে সত্য নয়?

—বলুন দেখি রাজকুমারি! কোন্ স্বার্থের আশায় সহায়হীন, অর্থহীন যুবক অসিমাত্র সম্বল লইয়া যশের উচ্চশিখরে উঠিতেছে!

—যশের নয়—সৌভাগ্যের বল।

—দেবি! অভয় দিলে কয়েকটী প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি।

—উত্তম।

—বিজয় সিংহের প্রতি আপনার অথবা মহারাজের এতাদৃশ অনুগ্রহের কারণ কি?

—তার শুভাদৃষ্ট। ভাগ্যদেবতার প্রসন্নদৃষ্টি না হইলে কেহ কি

রাজ-অনুগ্রহ লাভ করে ? আসি সেনাপতি ! এখনই আমাকে কার্য্যান্তরে গমন করিতে হইবে।

একদা অপরাহ্নে রাজকুমারী শীলাদেবী মহাস্থান-সেনাপতি চিহ্লনকে স্বীয় বিশ্রাম-ভবনে ডাকিয়া উল্লিখিত রূপ কথোপকথন করিতেছিলেন। উভয়ের কথাবার্ত্তা শেষ হইলে রাজকুমারী কার্য্যান্তরে গমন করিতেছেন দেখিয়া. সেনাপতি তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিল।

সেনাপতি সেই প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। দ্বার অতিক্রম করিয়া অনেক আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরিয়া সেনাপতি একস্থানে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে সর্ব্বাঙ্গ অঙ্গরাখায় আবৃত এক রমণী দাঁড়াইয়াছিল। চিহ্লন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—কে ও ?

—তুমি কে ?

—সেনাপতি।

—আমি মতিয়া।

—সংবাদ কি ?

—সংবাদ শুভ,—আমার প্রাপ্য।

—নিশ্চয় পাইবে,—আগে কার্য্যোদ্ধার কর,—তার পর পুরস্কার।

—কার্য্যের জন্য আমি দায়ী নহি ; আমি আপনার কথামত কার্য্য করিয়াছি। আগামী কল্য রাত্রি প্রহরেক অতীত হইলে আপনি আপনার আবাসভবনে তাহার সাক্ষাৎ পাইবেন।

—মুখভাব দেখিয়া কি বুঝিলে ? আমার প্রতি প্রসন্ন, না অপ্রসন্ন ?

—আমি সে-সব বুঝি না, সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন সাক্ষাৎ করাইয়া দিব—তা যেরূপেই পারি। আপনার সঙ্গে আমার আর কোনও কথা নাই।

—দেখ্ মতিয়া! তোকে বড় বিশ্বাস করি।

—তা আর জানি না,—আপনার অনুগ্রহেই রাজসংসারে আমার এত প্রতিপত্তি।

—আমার কার্য্য যদি উদ্ধার হয় এত অর্থ দিব, তুই রাণীর হালে বাস্ করিবি। আর গতর খাটাইতে হইবে না।

—বলুন, আর কি করিতে হইবে।

—মতি! তুই কি জানিস্ না, তোর সত্য উত্তরের উপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে।

—আমি তত বড় কথা বলিতে সাহস করি না। কি জানি কোন্ কথায় কি হয়! জানেন ত—রাজসংসারে বাস করা বড়ই কঠিন।

—যত কঠিন হউক করিতেই হইবে। আমি জীবন পণ করিয়া দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। মতি। একার্য্যে তুই আমার দক্ষিণ হস্ত।

—আমার প্রাপ্য! জানেন ত কার্য্য কত গুরুতর!

—এ কার্য্যের পুরস্কার সহস্র স্বুবর্ণ মুদ্রা।

—উত্তম। অগ্রিম কিছু চাই—মনে রাখিবেন, আমি বড় গরীব।

—কল্যই প্রাপ্ত হইবি। মতি! তোর আশার আশ্বাসেই আমি প্রাণ পাইলাম। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, এ আশা ছিল না।

—দেখিবেন, শেষে যেন বিপদে না পড়ি।

—ভয় করিস্ না মতি! সাহস কর্, সাহসেই লোকের ভাগ্যে সুখ ফিরিয়া আইসে। আমি কেবল আমার স্বার্থের জন্যই বলিতেছি না। একার্য্যে তোরও যথেষ্ট স্বার্থ আছে। মতি! তোর কষ্টে আমার প্রাণ গলিয়াছিল, তাই তোকে রাজসংসারে প্রবেশ করাইয়াছি। এখন দেখিস্, তোর উন্নতি বাড়িবে বই কমিবে না।

—সে আপনার দয়া। আপনি অনুগ্রহ করিলে সবই হইতে পারে।

—কিন্তু খুব সাবধান—কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়।

— আমি বিশেষ সাবধানেই কার্য্য শেষ করিব।

—আমি সেইখানে মুদ্রা লইয়া তোর জন্য অপেক্ষা করিব। আমি এখনকার মত বিদায় হইলাম।

সেনাপতি ক্ষিপ্র পদে তথা হইতে প্রস্থান করিল। ছদ্মবেশে মতিয়াও অন্ধকারে কোন্ দিকে মিশিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গড়

তাম্রদ্বার হইতে দক্ষিণ দিকে সার্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে দেখিতে পাওয়া যায় একটা সুপ্রশস্ত খাল করতোয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ঐ খাল সেখান হইতে ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে গিয়াছে। পরিখার এই অংশের নাম কালীদহ। পরে ক্রমশঃ পশ্চিম ও উত্তরদিকে অর্দ্ধবলয়াকারে গড় বেষ্টন করিয়া পুনরায় করতোয়ার সহিত সাম্মিলিত হইয়াছে। পশ্চিম দিক হইতে পরিখা একটু সঙ্কীর্ণভাবে উত্তর দিকে গিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণ অংশের নাম বারাণসী খাল। প্রসিদ্ধ তোরণ তাম্রদ্বারের ন্যায় উত্তর প্রান্তেও একটা বৃহদাকার দ্বার দেখা যায়। এই দ্বার স্বর্ণদ্বার বা সাগর দুয়ার নামে আখ্যাত হইত। ঐ দ্বারের সম্মুখে ঠিক বারাণসী খালের উপরে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটা প্রশস্ত সেতু। অপর পারে অন্যূন সহস্র হস্ত দীর্ঘ, উচ্চতাও তৎপরিমিত বহুদ্বারযুক্ত একতল ইষ্টকালয়। ইহাকে পূর্ব্বে হাজার-দুয়ারী সভাগৃহ বলিত। বিশেষ কারণ ব্যতীত এই স্থানে সভার অধিবেশন হইত না। সাধারণতঃ রাজকীয় সমস্ত কার্য্যই গড় মধ্যে অনুষ্ঠিত হইত।

তাম্রদ্বারে ভীমকায় সশস্ত্র প্রহরিগণ প্রহরা দিতেছে। তাম্রদ্বার অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে বিস্তীর্ণ ময়দান। এই ময়দানে অসংখ্য

কামান সারি সারি সজ্জিত রহিয়াছে। তাম্রদ্বার হইতে দুইটী পথ দুই দিকে গিয়াছে। তাম্রদ্বারপথে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে সম্মুখে সুপ্রশস্ত প্রাচীর দৃষ্ট হয়। প্রাচীর-গাত্রে ক্ষুদ্র দ্বার। সেই দ্বার অতিক্রম করিলে সম্মুখেই কারাগার। কারাগার অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই বিচারালয়। তথা হইতে একটু অগ্রসর হইলেই মনোহর মর্ম্মর প্রাসাদ। এই প্রাসাদের উপরিতলে অবস্থান করিয়া রাজা নরসিংহ পরশুরাম স্বয়ং রাজকীয় কার্য্য পরিচালনা করেন। নিম্নে মহামন্ত্রীর খাস দপ্তরখানা। প্রজাগণ ইচ্ছা করিলে এই স্থানে রাজদর্শন করিতে পারে। কিন্তু একবারে একজনের অধিক যাওয়া নিষিদ্ধ। তার পরেই সভাগৃহ। সভাগৃহের বিশেষ পারিপাট্য নাই বহুদ্বারবিশিষ্ট একতল ইষ্টকালয়। কারাগার, বিচারালয়, রাজসভা প্রভৃতির চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া প্রশস্ত প্রাচীর। রাজসভা হইতে একটী পথ সম্মুখস্থ প্রাচীর দ্বারের সহিত মিলিত হইয়াছে। কেবলমাত্র রাজা এবং রাজপুরবাসিগণ ব্যতীত কেহ এই পথে প্রবেশের অধিকারী নহে। প্রাচীরের অপর পার্শ্বেই সেনানিবাস, সেনাপতির আবাসভবন ইত্যাদি। এই স্থান হইতে রাণীর এবং রাজকুমারীর মহল পরিদৃষ্ট হয়। ঐ মহলের তিন দিক্ সুপ্রশস্ত প্রাচীরে আবৃত। এই দিক্ দিয়া গমনাগমনের কোনও পথ নাই। অন্তঃপুরে যাইবার জন্য অন্য পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। সে পথ রাজা কিম্বা রাজপুরুষগণ ভিন্ন অন্যের অপরিজ্ঞাত। বারাণসী খালের বাঁধ পার হইয়া স্বর্ণদ্বার দিয়া গড়ে প্রবেশ করিলে সম্মুখেই সেনানিবাস। কিন্তু এই দ্বার সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে। বিচারালয়ে যাইতে হইলে তাম্রদ্বারপথে ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে হয়।

তাম্রদ্বারপথে উত্তরদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে সম্মুখেই মহাকালী-মন্দির। পশ্চাৎ একটী নাতিবৃহৎ মন্দিরে দেবী কালঞ্জরীর দিগম্বরী ভৈরবী মূর্ত্তি, তৎপশ্চাতে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে মহাকাল অবস্থান

করিতেছেন। এই দেবমন্দিরের চুত্বর পার হইলেই সম্মুখে একটী নাতিবৃহৎ জলকুণ্ড। এই কুণ্ডটী পাপহরা বলিয়া অমৃত-কুণ্ড নামে আখ্যাত ছিল। তার পর প্রাচার। প্রাচীরের পারেই সুবৃহৎ রাজোদ্যান। উদ্যান মধ্যে একটী সুবৃহৎ অতিসূক্ষ্মকারুকার্য্যবিশিষ্ট দ্বিতল মর্ম্মর প্রাসাদ। ইহাই মহারাজ নরসিংহ পরশুরামের চিত্তবিশ্রাম-গৃহ। এই স্থানে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই।

এই মর্ম্মর প্রাসাদের এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বহুমূল্য খট্টার উপরে বিচিত্র সুকোমল শয্যায় উপাধানে করতল বিন্যস্ত করিয়া মহারাজ নরসিংহ দেব কি চিন্তা করিতেছেন। পার্শ্বে বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিতা মহারাণী শুভদেবী উপবিষ্টা। রাণীর মুখভাব বিষাদপরিপূর্ণ। বালক রাজকুমার রাজেন্দ্র মহারাণীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট। বালক চাঞ্চল্য-বর্জ্জিত,—মুখচ্ছবি ধীর শান্ত। রাজকুমারের হস্তে একটী সুন্দর মৃৎপুত্তলিকা। কিয়ৎ কাল মৌন থাকিয়া মহারাণী সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন—কি ভাবিতেছেন মহারাজ!

রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—কত কি ভাবি নিজেই তাহা বুঝিতে পারি না। পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্রও আমা অপেক্ষা শতগুণে সুখী। এ-জগতে সুখ নাই রাণী,—সুখ নাই। যতদিন বাঁচিব, নিত্যই নূতন নূতন চিন্তার তরঙ্গে ভাসিতে থাকিব। রাণি! তুমি বিশ্রাম কর, বড় সুন্দর অবসর—বাহিরের কল-কোলাহল নাই,—এই নির্জ্জনে নীরবে একবার ভাবিয়া দেখি, কূল পাই কি না!

—এত চিন্তা কিসের মহারাজ! মন্ত্রী আছে, সেনাপতি আছে, তোমার এরূপ চিন্তার প্রয়োজন কি?

—আশার শেষ নাই রাণি! বৃদ্ধবয়সে যদি পুত্র-মুখ দেখিলাম, তবে আর একটী সাধ মনে অপূর্ণ রাখিয়া যাই কেন?

—কিসের সাধ মহারাজ! শীলার বিবাহ দিয়া জামাতা ঘরে

আনিবেন এই ইচ্ছা কি আপনার প্রাণে বলবতী হইয়াছে? কিন্তু ইহার জন্য চিন্তা কি মহারাজ!

—শুধু তাই নয় রাণি! আর একটা সাধ! বিধাতা জানেন, আমার এ-বাসনা পূর্ণ হইবে কি না! আজীবন চেষ্টায় পূর্ব্বে দিক্ষু নদী পর্য্যন্ত যে-রাজ্যের সীমা বিস্তার করিলাম,—কামতা, সুহ্ম, বিরাট, মলদ্ মগধ প্রভৃতি রাজ্যের পরাক্রান্ত রাজগণ অবনতমস্তকে যে মহাস্থানের প্রধানতা স্বীকার করিল, সেই মহাস্থান আমার গৌরবের নিদর্শন। কিন্তু মহারাণি! আজিও আমি গৌড়ের সম্রাট্ কাপুরুষ জয়পাল দেবের পাদুকা-বাহী ভৃত্যমাত্র। এ কি কলঙ্কের কথা নয় রাণি!

—কলঙ্ক নয়, মহারাজ! গৌরব! ভোজবংশীয় কোনও রাজাই গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। আজ জীবনের সায়াহ্নে কেন মহারাজ, গৌড়েশ্বরের অবমাননা করিবেন? এই কার্য্যের ফলে, আবার যদি বৃদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হয়, তাহার ফল আমাদিগের নিরীহ প্রজাপুঞ্জই ভোগ করিবে। কাজ নাই মহারাজ! ইচ্ছা করিয়া শান্তির দেশে মাৎস্যন্যায়* আনিবেন না। শুনিয়াছি বহু পূর্ব্বে গৌড়েশ্বর গোপাল দেবের সময়ে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও অন্যান্য রাজগণ স্বেচ্ছায় স্ব স্ব কিরীট ও অসি তাঁহার সিংহাসনতলে রক্ষা করিয়া তাঁহাকে সম্রাট্ পদবী দান করিয়াছিলেন। তাহার ফলে সেই বিদ্রোহপূর্ণ দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। সম্রাট্ ধর্ম্মপাল ও তদীয় ভ্রাতা বাক্‌পাল দেব, প্রাণপণে পিতৃ-গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সেই ধার্ম্মিক মহাত্মা গোপাল দেবের বংশধর জয়পাল দেব দুর্ব্বল বলিয়া সে সম্মান, সে গৌরব অপহরণ করিলে তাহাতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের গৌরব বৃদ্ধি হইবে না মহারাজ!

—যেগুণে মহাত্মা গোপাল দেব সম্রাট্ পদবী লাভ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মপাল বাক্‌পালের পরে পালবংশের সেগুণ ক্রমশঃই লোপ পাইয়া

* বৃহৎ মৎস্য যেমন ক্ষুদ্র মৎস্যকে গ্রাস করে তদ্রূপ বলবান কর্ত্তৃক দুর্ব্বলকে নাশ বা গ্রাস করা।

আসিতেছিল। বিলাসব্যসনাসক্ত গৌড়েশ্বর এখন করগ্রাহী ভূস্বামী মাত্র। যে রাজা প্রজার হৃদয়-রাজ্য জয় করিতে পারে না, সে সাম্রাজ্য রক্ষায় সমর্থ হইবে কি? গৌড়েশ্বর যদি সাম্রাজ্য রক্ষায় মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলে হেমন্ত সেন এমন করিয়া মস্তক উন্নত করিতে পারিত না। তাহার সম্রাট আখ্যা লাভ ঘটিত না। হেমন্ত সেনের আক্রমণে সামন্ত নরপতিগণও এমন লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। তবুও গৌড়েশ্বরের মুখ চাহিয়া এত দিন নীরবে সহ্য করিলাম! ভাবিয়া দেখ রাণি! যখন হেমন্ত সেন মহাস্থান আক্রমণ করিয়াছিল, তখন কি গৌড়েশ্বর মহাস্থানের দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছিল?

—কাজ নাই মহারাজ! ক্ষমাই মহতের ধর্ম্ম। যে-কয়টা দিন আছেন, গৌড়েশ্বরের কর প্রেরণ আর বন্ধ করিয়া কাজ নাই।

—না রাণি! আমার এ-বাসনা পূর্ণ হইতে দাও। দন্ত পতিত—কেশ শুভ্রবর্ণ—মৃত্যুর দুয়ারে অতিথি আমি। আমার গৌরবময়ী মহাস্থানকে সকল অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিতে দাও। আমার সারাজীবনের শ্রম সার্থক হউক—আমায় আনন্দে মরিতে দাও দস্যুরাজ বিজয়, যাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি থর-থর কম্পিত, সেই বিজয়ও মহাস্থানের শরণাগত। একমাত্র গৌড়—

—কি জানি মহারাজ! প্রাণে বড় ভয় হইতেছে। মন কেন জানি না, কোন্ এক ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিতেছে। কাজ নাই মহারাজ! লীলা বয়ঃস্থা, কোথায় উপযুক্ত জামাতার করে তাহাকে অর্পণ করিয়া, বালক রাজার প্রতিভূস্বরূপ জামাতার করে রাজ্যভার অর্পণ করিবেন, তা না করিয়া এ কি নূতন চিন্তায় কালক্ষেপ করিতেছেন?

—উপযুক্ত জামাতা কই রাণি! কে এমন বিশ্বাসী! কাহার হস্তে এ বিশাল রাজ্যভার অর্পণ করিব। সেও ত একটা কথা, রাণি!

—সেই দিকেই মন দিন। আরও দেখুন সামন্তরাজগণ আপনাকে বৃদ্ধ দেখিয়া ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিতে প্রয়াস পাইতেছে। আবার উচ্ছৃঙ্খল রাজকর্ম্মচারিগণের অত্যাচারে প্রজাগণের মধ্যে হাহাকার উপস্থিত। সে-দিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আপনাকে বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত দেখিয়া, সেনাপতি চিহ্লন মনে মনে কি আশা পোষণ করিতেছে কে জানে!

—তোমার এ অমূলক সন্দেহ কেন রাণি!

—সন্দেহ নয় মহারাজ! বৃদ্ধ বয়সে আপনার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, নতুবা দেখিতে পাইতেন, চিহ্লনের অত্যাচারে মহাস্থান-রাজ্য ছারে-খারে যাইতে বসিয়াছে। জানি না মহারাজ! কোন্ দিন রাজপ্রাণ বিপন্ন হইবে!

—তুমি এত সংবাদ পাও কোথায়?

—শীলাদেবীর গর্ভধারিণী আমি—মহারাজ পরশুরামের বনিতা আমি—প্রজার সুখ-দুঃখের সংবাদ রাখিব না কেন মহারাজ!

—যে বীর এতকাল হৃদয়ের রক্তধারা ঢালিয়া মহাস্থানের গৌরব রক্ষা করিয়াছে, আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর সেই চিহ্লন বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাস হয় না যে রাণি!

—মহারাজ! শীলাদেবী সব জানে, কুটিল কুচক্রীদিগের পাপ ষড়-যন্ত্র দিবারাত্রি চলিতেছে। মনে বড় ভয় হয়, কোন্ দিন কোন্ বিপদ ঘটে! দরিদ্র প্রজাপুঞ্জ জ্বলিয়া মরিতেছে, আর মনের দুঃখ ভগবানের কাছে জানাইতেছে।

—আমি শীঘ্রই ছদ্মবেশে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিব।

—মহারাজ! অনুমতি দিলে একটা কথা বলিতে চাই।

—অনুমতি কিসের রাণি! তোমার উপদেশ মৃতদেহেও জীবনী শক্তি সঞ্চার করে—অন্ধের চক্ষু ফুটায়। বল রাণি! তোমার কি অভিপ্রায়!

—বলিতে পারি না মহারাজ! শুনিয়াছি বিজয় সিংহ অদ্বিতীয়

শক্তিশালী, মোরাদও মহাবীর, ঐ দস্যু বীরদ্বয়কে সম্মানিত করিয়া রাজ্যরক্ষায় নিয়োজিত করিলে হয় না ?

—আচ্ছা, ভাবিয়া দেখি, এ-সম্বন্ধে পরামর্শের প্রয়োজন। আমি মন্ত্রীকে ডাকি, তুমি আমার মা লীলাদেবীকে এই স্থানে পাঠাইয়া দাও।

মহারাণী চলিয়া গেলেন : রাণা পুনর্ব্বার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ পরে মনে মনে বলিলেন—শুভদেবি। তোমার পরামর্শই গ্রহণ করিলাম ; তুমি নিশ্চিন্ত হও।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রেত-পুরী

এক সমুচ্চ অট্টালিকা ; সেই অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান। নানাজাতি সুরভি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া দিগ্মণ্ডল সৌরভময় করিতেছে। গড়ের বাহিরে বারাণসী খালের অপর পারে এই অট্টালিকায় বিজয় সিংহ বাস করিতেছেন। রাজকীয় আদেশে তাঁহার বাস-ভবনের চতুর্দ্দিকে ভীমকায় প্রহরিগণ সতর্কভাবে পাহারা দিতেছে। বিজয় সিংহের স্বাধীনতা নাই। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোথাও গমনাগমন করিতে পারেন না। মোরাদ কোথায় তাহাও তিনি বলিতে পারেন না। সেনাপতি চিল্লন দিনে তিনবার আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে, মুখে নানারূপ শিষ্টাচার সৌজন্য প্রদর্শন করে; কিন্তু বিজয় সিংহ অন্তরে অন্তরে বুঝিতেন তিনি বন্দী হইয়াছেন। মোরাদ কোথায় জিজ্ঞাসা করায় সেনাপতি যথার্থ উত্তর দেয় নাই বিজয় সিংহ মোরাদের জন্য বড়ই চিন্তিত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু উপায় কি? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও তিনি উদ্ধারের উপায় স্থির

করিতে পারিলেন না। এরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইবেন তিনি আশা করেন নাই। তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইতেন।

বিজয় সিংহ একখানি চৌকিতে উপবেশন করিয়া কত কি ভাবিতেছেন। তখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল। মন্দ্র-মধুর নহবত ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার একটু ঘনাইয়া আসিল তখন প্রত্যেক দেবমন্দির হইতে তুমুল বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল। বিজয়ের সে-দিকে লক্ষ্য নাই। বারাণ্ডায় বসিয়া তিনি সম্মুখস্থ বারাণসী খালের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। অস্ত্রধারী প্রহরিগণ তাহার সম্মুখ দিয়া সদর্পে পদচালনা করিতেছে। তিনি প্রহরীদিগের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—তোমরা কাহার আদেশে আমার গৃহভবনের চতুর্দ্দিকে কড়া পাহারা দিতেছ?

—কি করিব মহাশয়! রাজার হুকুম, কড়া পাহারা না দিলে যদি আপনি পলায়ন করেন আমাদের গর্দ্দান যাইবে।

—স্বয়ং মহারাজের আদেশ?

—রাজা কি আর সব সময় আদেশ দেন।

—তবে কার অভিপ্রায়ে?

—রাজকুমারী শীলাদেবীর অভিপ্রায়ে—আর সেনাপতির আদেশে।

—বিজয় সিংহ আর কিছু বলিলেন না। 'শীলাদেবীর অভিপ্রায়ে' কেবল এই কথাটি তাঁহার মনে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কথাটা তাঁহার বিশ্বাস হইল না অথবা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না।

সহসা সম্মুখে উজ্জ্বল আলোক উদ্ভাসিত হইল। বিজয় সিংহ দেখিলেন, প্রহরিগণ কাহাকে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। আগন্তুক সেনাপতি চিল্লন। চিল্লন আলোক হস্তে বিজয় সিংহের সমীপবর্ত্তী হইল এবং পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশন করিল।

বিজয় সিংহ তাহার মুখপানে একবার চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন।

সেনাপতি হাস্যমুখে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কহিল—কেমন মহাশয়, কুশল ত।

রোষে, ক্ষোভে বিজয় সিংহের সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইতে লাগিল, যথা-সম্ভব আত্মসংযম করিয়া কহিলেন—বেশ আছি—অনাহারে, অনিদ্রায় সিংহশিশু বল-বিক্রম একেবারেই হারায় না!

—সে কি মহাশয়! আপনার আহারাদিরও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, তাহা ত আমাকে বলেন নাই; আপনার শয্যাদিরও বেশ সুবন্দোবস্ত করিয়াছি! আর যদি কিছু আবশ্যক হয় তখনই তাহা প্রাপ্ত হইবেন। অতিথি যাহাতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন তাঁহার কোনরূপ কষ্ট না হয় সে-বিষয়ে আমি সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি রাখি।

—মহাশয়ের অতিথিপরায়ণতাকে ধন্যবাদ। আপনার বন্দোবস্তও অতি সুন্দর। বন্দীর প্রতি আপনার সদ্ব্যবহারও প্রশংসনীয়।

—বন্দী! সে কি মহাশয়! বন্দী কে?

—কেন, আমি।

—ওঃ, এই গৃহে কয়েক জন প্রহরী রাখিয়াছি, তাই। এই স্থান রাজপুরীর দৃষ্টির বাহিরে। মহাশয়ের কোনরূপ কষ্ট না হয়, কেহ কোনরূপ বিরক্ত না করিতে পারে, এই জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এই বলিয়া চিঙ্গলন প্রহরীদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল—যাও হে, তোমরা চলিয়া যাও। তোমরা থাকিলে ইনি বিরক্ত হন।

প্রহরিগণ চলিয়া গেলে চিঙ্গলন বলিল, আপনি বিদেশী, এই স্থানের পথ-ঘাট কিছুই জানেন না,—আপনার সুবিধার জন্যই লোক রাখিয়াছিলাম। তা দেখিবেন মহাশয়! শেষে যেন আমার উপরে কোনরূপ দোষারোপ করিবেন না। একাকী থাকিতে পারিবেন ত?

—তা, থাকিতেই হইবে। দুই দিন গিয়াছে, জানি না আরো কত-

দিন এই ভাবে কাটিবে! গত কল্য আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু মীর্জ্জা মোরাদের সংবাদ জানিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনি তাহার কোনও উত্তর দেন নাই। আজ দয়া করিয়া বলুন, আমার বন্ধু কোথায়?

—কে, মীর্জ্জা মোরাদ? তিনি বেশ আছেন আপনার চেয়ে তার বন্দোবস্ত আরো সুন্দর। আপনার অপেক্ষা তাঁর উপরে আমার আরো বেশী তীক্ষ্ণদৃষ্টি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাই।

—কাল সাক্ষাৎ পাইবেন।

—আজ সাক্ষাৎ করিতে দোষ কি?

—মার্জ্জনা করিবেন, রাজকুমারীর অভিপ্রায় নাই।

—এইরূপে বন্দী করিয়া রাখাই কি রাজকুমারীর ইচ্ছা?

—বলিতে পারি না। বোধ হয় তাই। এক্ষণে আসি মহাশয়, নমস্কার। জানেন ত পরাধীন জীবনের অবসর নাই। এই বলিয়া সেনাপতি প্রস্থান করিল।

বিজয় সিংহ আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। পূর্ব্বাপর সমস্ত স্মৃতিপথে উদিত হইয়া মনে করিতে লাগিলেন, হায়! কেন আমি মহাস্থানে আসিলাম। আসিলাম যদি, কেন অনুচরগণ আনিলাম না। আমারই জন্য—আমারই মূর্খতার ফলে আমার সোদরোপম বন্ধু মোরাদ না জানি কত দুর্গতিই ভোগ করিতেছে। কুহকিনীর কুহক-জালে পড়িয়া শেষে এই ঘটিল। চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত অট্টালিকা—পলায়নেরও পথ নাই। আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, তার জন্য ভাবি না; বন্ধুর উদ্ধারের উপায় কি! প্রহরীরাও চলিয়া গেল—উহারা থাকিলেও মন্দ ছিল না। এ যে বিপরীত ফল ফলিল। জনশূন্য স্থানে একাকী কেমন করিয়া নিশা যাপন করিব!

গৃহের এক কোণে একটী মৃন্ময় প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে ; তৈলশূন্য প্রদীপ কতক্ষণ জ্বলিবে। বিজয় সিংহ প্রদীপের অবস্থা বুঝিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া নিভিয়া গেল। বিজয় সিংহ ভাবিতে ভাবিতে দ্বার রুদ্ধ করিতে ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই, অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকিয়া একটু তন্দ্রা অনুভব করিলেন। হঠাৎ কি দেখিয়া চমকিত হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। তখন রাত্রি কত অনুমান করা কঠিন--- সম্ভবতঃ দ্বিপ্রহর হইবে।

বিজয় সিংহ মনে করিলেন শয্যা পার্শ্বে তাঁহারই সম্মুখে এক বিকটাকার মূর্ত্তি দণ্ডায়মান, হস্ত দিয়া তাঁহাকে কি ইঙ্গিত করিতেছে। বিজয় কোমরে হাত দিয়া দেখিলেন, অসি অপহৃত। তাঁহার ললাটে স্বেদাক্ত হইল। তাঁহার সর্ব্বশরীর থরথর্ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল। একটু পরেই তিনি আত্মসংযম করিলেন, চক্ষু ভাল করিয়া মুছিয়া লইলেন। হয়ত স্বপ্ন, কিংবা চক্ষের ভ্রম। আবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন-- না,—স্বপ্ন নয়,--চক্ষের ভ্রম নয়, এই যে একেবারে তাঁহার সম্মুখে। অন্ধকার! অতি দীর্ঘাকার মূর্ত্তি, ঐ হাত নাড়িয়া যেন তাঁহাকেই ইঙ্গিত করিতেছে। বিজয় নীরব নিশ্চলভাবে বসিয়া বিকটমূর্ত্তির কার্য্যকলাপ দেখিতেছেন, আর মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির করিতেছেন। ভাবিলেন, এ কি মানুষ,—না প্রেত-মূর্ত্তি? মানুষ যদি হয়, আমি উহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিব। যদি প্রেত-মূর্ত্তি হয় এখনই মিলাইয়া যাইবে। আমার অসি কোথায়! কে অপহরণ করিল! নিশ্চয়ই ইহার অভ্যন্তরে কোন রহস্যময় ষড়যন্ত্র আছে। বিজয় সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি চক্ষের নিমিষে ঐ অন্ধকার মূর্ত্তি যেন রজনীর গাঢ় অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। এতক্ষণে বিজয় সিংহ ভয়ে বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন! ও কি! ও আবার কিসের শব্দ! খিল খিল অট্টহাস্য ধ্বনি গৃহের চারিদিক হইতে উঠিতেছে।

এই যে অসি আমার কাছেই, তবে কি আমার মস্তিষ্কের কোন বিকার উপস্থিত হইয়াছে! অসি যথাস্থানেই আছে অথচ তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। বিজয় সিংহ আপন নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য মনে মনে যথেষ্ট অনুতাপ করিলেন। ও কি! আবার ও কিসের আর্ত্তনাদ! স্ত্রীকণ্ঠে রোদন-ধ্বনি উত্থিত হইল। কে যেন কাতরস্বরে বলিতেছে—কে আছ, রক্ষা কর - প্রাণ যায়। ভূত নয়, প্রেত নয়—স্পষ্ট মনুষ্যের কণ্ঠস্বর। এই গৃহের পার্শ্বদেশেই অতিনিকটে কে কাহাকে হত্যা করিতেছে!

বিজয় সিংহ উন্মুক্ত অসি হস্তে এক লম্ফে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। চতুর্দ্দিক্ তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন! না, কোথাও কিছু নাই। তবে কি এ! স্পষ্ট মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শোনা গেল - তবে কি প্রাচীরের পশ্চাদ্দেশে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল! হইতে পারে! না,— আর এ-গৃহে থাকা নয়; প্রাতঃ প্রভাত হইলেই, সেনাপতিকে বলিয়া এ-স্থান ত্যাগ করিব। যদি বাহির হইতে দ্বাররুদ্ধ না থাকিত পলায়ন করিতাম। নরককুণ্ড এ-স্থান -- প্রতিনিয়ত কেবল নরকেরই বিভীষিকা দেখিতেছি। বিজয় সিংহ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া ঈদৃশ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, তাঁহার বাসকক্ষ সহসা আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে তিনি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে যুগপৎ পুলকে ও বিস্ময়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর অভিভূত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়বন্ধু মোরাদ, তাঁহারই শয্যায় সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। প্রদীপ তেমনি জ্বলিতেছে। এ কি স্বপ্ন!

কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বিজয় সিংহ মোরাদের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। সুষুপ্ত বন্ধুর নিদ্রাভঙ্গ করিতে সাহস হইল না। তিনি উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেই শয্যার পার্শ্বদেশে বসিয়া রহিলেন। রাত্রি আর বড় বেশী ছিল না। অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়াই অতিবাহিত করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

রাজসভায়

শীতকাল। চতুর্দ্দিক্ কুয়াসায় আচ্ছন্ন। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু এখনও কুয়াসার জন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। সহসা মোরাদ জাগ্রত হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, এবং অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বিজয় সিংহের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বিজয় তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন—কেমন বন্ধু, কুশল ত? মোরাদ গম্ভীর বদনে উত্তর দিলেন,—এ কি প্রহেলিকা? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? আমি এখানে কেন?

—আমিও ত তাই ভাবি, তুমি কেমন করিয়া এখানে আসলে? কোথায় ছিলে—তাহাও ত জানিতাম না।

—জীবন্তে নরক ভোগ করিয়াছি বিজয়! সে-কথা স্মরণ করিলে প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে পূতিগন্ধ এখনও যেন আমার নাসারন্ধ্রে লাগিয়া আছে। জীবনে এত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কেমন করিয়া এখানে আসিলাম, নিদ্রিতাবস্থায় কে আমাকে এখানে রাখিয়া গেল, তাহাও বলিতে পারি না। এই বিপদ হইতে যে উদ্ধার করিয়াছে, তাহাকে শত ধন্যবাদ। মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিলাম বিজয়! তুমি ত কুশলে ছিলে?

—আমি বেশ ছিলাম। কেবল তোমার অদর্শন-যাতনা—আর সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া একটা নিদারুণ বিভীষিকা আমাকে জ্বালাতন করিয়াছে। এই কক্ষে কতই আশ্চর্য্য অভিনয় দেখিলাম! জানি না সে-সব কি? কোন্ অজানিত যাদুকর এইরূপ ভোজবিদ্যায় কৃতিত্ব দেখাইল।

—তুমি কি বুঝিতে পার নাই বিজয় ! গড় মহাস্থান শত্রুপরিপূর্ণ। আর হতভাগ্য বৃদ্ধ নরপতি উচ্ছৃঙ্খল রাজকর্ম্মচারিগণের ক্রীড়া-পুত্তলিকা। রহস্যপূর্ণ মহাস্থান গড়, আর সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যময় ঐ মিষ্টমুখ সেনাপতি। আমাদের মহাস্থান আগমনে যে যে ব্যক্তির স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা, আমরা তাহাদেরই শত্রুমধ্যে পরিগণিত—এখন বুঝিলে ?

—যাহা হউক, যখন আসিয়াছি তখন রাজসন্দর্শন করিব, তার পর এই সব রহস্যের মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিব।

—আমার আর তিলার্দ্ধ এই পুরীতে থাকিবার ইচ্ছা নাই।

—না রাজা ! আমার মনে কৌতূহল জন্মিয়াছে, আমি শেষ পর্য্যন্ত দেখিব। যদি বিন্দুমাত্রও রাজ-করুণা লাভ করিতে পারি, দেখিবে, মীর্জ্জা মোরাদ চিহ্লনকে পদানত করিয়াছে ! আমি ফিরিব না রাজা ! যখন সঙ্গে আনিয়াছ, তখনই জানিয়ো— মোরাদ ফিরিতে আইসে নাই।

—যাহাকে এত শ্রদ্ধা করিতাম—মনে মনে যাহাকে দেবীর আসন করিয়াছিলাম, সেই মহাস্থান রাজকুমারী কৌশলে আমাদিগকে এত যাতনা দিতেছে · ইহা কি ভুলিয়া যাইতে হইবে ?

—রাজা ! বৃথা রাজকুমারীর দোষ দিতেছ। তাহার কোনও দোষ নাই। পরে বুঝিতে পারিবে, শীলাদেবী এ সব ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানেন না। আমাদের এ অভ্যর্থনা ব্যাপার সুকৌশলে সাধিত হইয়াছে।

—আচ্ছা, রাজকুমারীর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিব না ?

—ব্যস্ত হইয়ো না বন্ধু ! তোমার মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবীপ্রতিমা নিশ্চয়ই গৌরবময়ী ! আমার কথায় বিশ্বাস কর। আর এস বন্ধু ! প্রাণপণে দুই বন্ধুতে মিলিয়া বরেন্দ্রভূমির সমস্ত যশঃ, সমস্ত গৌরব আহরণ করি। সে অমূল্য রত্ন একদিন-না-একদিন তোমার কণ্ঠে শোভা পাইবে। আমি জীবনপণে সে রত্নহার তোমার গলদেশে পরাইবার চেষ্টা করিব।

—আকাশ-কুসুম মোরাদ! এ-স্বপ্ন সত্য হইবে না। ভিখারীর আশা মনের মধ্যেই বিলীন হইবে ভাই!

সহসা উভয়ের বাক্যালাপ রুদ্ধ হইল। উভয়ে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন—বহির্দ্বার খুলিয়া গেল। সেনাপতি চিহ্লন ধীরপাদবিক্ষেপে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া প্রীতিসম্ভাষণ জ্ঞাপন করতঃ, হাস্যমুখে কহিল—নমস্কার রাজা সাহেব! আপনারা বেশ আনন্দে আছেন ত? অতিথির আনন্দবর্দ্ধনই আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। আজ এক শুভসংবাদ লইয়া আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। খালতাপাতি! মোরাদ সাহেব! আজ মহারাজাধিরাজ নরসিংহ পরশুরাম আপনাদিগের সম্মানার্থ মহতীসভার অধিবেশন করিবেন। আপনারা অদ্য সভায় উপস্থিত হইবেন ও রাজসাক্ষাৎ লাভ করিবেন।

বিজয় সিংহ কহিলেন—ইহা আমাদিগের পরম সৌভাগ্য ও পরম গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। এ-সংবাদ দেওয়ায় মহাশয়কেও ধন্যবাদ। কিন্তু একটা কথা, সাধারণ প্রজাও রাজ আদেশ-লিপি প্রাপ্ত হয়, আমরা রাজার বিনা আদেশে কেমন করিয়া—

সেনাপতি বলিল—রাজ আদেশ-লিপি প্রজাদিগের মধ্যেই ব্যবহৃত হয়। আপনারা এ-রাজ্যের পরম বন্ধু। মহারাজের হৃদয়ের অতি নিভৃত প্রদেশের যে আনন্দ, তাহাই আপনারা রাজসভায় প্রাপ্ত হইবেন। যথাসময়ে আমার জনৈক প্রহরী আপনাদিগকে সংবাদ দিতে আসিবে, আপনারা তাহার পশ্চাৎপশ্চাৎ অতিসম্মানের সহিত সভায় নীত হইবেন।

মোরাদ কহিলেন—আপনার সদ্ব্যবহার প্রশংসনীয়। এখন সভায় উপস্থিত হইব কি না তাহা আমাদিগের বিবেচ্য।

—সে কি মহাশয়! আপনাদিগকে উপস্থিত হইতেই হইবে। তাহা না হইলে আমি রাজকুমারীর কাছে কৈফিয়ৎ কি দিব?

—তাহা মহাশয়ই বুঝিতে পারেন। এরূপ অভ্যর্থনার পরও যদি আমরা

রাজসভায় উপস্থিত না হই, ধর্ম্মাধিকরণের চক্ষে আমরা দোষী হইব না।

—বুঝিবেন মহাশয়! আপনারা উপস্থিত হইতে না চাহিলে, অগত্যা আমাকে অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

—আমরা বিবেচনা করি।

—উত্তম, দ্বাদশ ঘটিকার সময় আমি স্বয়ং আপনাদিগকে রাজসভায় লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিব। আপনারা যাহা হয় কর্ত্তব্য স্থির করুন। এই কথা বলিয়া সেনাপতি সগর্ব্ব পাদবিক্ষেপে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

মোরাদ বিজয় সিংহের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—কিছু বুঝিতে পারিলে?

—বুঝিয়াছি, আজ আমাদিগের বিচার হইবে। তার পর হয়ত প্রাণদণ্ড, না হয় শূল; ভাগ্যে যাহা থাকে একটা ব্যবস্থা হইবে।

—উপস্থিত হইতেই হইবে। যখন ধরা দিতেই আসিয়াছি, রাজসভায় উপস্থিত হইয়া পরিণাম দেখিব।

—তার পর!

—তার পরের ব্যবস্থা না করিয়া শত্রুপরিপূর্ণ মহাস্থান গড়ে পদার্পণ করি নাই। আমার সমস্ত সৈন্য গুপ্ত-বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছে। যথাসময়ে ছদ্মবেশে রাজসভায় উপস্থিত হইবে।

—উত্তম, তাহা হইলে প্রস্তুত হওয়া যাক্।

অতঃপর উভয়ে রাজোচিত বেশভূষা পরিধান করিলেন এবং যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া সেনাপতির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে সেনাপতি উপস্থিত হইল এবং হাস্যমুখে কহিল—দেখিতেছি, আপনারা প্রস্তুত হইয়া আছেন; আসুন, আর বিলম্ব করিবেন না।

বিজয় সিংহ উদ্দেশে থাল্‌তেশ্বরীকে প্রণাম করিলেন। মোরাদ

সহাস্যমুখে বিজয়ের হস্ত ধারণ করিলেন এবং উভয় বন্ধু সেনাপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাম্রদ্বারের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, রাজপথের উভয় পার্শ্ব পুষ্প-পতাকায় সজ্জিত। চারিদিকে একটা অভিনব উৎসবের সমারোহ। সু-উচ্চ মঞ্চোপরি নহবৎ বাজিতেছে। বাঁশীর করুণ সুরলহরী পৃথিবীতে নব মিলনের মধু গীতিকা ছড়াইয়া দিতেছে। সভামণ্ডপ সুবেশসুন্দর নানা শ্রেণীর জনগণে পূর্ণ। সভামণ্ডপের মধ্যভাগে সমুচ্চ মর্ম্মর বেদিকার উপর রাজসিংহাসন স্থাপিত। বেদিকার দক্ষিণ প্রান্তে মহামন্ত্রীর আসন। বেদিকার নিম্নভাগে অর্দ্ধ-বলয়াকারে কতিপয় বহুমূল্য আসন সারি সারি সজ্জিত। শান্তিরক্ষকগণ দুই দিকে জনস্রোত ঠেলিয়া রাজ আগমনের পথ মুক্ত করিয়া দিতেছে। অকস্মাৎ তুমুল বাদ্য ধ্বনি উত্থিত হইল।

রাজপুরুষগণ যে-যাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বেদধ্বনি করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে উপস্থিত হইলেন। তৎপশ্চাৎ সশস্ত্র সেনাপতি, সেনাপতির পশ্চাতে স্বয়ং মহারাজ পরশুরাম সশস্ত্র শরীর-রক্ষী সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া ধীরে ধীরে রাজসভার দিকে আগমন করিতে লাগিলেন। রাজার পশ্চাতে শুভ্র পরিচ্ছদধারী মহামন্ত্রী—তৎপশ্চাৎ সুন্দর সুবেশধারী যুবকদ্বয়, তৎপশ্চাতে রাজসভাসদ্‌গণ একে একে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া যে-যাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। বাদ্যধ্বনি থামিল, তখন চারণ ও ভাটগণ একে একে উপস্থিত হইয়া রাজগুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তৎপরে সুন্দরী সুবেশধারিণী দেবনর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত দ্বারা রাজগুণ কীর্ত্তন করিয়া চলিয়া গেল।—সভার কার্য্যারম্ভ হইল।

রাজাদেশে মহামন্ত্রী দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন :—উপস্থিত জনসাধারণ, মাননীয় রাষ্ট্রপতিগণ, রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ, সকলেই শ্রবণ করুন,—বিখ্যাত বিজয় সিংহ ও মীর্জ্জা মোরাদ নামক বীরদ্বয়, আপনাদের

অহিতাচরণ বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্তচিত্তে মহাস্থানরাজচ্ছত্রতলে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছেন। মহাস্থানরাজাধিরাজ বারেন্দ্রকুলতিলক পরম মাহেশ্বর পরশুরাম, পূর্ব্ববিবাদ ভুলিয়া বীরদ্বয়ের সম্মান ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন এবং পূর্ব্ব অপরাধের কোনরূপ দণ্ডবিধান না করিয়া অধিকতর সম্মানিত এবং গৌরবময় আসন প্রদান করিবার জন্যই সভাস্থলে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। এখন সকলে সম্মতিদান করিলেই মহারাজ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য বীরদ্বয়কে সম্মানিত করেন।

সকলেই সমস্বরে মহারাজের জয় ঘোষণা করিয়া মহামন্ত্রীর প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তখন মহারাজ নরসিংহ ধীরগম্ভীর বদনে কহিতে লাগিলেন—বৎস বিজয়! বীরশ্রেষ্ঠ মোরাদ! তোমাদের বীরত্বে আমি সন্তোষ লাভ করিয়াছি। তোমরা তোমাদের শক্তি, মহাস্থান রাজ্যের মঙ্গলকামনায় নিয়োগ কর ইহাই আমার একমাত্র ইচ্ছা। তোমরা যদি কায়মনোবাক্যে মহাস্থানের মঙ্গলে আত্মনিয়োগ কর, আমার বিশ্বাস, একদিন মহাস্থান গৌরবময় সাম্রাজ্যে পরিগণিত হইবে। বৎস বিজয়! প্রভুভক্ত মোরাদ! আমার পুত্র নাই—তোমাদের দ্বারা কি আমার পুত্রের অভাব পূর্ণ হইবে না?

বিজয় সিংহ দণ্ডায়মান হইয়া করজোড়ে কহিলেন—মহারাজ! আমারও পিতা নাই। এ পিতৃহীন সন্তান, এতদিন ভাগ্য-দোষে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত ছিল। আজ আপনার স্নেহ লাভ করিয়া আমি ধন্য—তৃপ্ত। এই বলিয়া বিজয় সিংহ অসি কোষমুক্ত করিলেন এবং তাহা রাজসিংহাসনতলে রক্ষা করিলেন। মস্তক হইতে উষ্ণীষ খুলিয়া রাজার চরণতলে রাখিয়া দিয়া কহিলেন—মহারাজাধিরাজ! আমি আপনার পদানত; আমার সৈন্যবল, আমার ক্ষুদ্ররাজ্য সমস্তই আপনার। ধমনীর শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত আমি মহাস্থানের মঙ্গলার্থ দান করিলাম।

মহারাজ পরশুরাম অত্যন্ত পুলকিত হইয়া কহিলেন—বৎস

বিজয়! তোমার রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে সামন্ত রাজার গৌরবময় আসন প্রদান করিলাম। আর অন্য তুমি সর্ব্বসম্মতিক্রমে থালুতাপতি হইলে। বৎস! আসন গ্রহণ কর।

বিজয় সিংহ আসন গ্রহণ করিলেন। তখন মীর্জ্জা মোরাদ নতজানু হইয়া কহিলেন--মহারাজ! আজ হইতে মোরাদও আপনার গোলাম। খোদা সাক্ষী - আমার ইমান সাক্ষী!

রাজা হর্ষ পরিপ্লুতাধরে কহিলেন বীরবর। তুমি আজ হইতে বিশাল গড় মহাস্থান রাজ্যের অন্যতম সেনাপতি।

—মহারাজ! আমি সন্তুষ্টচিত্তে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম।" আপনার আদেশ পালনই আজ হইতে আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য।

সমবেত জনগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সভাভঙ্গ হইবে—এমন সময়ে রাজকুমারীর সখী চঞ্চলা ধীরে ধীরে সভাস্থলে উপস্থিত হইল এবং করজোড়ে কহিল - মহারাজ! আমার কিছু বক্তব্য আছে।

মহারাজ কহিলেন - কি বক্তব্য মা! স্বচ্ছন্দে বলিতে পার।

—রাজকুমারী বিজয় সিংহকে কিছু পুরস্কার দিতে চাহেন, আপনার অনুমতি হলে দিতে পারি।

--এর আর অনুমতি কি মা?

চঞ্চলা বিজয় সিংহের দিকে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া সবিনয়ে কহিল— বীরবর! রাজকুমারী শীলাদেবী আপনার রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ এই বহুমূল্য কণ্ঠহার আর বিজয় নামক অসি আপনাকে দান করিয়াছেন, গ্রহণ করুন!

বিজয় সিংহ অবনত মস্তকে রাজকুমারীর প্রেরিত সেই কণ্ঠহার ও অসি সসম্মানে গ্রহণ করিলেন।

"জয় রাজকুমারী শীলাদেবী কি জয়"—রবে সমবেত জনতা পুনর্ব্বার জয়ধ্বনি করিল। অতঃপর সভাভঙ্গ হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

দুই সন্ন্যাসী

করতোয়া-তটে এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে দুই সন্ন্যাসী বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছেন। সম্মুখে এক সৈনিক-বেশী ব্যক্তি উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছে। সন্ন্যাসিদ্বয় পক্বকেশ বৃদ্ধ। কথোপকথন-নিরত সন্ন্যাসিদ্বয়ের একজন অপরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—তুমি কি পূর্ব্বেই আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলে?

—চিনিতে পারিব না কেন মহারাজ! ঐ আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল বক্ষ আর ললাটের ঐ ত্রিশূল-চিহ্ন ভাগ্যবান মহারাজ পরশুরামকে চিনাইয়া দিয়াছে।

—বাল্যবন্ধু! তোমার স্মৃতি আমার অন্তরে চিরজাগরূক। শৈশবে একসঙ্গে করতোয়া-সৈকতে সেই ধূলিখেলা সবই আমার স্মরণ আছে। জীবনের শেষ মুহূর্তে আবার যে তোমার সাক্ষাৎ লাভ করিব ইহা আমার মনে হয় নাই।

—যে-দিন হইতে গড় মহাস্থান পরিত্যাগ করিয়াছি, সেইদিন হইতেই মহারাজ! ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম। কত ঘটনার মধ্য দিয়া জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিবাহ করিলাম, সংসারী সাজিলাম—আবার কে জানিত, জীবনের শেষভাগে সন্ন্যাসী সাজিতে হইবে—আবার তোমার শরণাগত হইতে হইবে!

—পরমানন্দ! ভাই! আর কেন সে-কথা মনে করিয়া আমার মনে বেদনা দাও!

—অভিমান ত্যাগ করিয়াছি মহারাজ! তাহা না হইলে আবার তোমার শরণ লইতে আসিব কেন? দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত ক্রুদ্ধ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাস্থান ত্যাগ করিলাম—সে বন্ধুত্ব, সে প্রীতির বন্ধন এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন করিলাম। আজ কত দিন পরে তোমার পায়ের কাছে দাঁড়াইতে লজ্জা হইতেছে। কিন্তু কি করিব, তুমি যে বরেন্দ্রভূমির ভাগ্য-বিধাতা—তুমি না রাখিলে বরেন্দ্র-সন্তানকে আর কে রাখিবে!

—তুমি কি কিছু বলিতে চাহ?

—অভিযোগ করিতে আসিয়াছি, মহারাজ! বিচারকর্ত্তা তোমার কাছে সুবিচার চাই। জয়সহর তোমার রাজ্য। অগণ্য মুসলমান আত্রেয়ী-তীর ছাইয়া ফেলিয়াছে। আমার স্ত্রী পুত্র সকলেরই জাতি মারিয়াছে। আমার বাসস্থান দগ্ধ—ছিন্ন-ভিন্ন! আমি কোনওরূপে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছি। বন্ধু! মহারাজ! আজ পরমানন্দ সন্ন্যাসী—তাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসিবে না, সাধের হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর বসিবে না। আমি আমার জন্য আসি নাই, মহারাজ! সমগ্র বরেন্দ্র-ভূমির পক্ষ হইয়া অভিযোগ করিতে আসিয়াছি।

—সে কি! মুসলমান আসিয়াছে?

—বৌদ্ধ রাজারা নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছে। আর মহারাজ! তুমিই সর্ব্বনাশ করিলে, আগুন তুমিই জ্বালাইলে! কেন মহারাজ! এ বৃদ্ধ বয়সে গৌড়েশ্বরের অবমাননা করিলে?

—এ-কথা তোমাকে কে বলিল?

—গৌড়-দূত অপমানিত হইয়া মহাস্থান হইতে ফিরিয়া গিয়াছে।

—মিথ্যা কথা, একটা পরামর্শ হইয়াছিল মাত্র। সে পরামর্শমত কার্য্য করা হয় নাই। গৌড়ে বঙ্গেশ্বরের নিকট যথারীতি কর প্রেরণ করা হইতেছে।

—তাহা হইলে ধাকর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল লুণ্ঠন করিতে করিতে নিরাপদে

আত্রেয়ীতীর পর্য্যন্ত আসিতে পারিল কেন? গৌড়েশ্বর বাধা দিলেন না কেন? শুন মহারাজ! আতঙ্কে বরেন্দ্রভূমি থর-থর কম্পিত হইতেছে। প্রজাগণ ধন-প্রাণ লইয়া হাহাকার করিতেছে—আর রাজা তোমরা গৃহ-বিবাদে উন্মত্ত হইয়া নিচেষ্ট হইয়া বসিয়া আছ। এ দুঃখ কি আর রাখিবার স্থান আছে?

—তুমি কি গৌড়ে গিয়াছিলে?

—গৌড় কেন, প্রত্যেক রাজার দ্বারে দ্বারে ঘুরিলাম, কেহই আমার কথায় কর্ণপাতও করিল না। হেমন্ত সেন গৌড় আক্রমণ করিয়াছে। গৌড়রাজ আত্মরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত—কে কার কথা শুনে। তোমার কাছে আসিলাম, ভাবিলাম প্রতীকার হইবে। কিন্তু সে আশাও বিফল। তুমি এই সুযোগে কিসে স্বাধীন হইতে পার তাহারই চেষ্টা করিতেছ। মহারাজ! তোমার রাজ্যমধ্যেই এখন মুসলমান আসিতেছে। তুমি প্রজারক্ষার উপায় না কর, আত্মরক্ষারও উপায় কর নাই। তোমার রাজ্য তুমিই লুণ্ঠন করিতেছ—নিয়ত দরিদ্র প্রজার অভিশাপ গ্রহণ করিতেছ। তোমার বিপদে কে সাহায্য করিবে মহারাজ!

মহারাজ পরশুরাম পরমানন্দের কথার কিছুই উত্তর দিলেন না। সৈনিকের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—মোরাদ!

—জনাব!

—তুমি মুসলমান, আমার শত্রুও মুসলমান।

—আপনার বিশ্বাস?

—আমার বিশ্বাস পূর্ব্বের মতই অটল। বৎস! শীঘ্র রাজধানীতে ফিরিয়া চল। এই সুযোগে না জানি চিহ্লন কি সর্ব্বনাশ ঘটায়।

পরমানন্দ কহিল—মহারাজ! আমার অভিযোগের উত্তর!

রাজা পরমানন্দের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন—তোমার উত্তর এখন কি দিব! পরমানন্দ! বন্ধু! আমার সমূহ বিপদ। গড় মহাস্থানে

শত্রুপরিপূর্ণ। ভিতরে শত্রু—বাহিরে শত্রু। কোন্ শত্রু কোন্ সুযোগে কি করিবে কেমন করিয়া বলিব। এত বড় রাজ্যের রাজা আমি, এত বড় একটা সংবাদ আজিও আমার কর্ণগোচর হয় নাই। আমাকে বৃদ্ধ দেখিয়া সব শত্রুই এখন মাথা তুলিতেছে। এই বলিয়া তিনি অনুচরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—মোরাদ!

—মহারাজ!

—শীঘ্র থাল্‌তায় সংবাদ পাঠাও। অবস্থা বুঝিয়াছ?

—বুঝিয়াছি মহারাজ! আপনি স্থির হউন। চারিদিকেই সুব্যবস্থা করিতেছি।

—শত্রু যাহাতে আত্রেয়ী পার না হইতে পারে তাহার উপায় কর।

—উত্তম, আমি চলিলাম। সেলাম। এই বলিয়া সৈনিক প্রস্থান করিল।

উভয়ে গাত্রোত্থান করিবেন, এমন সময়ে এক মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ-ভিক্ষু সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহার কঙ্কালসার দেহ দেখিয়া পরমানন্দ কহিল—মহারাজ। এই দেখ তোমার সুবিচারের স্মৃতি-চিহ্ন।

—কে এ? এ ব্যক্তির মস্তকে গভীর ক্ষত কেন?

—হতভাগ্য ভিক্ষুর এ দশা হইয়াছে কেন শুনিবে? মহারাজ! তোমার রাজধানীর এত নিকটে যোগীর ভবন গ্রামে লুণ্ঠন কার্য্য চলিতেছে, আর তুমি তাহা শুনিতে পাও নাই এ-কথা কে বিশ্বাস করিবে? মঙ্গলনাথ আশ্রম হইতে চঞ্চলা নাম্নী এক যুবতী অপহৃত হইয়াছে তাহাও কি শুন নাই?

—ওঃ, স্মরণ হইয়াছে; এক ব্রাহ্মণ-বালিকা রাজকুমারীর আশ্রয়ে বাস করিতেছে, তাহার নাম চঞ্চলা। আর বিশেষ কিছুই জানি না।

—জান না কেন মহারাজ! প্রজা তোমার কাছে সুবিচার পায় না

ইহা কি তোমার গৌরবের কথা, না চিহ্লনকে দমন করিতে তোমার শক্তি নাই!

—পরমানন্দ! ভাই! সবই বুঝি, সবই জানি। কিন্তু কি করিব— আমার অবস্থা বুঝিয়া তুমি আমায় ক্ষমা কর।

—তবে কি এ দরিদ্র ভিক্ষু তোমার কাছে সুবিচার পাইবে না?

পরমানন্দের মুখ চোখ আরক্তিম হইয়া উঠিল—আত্মসংযম করিয়া ক্ষণ পরে কহিল—বুঝিয়াছি মহারাজ। রাজ্য সেনাপতির নয়, রাজ্য তোমার। তুমি যদি অত্যাচারের সহায়তা না কর—সেনাপতির সাধ্য কি? নরসিংহ! বৃদ্ধ হইয়া বিবেক হারাইয়াছ, বোধ হয় তোমার বিচার-শক্তিও নাই।

—ভাই! আর তিরস্কার করিয়ো না। কিসের রাজ্য—কিসের ঐশ্বর্য্য! এই রাজ্যে যদি প্রজাগণের দুঃখের ভাগী হইতে না পারি, তাহাদের দুঃখ দূর করিতে না পারি—তবে আমার রাজা নামের সার্থকতা কি? ঐশ্বর্য্য রসাতলে যাক্!

—হাঁ মহারাজ! ঐশ্বর্য্য কিছুই নয়। মানব অসার ঐশ্বর্য্যের মোহে দম্ভে আত্মহারা হয়। কীর্ত্তিমান্ মহারাজ পরশুরাম! সুবিচার কর। অত্যাচারীকে দণ্ডিত কর, রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'ক্। চারণগণ যুগ-যুগান্তর তোমার কীর্ত্তি গাথা গান করুক।

—বৌদ্ধসন্ন্যাসী! তোমার অভিযোগ কি?

ভিক্ষু বলিতে লাগিল—মহারাজ! আমার অভিযোগ অনেক। দুরাত্মা চিহ্লন তিন তিন বার মঙ্গলনাথ সঙ্ঘারাম লুণ্ঠন করিয়াছে। সন্ন্যাসী চন্দ্রদেবকে নিহত করিয়া চঞ্চলা নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-কুমারীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। মহারাজ! সুবিচার করুন।

—উত্তম, তুমি কল্য প্রত্যূষে রাজদরবারে হাজির হইবে।

—যে আজ্ঞা।

—তোমার নাম ?

—নরনাথ।

কঙ্কালসার ভিক্ষু ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল। পরমানন্দ কহিল—আর কেন মহারাজ! দেখিতে দেখিতে দিবা দ্বিপ্রহর অতীত-প্রায়। আজিও কি রাজধানীতে ফিরিবে না ?

—বোধ হয় ফিরিব না, ক্ষুধা তৃষ্ণার হস্ত এড়াইতে হইলে এক স্থানে অতিথি হইতে হইবে।

—ও-মূর্ত্তি দেখিলে রাজধানীর এত নিকটে সকলেই চিনিয়া ফেলিবে

—তবে বুঝি ভাগ্যদেব আজ অদৃষ্টে কিছুই লিখেন নাই।

—তীর্থ-পর্য্যটনে ধৈর্য্যশীল হও নাই কি ?

—বিশেষরূপে বন্ধু! এ ছদ্মবেশে যে শান্তি লাভ করিলাম, এমন শান্তি বুঝি রাজার ঐশ্বর্য্যে নাই। এমন স্বচ্ছ সুবিমল আকাশতলে, তৃণ-গুচ্ছের সুকোমল শয্যায় কতদিন আনন্দে কাটাইয়াছি। তটিনীর স্বচ্ছ সুবিমল বারি পানে, ভিখারীর শ্রমলব্ধ অন্নে, অন্তরে সুধার আস্বাদ অনুভব করিয়াছি। মনে হইতেছে বিশ্ব-মানব আমার সঙ্গে প্রীতির আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। আমি আপন প্রাণ বিশ্বের উদার প্রাণের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া কোন্ অভিনব বাস্তব রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি।

—তবে এস বন্ধু! আজ অনাহারে, বিশ্বপ্রকৃতির শোভা দেখি—ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে সরিয়া যাইবে।

—ও কি ? শ্মশানের প্রান্তদেশ হইতে রোদন-ধ্বনি উঠিতেছে নয় ?

—হাঁ মহারাজ! তাই ত—আহা কে এ অভাগিনী! কার সান্ত্বনার তারা হৃদয়-আকাশের কোল হ'তে নিবে গেছে! ঐ শোন মহারাজ!

—চল বন্ধু, দেখা যাক্।

উভয়ে ধীরে ধীরে শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গুপ্ত-মন্ত্রণা

কুচক্রী হরপালের আবাসভবনের এক সু-প্রশস্ত কক্ষ আজ নিশীথে আলোকোজ্জ্বল। কক্ষতল মূল্যবান গালিচায় মণ্ডিত। এক প্রান্তে দুগ্ধ-ফেন-নিভ সুকোমল শয্যা। হরপাল সেই শয্যায় শয়ন করিয়া বিভোরে নিদ্রা যাইতেছে। এমন সময়ে ছদ্মবেশী চিহ্লন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া হরপালের হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইয়া তুলিল। হরপাল চমকিত হইল—তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিস্মিতভাবে আগন্তুকের মুখপানে চাহিয়া বলিল—এত রাত্রে যে?

—সর্ব্বনাশ হইয়াছে হরপাল।—মাতঙ্গী ধরা পড়িয়াছে।

—ব্যাপার কি ভাঙ্গিয়াই বল না!

—কি আর হইবে। আমাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়াছে।

—কেন?

—তোমার প্রদত্ত বিষ মাতঙ্গী দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়াছিল। কিন্তু সেই দুগ্ধ ঘটনাক্রমে রাণী পান করিয়া মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা।

—উপায়!

—উপায় কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। বুঝি এত আয়োজন, সমস্তই অদৃষ্ট-দোষে ব্যর্থ হয়।

—কি করিতে কি হইল ভাই।

—বিশেষ চিন্তার কারণ কিছুই নাই। অকারণে একটা স্ত্রী-হত্যা হইল মাত্র।

—আহা! রাণীর কোনও দোষ নাই। তাঁহাকে মারিয়া আমাদের

কি হইল! শিশু রাজকুমার জীবিত থাকিলে আমাদের কোন আশাই সফল হইবে না।

—দেখিতেছি সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক হইল না, মাঝেথেকে একটা গুরুতর দোষের বোঝা স্কন্ধে চাপিয়া বসিল।

-- মতিয়া কোথায়?

—সতর্ক প্রহরীবেষ্টিত হইয়া রাজকুমারীর মহালে বন্দিনী।

—উপায়? সব রহস্য ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

—মতিয়াকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা আর অন্য উপায় নাই।

—আর এক উপায় আছে।

—কি?

--পলায়ন।

—এখনও সে পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয় নাই। হরপাল বুঝিতেছ না, দূরে সরিয়া গেলে কার্য্যসিদ্ধি এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। মতিয়া সহজে প্রকাশ করিবে না।

--সিংহিনীর কবলে পতিত হইলে, তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

—আর কি কোন উপায় নাই।

—এক উপায় আছে। সেই উপায়ই শ্রেষ্ঠ উপায়।

-- কি?

—চঞ্চলা পাখী ফাঁদে পড়িয়াছে।

—বিশ্বাস করিয়ো না বন্ধু! জগতে স্ত্রী-চরিত্র বড়ই রহস্যপূর্ণ।

—প্রেমের মোহে অসম্ভবও সম্ভব হয়। বুঝিয়াছ বন্ধু! চঞ্চলা আমাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে

—তুমি কি তাহাকে ভালবাস না ভাই?

—হরপাল! বন্ধু! চঞ্চলাকে সত্যই আমি ভালবাসিয়াছি। কিন্তু আমার কথা স্বতন্ত্র। রমণীর বিলোল কটাক্ষেও আমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হই না।

—কার্য্যের প্রারম্ভেই একটা শীতলতা হইল, মন যেন কেমন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

—এখনই এমন করিলে চলিবে কেন? দেখ হরপাল, তোমারই জন্য আমি এতদূর অগ্রসর হইয়াছি। তোমার অপমান আমার হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হয়। নতুবা, আমি কি পাষণ্ড? আমারও হৃদয় আছে, আমার অন্তরেও করুণা আছে।

—বন্ধু! দুঃখিত হইয়ো না। আমারই জন্য তোমার মস্তকে গুরুতর দোষের বোঝা চাপিতেছে, তাহাও জানি। হাজার হউক আমার বয়স তোমার চেয়ে অল্প, তাই একটুতেই কাতর হইয়া পড়ি।

—হরপাল! ভাই, ধৈর্য্য ধারণ কর। ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখ—রক্তস্রোতের মধ্যে রাজ সিংহাসনের ভিত্তিমূল প্রোথিত। তোমার সিংহাসনপ্রাপ্তির শুভ মুহূর্ত্ত দিনে দিনে নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

—সিংহাসন চাহি না—যাহার জন্য তোমার পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, আমার সেই সাধ পূর্ণ করিয়ো আর কিছু চাহি না।

—নিশ্চিন্ত হও, চেষ্টা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে। গর্ব্বিতা শীলাদেবী একদিন তোমার বামে বসিয়া মহাস্থান-সিংহাসন আলো করিবে।

—বন্ধু! জীবনে কি কখনো সে শুভদিন আসিবে?

—ভয় নাই! বৃদ্ধরাজা দিনে দিনে মৃত্যুর দুয়ারে অতিথি হইতেছে। একমাত্র কণ্টক শিশু রাজকুমার। আজ হউক, কাল হউক তাহাকে দুনিয়া হইতে সরাইয়া দিব! রাণী মরিলে শোকার্ত্ত বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইতে আর অধিক দিন বিলম্ব হইবে না।

—সাবধানে কার্য্য করিয়ো। ঘুণাক্ষরেও যেন কেহ টের না পায়।

—সেইজন্যই ত চঞ্চলাকে হাত করা। বুঝিয়াছ হয়! মিষ্ট মুখে জগতে অনেক অসম্ভব কার্য্য সম্পাদিত হয়।

—এখনকার কর্ত্তব্য কি ?

—যদি মতিয়াকে হস্তগত করিতে না পারি, তবে আমাকে বিপদে পড়িতে হইবে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। যদি আকস্মিক কোনও কিছু ঘটে তবে পুর্ব্ব-উপদেশ মত কার্য্য করিয়ো।

—চন্দ্রদেবের হত্যাকাণ্ডের কথা রাজার কানে উঠিতে পারে।

—সে-বিষয়ে আমি খুব সতর্ক।

—বন্ধু! আমার একমাত্র ভরসা তুমি। চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া কার্য্য করিয়ো—যাহাতে বিপদ না আসিতে পারে। তুমি বিপন্ন হইলে কর্ণধার-বিহীন তরণী কে চালনা করিবে ভাই ?

—ব্যস্ত হইয়ো না হরপাল! আরও অনেক অনুষ্ঠান করিতে হইবে। নরসিংহের অদৃষ্টাকাশ ক্রমশই অন্ধকারাবৃত হইয়া আসিতেছে। ব্যস্ত হইয়ো না, স্থিরভাবে আমার উপদেশমত কার্য্য কর। এই ব্যাপারে রাজপুরীতে একটা ভীষণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবার সম্ভাবনা।

—মোরাদের সৈন্যদল কি রাজধানীতে পৌছিয়াছে!

—এখনও পৌছে নাই। মহারাজ রাজধানীতে আসিলেই, মোরাদও দলবল লইয়া আসিবে। সেজন্য ভীত হইয়ো না। গড়-মহাস্থানের বিপুল-বাহিনী আমারই অর্থে বশীভূত।

—আমি এখন কি করিব ?

—পূর্ব্বে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ কর। কোথায়, কি ভাবে তাহারা অবস্থান করিতেছে, কে তাহাদের নায়ক, সৈন্য-বলই বা কত, সমস্ত বিষয় তন্ন-তন্ন করিয়া জানিয়া আসিবে।

—পিতা যে এ-বিষয়ে মত দেন না।

—মহারাজ মাধব? তাঁহাকে মত দান করিতেই হইবে। তাঁহার সাহায্য না পাইলে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন হইবে। বুঝিতেছ ত?

—তাঁহার মত করাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

—দেখিয়ো হরপাল! প্রতিশ্রুতি পালন করিতে যেন ভুলিয়ো না। তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য আমি এ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

—এ-কার্য্যে আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিব। অর্থের জন্য চিন্তিত হইয়ো না! আমি কেন, সমস্ত সামন্তরাজাই ভিতরে ভিতরে তোমার প্রভূত সাহায্য করিবে।

—হিন্দু রাজারা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে বলিয়া বোধ হয় না।

—বিশেষ ক্ষতি নাই। আমি তুমি যদি ঠিক থাকি আর ভগবান সুযোগ দেন, বোধ হয় কাহারও সাহায্য আবশ্যক হইবে না।

—আমি রাত্রির মত চলিলাম, হঠাৎ যথাস্থানে না দেখিলে লোকে সন্দেহ করিতে পারে।

—রাত্রি প্রভাত হইলে আমিও গড়-মহাস্থান ত্যাগ করিব।

—আজকার দিনটা থাকিয়াই যাও। দেখা যাউক কি হয়।

—বেশ। এই বলিয়া চিহ্লন দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। হরপাল সেই শয্যায় পুনরায় শয়ন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিসর্জ্জন

কালরাত্রি পোহায় না। রাজান্তঃপুরে রজনী দ্বিপ্রহর সময়ে সমস্ত লোক জাগ্রত কেন? লোকজন এত ছুটাছুটি করিতেছে কেন? রা...

প্রকোষ্ঠে, বারাণ্ডায় এত জনসমাগম কেন? মন্ত্রী পুণ্ডরীক বারাণ্ডায় কুশাসনে উপবেশন করিয়া গণ্ডদেশে হস্তস্থাপন করিয়া কি ভাবিতেছেন? এ কি কালরাত্রি! মহারাণী শুভদেবী কক্ষতলে রোগশয্যায় শায়িতা। অকস্মাৎ নিশা দ্বিপ্রহরে তাঁহার কি হইয়াছে?

—রাজবৈদ্য শয্যার পার্শ্বদেশে বসিয়া মহারাণীর হাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন। রাজকুমারী শীলাদেবী শোকগম্ভীর বদনে, নির্ণিমেষ নয়নে জননীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। রাণীর সংজ্ঞা নাই। চঞ্চলা খলে ঔষধ মাড়িয়া কবিরাজের দিকে চাহিল। কবিরাজ কহিলেন, একটু বিলম্ব করুন। আমি অন্য ঔষধ দিতেছি, মস্তকে লেপন করুন। তাহা হইলে তাঁহার সংজ্ঞা লাভ হইতে পারে। এই বলিয়া কবিরাজ একটী বাটীতে ঔষধ ঢালিয়া দিলেন। চঞ্চলা রাণীর মস্তকে ঔষধ মালিস করিতে লাগিল।

—রাজকুমারী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, কি দেখিলেন বৈদ্য মহাশয়!

—কি আর দেখিব মা! মহারাণীর শরীরে বিষের ক্রিয়া অনুভব করিতেছি। তীব্র বিষপানে মহারাণী সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছেন।

শীলাদেবী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—বিষ! বিষ কোথা হইতে আসিল? কে এ সর্ব্বনাশ করিল কবিরাজ মহাশয়! তবে কি, মা আমার বাঁচিবেন না?

—সেটা মানুষের হাত নয় মা! আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। যদি চেতনা হয়, তাহা হইলে একটা উপায় হইতে পারে। আমি যে ঔষধ প্রয়োগ করিলাম ইহাতে আমি এইরূপ রোগী অনেক আরোগ্য করিয়াছি।

পুণ্ডরীক ত্বরিত পদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—কি বলিলেন, বিষ! মহারাণী বিষ পান করিয়াছেন!

কি বোকছেন বোকা মশাই ;

Engraved by The National Halftone Co.

শীলাদেবী ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন—মন্ত্রী কাকা! সব বুঝিয়াছি, আর বুঝিতে বাকী নাই। বিশ্বাসঘাতিনী মতিয়া, মাকে আমার নিজের হাতে বিষ খাওয়াইয়াছে। এতক্ষণে বুঝিলাম, পিতা যথার্থই দুগ্ধ দানে এতদিন কালসর্প পুষিয়া আসিতেছেন। হাঁ কাকা! ধর্ম্ম কি নাই? অগাধ বিশ্বাসের পরিণাম কি এই? কবিরাজ মহাশয়! যদি আমার মাকে বাঁচাইয়া দিতে পারেন, আপনি আপনার ইচ্ছামত পুরস্কার পাইবেন।

- মা! ব্যস্ত হইয়ো না। আমি সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটী করিব না।

কবিরাজ নাড়ী টিপিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে কহিলেন—আমার ঔষধে কাজ হইয়াছে। মহারাণী এখনই চৈতন্য লাভ করিবেন। তাহাই হইল। অৰ্দ্ধ ঘটিকা পরে রোগিণী চক্ষুরুন্মীলন করিলেন।

চঞ্চলা রোগিণীর মুখে অল্পে অল্পে ঔষধ ঢালিয়া দিতে লাগিল। কবিরাজ কহিলেন—এই ঔষধের ক্রিয়া হইলে রোগিণী ইচ্ছামত কথা কহিতে পারিবেন।

বৈদ্যবরের অত্যাশ্চর্য্য ঔষধের গুণে মুমূর্ষু মহারাণী কিয়ৎকাল পরেই ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিলেন। কবিরাজ স্বয়ং পুনরায় আর একমাত্রা ঔষধ পান করাইলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপ আবার জ্বলিয়া উঠিল।

মহারাণী ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন এ কি? আমার কক্ষে কে ইহারা?

শীলাদেবী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—মা! ইনি রাজবৈদ্য। ইনি তোমার প্রাণদান করিয়াছেন। আমি যে তোকে জন্মের মত হারাইয়াছিলাম মা!

মহারাণী হতাশভাবে কহিলেন কে? আমার মা শীলা! মা! এযে ভীষণ শত্রুপুরী—কিরূপে তোমরা রক্ষা পাইবে! আমার মনে দুঃখ রহিয়া গেল, অন্তিম সময়ে তাঁর পায়ে মাথা দিয়া মরিতে পাইলাম না। অনেক সাধ ছিল, সব সাধই আমার মনে রহিয়া গেল। কে আমার বাছাহট্টুকে কালসর্পের মুখ হইতে রক্ষা করিবে। শীলা! তোমার মন্ত্রী কাকা কোথায়?

পুণ্ডরীক রোরুদ্যমান কণ্ঠে কহিলেন,—এই যে মা, আমি এখানে।

মহারাণী অতিকষ্টে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া ক্ষীণ স্বরে কহিলেন—মন্ত্রী, পুত্র! ব্রাহ্মণ-সন্তান তুমি। মাতৃহারা বালক! এই ক্ষত্রিয়ানী স্তন্য দান করিয়া তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছে। পালন-গৌরবে আমি তোমার মাতৃত্বের দাবী করি। মহারাজ তোমাকে তোমার পিতার সম্বন্ধে কনিষ্ঠের মত ব্যবহার করেন, তাই শীলা তোমাকে কাকা বলিয়া ডাকে। পুত্র! আমার সন্তান দুটীকে তোমার করে অর্পণ করিলাম। এই ভীষণ শত্রুপুরীতে আর কাহাকে বিশ্বাস করিব।

পুণ্ডরীক কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন—মা! তোমার স্নেহে, তোমার যত্নে আমি এতদিন মায়ের অভাব অনুভব করি নাই। আজ আমাকে কাঁদাইয়া, স্নেহময়ী শীলাদেবীকে কাঁদাইয়া, কোথায় যাইতেছ মা!

—কাঁদিয়ো না বাপ! ইহাই জগতের নিয়ম। মা শীলা! আর আমার বেশী সময় নাই। কত কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে কিন্তু পারিতেছি না। জিহ্বা জড়াইয়া আসিতেছে। একটু জল—

মহারাণীর অবস্থা দেখিয়া কবিরাজ হতাশভাবে কহিলেন—ফল অন্যরূপ দাঁড়াইল। রাণীমার মুখে গঙ্গাজল দিন।

শীলাদেবী জননীর মুখে পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী-বারি প্রদান করিলেন। রাণী পুনরায় অতিকষ্টে ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, মা শীলা! কাঁদিয়ো না। কান্নার সময় অনেক পাইবে। আমি চলিলাম—মহারাজ রহিলেন। বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহিপূর্ণ গড়—তাঁর জীবন নিরাপদ নয়। কুমার রহিল, তাহাকে সাবধানে রক্ষা করিয়ো। মহারাজ! আর দেখা—

রাণী আবার চেতনা হারাইলেন। রাজকুমারীর চক্ষে জল নাই, পলক নাই, তিনি নিশ্চল পাষাণপ্রতিমার মত দাঁড়াইয়া, মুমূর্ষু জননীর মুখপানে চাহিয়া আছেন। চঞ্চলা শীলাদেবীর হস্ত ধারণ করিয়া

কহিল—দেবি! অধীরা হইবেন না। আপনিই রাণীমার পুত্র। পুত্রের কার্য্য করুন। এখনও রাণীমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয় নাই।

শীলাদেবী কাতর নয়নে পুণ্ডরীকের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—মন্ত্রাকাকা! রাজেন্দ্রকে সাবধানে রক্ষা করুন। আমি মাকে লইয়া তীরস্থ করি।

মন্ত্রী পুণ্ডরীক শোকাশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—চল মা! আমি কুমারকে কোলে করিয়া আসিতেছি।

—অবিলম্বে কতকগুলি শ্মশান-বন্ধু সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং রাণীর মুমূর্ষু দেহ লইয়া করতোয়ার শ্মশানের দিকে চলিল। কতকগুলি সশস্ত্র সৈন্য, মশালধারী ও কাষ্ঠবাহকগণ এবং বিপুল জনসঙ্ঘ কোলাহল করিতে করিতে রাজপথ দিয়া চলিয়া গেল।

পুণ্ডরীক বিশ্বস্ত সৈনিকগণকে রাজান্তঃপুরে পাহারায় নিযুক্ত করিলেন। শীলাদেবীকে শ্মশান পর্য্যন্ত যাইতে দিলেন না। বালক রাজকুমার রাজেন্দ্র মাতার মুখাগ্নিক্রিয়া করিবেন। এজন্য পুণ্ডরীক তাহাকে কোলে করিয়া শ্মশানে লইয়া গেলেন।

কয়েক জনে ধরিয়া মহারাণীর মরণোন্মুখ দেহ করতোয়ার পবিত্র সলিলে অর্দ্ধনিমগ্ন করিয়া রহিল। রাণীর কর্ণে কেহ উচ্চৈঃস্বরে তারকব্রহ্ম নাম শুনাইতে লাগিল। দেহে তখনও প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইতেছিল। এমন সময়ে এক গৈরিকবসনপরিহিত সন্ন্যাসী ত্বরিত পদে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রী পুণ্ডরীক সে-মূর্ত্তি দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, এ কি দেখিতেছি? মহারাজ! এতক্ষণে! এ যে আমার মাতৃ-প্রতিমার বিসর্জ্জনের সময়!

সন্ন্যাসী হতাশভাবে রাণীর মুমূর্ষু দেহের পানে চাহিয়া কহিলেন—রাণি, আমায় একাকী ফেলিয়া চলিয়া গেলে?

সে-স্বর বুঝি মুমূর্ষু দেবীপ্রতিমার অন্তঃস্তল স্পর্শ করিল। নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নেত্রদ্বয় ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিল। মহারাণী ঊর্দ্ধনেত্রে যেন সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিলেন। তার পর সব স্থির। সে চক্ষুতে আর পলক পড়িল না।

সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসী! মহাপুরুষ! তোমার চক্ষে জল কেন?

শুষ্ক চন্দন কাষ্ঠ [illegible] আগে হু হু করিয়া চিতার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে মহারাণীর দেহ ভস্মীভূত করিয়া অনলদেব লোলিহান জিহ্বা সংযত করিল।

মন্ত্রী শুভঙ্কর রাজার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন— তোমার ত বিসর্জ্জন হইল— আর কেন মহারাজ! ফিরিয়া চলুন।

ফিরিব [illegible] ফিরিব। আমি রাজা, আমি বরেন্দ্রভূমির অধীশ্বর— প্রিয়তমা পত্নীর জন্য এক বিন্দু চোখের জল ফেলিবারও আমার অবসর কই? চল মন্ত্রী, এই জরাগ্রস্ত দেহ লইয়া আবার রাজকার্য্যে মনোযোগ করি। মহারাণী বলিলেন—আমি ত জীবিত আছি। এই বৃদ্ধের বক্ষে শত শেলাঘাত সহ্য করিবে। নিরাশ্রয় উৎপীড়িত প্রজাপুঞ্জ এই পতনোন্মুখ বৃক্ষের তলায় আশ্রয় লইতে ছুটিয়া আসিতেছে। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, অনশনে অর্দ্ধাশনে দরিদ্রের দিন যাইতেছে, আর তাহাদের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া, চহলনপ্রমুখ অত্যাচারিগণ আপন উদর পরিপুষ্ট করিতেছে। এ রাজ্য আমার নয় মন্ত্রী! রাজ্য সেনাপতির। আমার [illegible] নাম নিরর্থক। ঐ যে মোরাদ আসিতেছে? এস মোরাদ! সংবাদ কি?

[illegible] ও মীর্জ্জা মোরাদ দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া, শ্মশান ক্ষেত্রেই ছুটিয়া আসিয়াছেন। শোককাতর মোরাদ রাজাকে সেলাম করিয়া কহিলেন—জনাব! সংবাদ নিতান্ত অশুভ নয়। আমি কয়েকজন

বিশ্বস্ত অনুচরকে সঠিক সংবাদ অবগত হইবার জন্য আত্রেয়ী-তীরে পাঠাইয়াছি।

—আর আর?

—গালতায় দ্রুতগামী সংবাদবাহক পাঠাইয়াছি।

—রাজ-আদেশ-লিপি পাঠাইয়াছ?

—হাঁ জনাব! তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া আসিবার জন্য রাজকীয় আদেশলিপি পাঠাইয়াছি।

—উত্তম, মীর! চল, এই শ্মশান-ক্ষেত্র হইতে যাইয়াই আমি মন্ত্রণাগারে সকলকে আহ্বান করিতেছি। তার পূর্ব্বে আমার আর এক আদেশ শ্রবণ কর। মোরাদ! তুমি অদ্য হইতে নগাস্থান রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সেনানায়ক হইলে। সর্ব্বময় কর্তৃত্ব আমি তোমাকেই প্রদান করিলাম।

—সেলাম জনাব! দাসের প্রতি আপনার অসীম অনুগ্রহ। খোদার কাছে প্রার্থনা করি, আমি যেন পদোচিত গৌরব রক্ষা করিয়া তাঁহার রাজ্যে চলিয়া যাই।

—সেনাপতি! তোমার সুশিক্ষিত সৈন্যগণ?

—আসিয়াছে। তাহারা এই নগর মধ্যে অবস্থান করিতেছে। সেনাপতি তাহাদিগকে গড় মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই।

—আমার আদেশ-লিপি দেখাইয়াছ?

—হাঁ জনাব!

—তথাপি? ইহা বিদ্রোহিতার প্রথম সূচনা। মোরাদ! সেনাপতির যোগ্যসম্মানে পাপিষ্ঠ চিল্লনকে এই মুহূর্ত্তে বন্দী কর।

মোরাদ অসি কোষমুক্ত করিয়া শস্ত্র শিরে সদর্পে কহিলেন — যো হুকুম। অতঃপর ত্বরিত পদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পুণ্ডরীক সমস্তই বুঝিলেন। এ-বিষয়ে মহারাজকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না।

রাজা কহিলেন—পুণ্ডরীক ! ঐ বৃক্ষতলে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া আন !

পুণ্ডরীক চলিয়া গেলেন। রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন মনে কহিলেন—হায় মানব তোমার প্রাণ হইতে প্রিয়, শ্রেয় হতে শ্রেয়, আত্মীয়গণকে শ্মশান-ক্ষেত্রে রাখিয়া পুনরায় সংসারপথে ছুটিয়া চল কেমন করিয়া !

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নারী-চরিত্র

—ওগো ! তুমি পালাও।

—পালাব কেন ?

—তোমায় ধরিতে আসিতেছে।

—কে ?

—তুমি কি শোন নাই ?

—তা শুনিতে পারি। তাতে তোমার কি চঞ্চলা !

—আমার কি ? আমার যে কি, তা তো নিজেই বড় বুঝিতে পারি না। দেখ কথায় কাজ নাই, তুমি শীঘ্র পলায়ন কর।

—পলায়ন ? কে পলায়ন করিবে ? আমি ? অসম্ভব। সুন্দরি ! তুমি যাও। আমার মত পাপিষ্ঠের জন্য, তোমার কোমল হৃদয়ে ব্যথা লাগিয়াছে —তাহা বুঝিয়াছি। আমি পলায়ন করিব না। ফিরিয়া যাও। এখনই রাজপুরুষগণ আসিয়া পড়িবে। তখনকার অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখ। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। কেহ দেখিতে পাইবে—মিনতি করি চঞ্চলা ! ফিরিয়া যাও। আমি বেশ সাবধানেই আছি।

—শুনিলে না? আমি গুপ্তদ্বার খুলিয়া রাখিয়াছি। ঐ পথে বাহির হইয়া যাও। কেহই জানিতে পারিবে না। বুঝিতেছ না—বিচারে যে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।

—ব্যাকুল হইয়ো না—ব্যাকুল হইয়া আমার সব দিক নষ্ট করিয়ো না। এমন সাধ্য কাহারও নাই আমায় প্রাণে মারিতে পারে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যাও। আবশ্যক হইলে পুনরায় তোমার দর্শন পাইব কি?

—বলিতে পারি না। তুমি বাহির হইয়া গেলে আমি নিশ্চিন্ত হইতাম। তোমার চক্ষুর সম্মুখে আর দাঁড়াইতাম না। বুঝিতেছ না চিহ্লন! আমি কি হইয়া যাইতেছি। আমি দিনে দিনে অজ্ঞানিত ভাবে, কোথায় নামিয়া যাইতেছি। তুমি গেলে আমি রক্ষা পাই। আমি কেন, বুঝি সমস্ত মহাস্থান রাজ্যের মঙ্গল হয়। পায়ে পড়ি, তুমি যাও—সব দিক রক্ষা হ'ক।

—বেশ ত, রাজ্যের শত্রু—তোমার পরম শত্রু নিধন হইবে। সে তো তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক – তবে তার জন্য ব্যাকুল হইতেছ কেন? সুন্দরি! ধীরে—এতদূর অগ্রসর হইয়ো না। ফাঁদে পা দিয়াছ। যাও—ফিরিয়া যাও। তোমার সরলতা আমায় মুগ্ধ করিয়াছে। তাই তোমায় মুক্তি দিলাম। তোমা হইতে আমার অনেক কার্য্য সিদ্ধি হইত, আর তাহা করিতে চাহি না। সরিয়া যাও।

—চিহ্লন! যখন চন্দ্রদেবকে হত্যা করিয়াছিলে, তখনই আমি আত্মঘাতিনী হই নাই কেন? সব শেষ হইয়া যাইত। আমার কার্য্য দেখিয়া তাঁর প্রেতাত্মা হাসিতেছে। বলিতে পার কি চিহ্লন! মানুষ এমন হয় কেন? অমানুষী ক্রোধ, জ্বলন্ত প্রতিহিংসানল, কোন্ যাদুমন্ত্রে নি[illegible] গেল? যে-চক্ষু তোমায় ঘৃণা করিয়াছে, সেই চক্ষু তোমার মু[illegible] দেখিলে তৃপ্তি লাভ করে। আমি আপনা আপনি দগ্ধ হইতেছি—তু[illegible] গেলে আমি শান্তি পাইতাম।

—চঞ্চলা! তুমি কি আমায় ভালবাসিয়াছ? বড় ভুল করিয়াছ সুন্দরি! পাষাণের মত অন্তর, এ-হৃদয়ে কোমলতার লেশ পাইবে না। মনুষ্যত্বহীন, নরঘাতকের প্রতি তোমার এ অযাচিত করুণা কেন? দেবা-প্রতিমা! বীভৎস নরকোৎসবে সহায়তা করিতে আসিয়াছ? তুমি সরলা বালিকা। অপাত্রে হৃদয় দান করিয়ো না। অনন্ত ছলনা, অসংখ্য প্রতারণা পূর্ণ অন্ধকার হৃদয়ে তোমার মত দেবীপ্রতিমার স্থান নাই।

ভালবাসি—তাই কি আসিয়াছি? না—না, তা নয়। তুমি মরিবে কেন? কুক্কুরের মত প্রাণ হারাইবে—আমি যে তাহা সহ্য করিতে পারিব না। চিহ্লন! কে বলে তোমায় ভালবাসি। আমি তোমার অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।

—উন্মাদিনী! ঐ শোন, তুর্য্যনিনাদ শোন, এ অবস্থায় অন্যে দেখিতে পাইলে তোমার কি দশা হইবে একবার ভাবিয়া দেখ।

—আমি যাই। আর তোমাকে দেখিতে চাহিব না। আর তোমার সম্মুখে আসিব না, আমি মরিব।

—মরিয়ো না—আত্মঘাতিনী হইয়ো না। যদি সত্যই ভালবাসিয়া থাক, তবে জানিয়া রাখ সুন্দরি! চিহ্লনকে কেহ প্রাণে মারিতে পারিবে না। যাও, নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যাও।

চঞ্চলা সকরুণ-নয়নে চিহ্লনের মুখপানে চাহিয়া অতিসন্তর্পণে ধীরে ধীরে গুপ্তদ্বার পথে সেনাপতির প্রকোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। চিহ্লন বিস্মিত-ভাবে তাহার গমন-পথের দিকে কিয়ৎকাল চাহিয়া কহিল—কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমার প্রকোষ্ঠে গুপ্তদ্বার আছে, আমি ত তাহা স্বপ্নেও অনুভব করি নাই।

কুহেলিকায় সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন। চিহ্লন কক্ষ হইতে বাহির হইবে, প্রাঙ্গণের ইতস্তত পদচারণা করিতেছে, আর কি চিন্তা করিতে।

চিহ্নলন ভাবিতেছে, কোন্ পথে যাই। সুপথ কিম্বা কুপথ দুইটার একটা স্বেচ্ছা করিয়া মানুষ বাছিয়া লইয়া আপন জীবনের গতি স্থির করে। সুপথ—আচ্ছা, ভাবিয়া দেখি। যাহা সুগম, যাহা সুখবোধ্য, তাহাই কি সুপথ নয়? কে জানে? যে-পথ বহুকাল পরিত্যাগ করিয়াছি; নিরীহ ভালমানুষটীর মত আর সে-পথে চলিতে পারি কই? আমার পক্ষে তাহা স্বপ্ন। ভালমানুষটীর মত থাকিলে জীবনে তাহার উন্নতি কোথায়? চক্ষের সম্মুখেই দেখিতেছি, সাধু, সদাশয়, পরহিতব্রত ব্যক্তি দারিদ্র্যের পেষণে জর্জরিত। মহাত্মা তুগুরাক মহাস্থানের মন্ত্রী হইয়াও দিন দিন দারিদ্র্যকে বরণ করিতেছে; আর আমি, কুটিল পন্থা অবলম্বন করিয়া অতুল ধনের অধিপতি হইয়াছি। দরিদ্র ব্রাহ্মণ অভাবের তাড়নায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া মহাস্থানে আসিলাম, লাঞ্ছিত হইয়া ক্ষত্রবৃত্তি অবলম্বন করিলাম, কারণে অকারণে শত শত নরহত্যা করিলাম। আশা পূর্ণ হইল—ধন সঞ্চিত হইল। তবুও তৃপ্তি নাই—আবার নূতন আশা আবার নূতন কল্পনা। প্রভু! আশ্রয়দাতা মহাস্থানরাজ! তুমি বড় ভ্রম করিয়াছ; ভ্রমে কালসর্পকে গৃহে স্থান দিয়াছ। এখন দংশন-জ্বালা সহ্য কর। আমায় প্রাণে মারিতে পারিবে না। বিজয় সিংহ—মীর্জা মোরাদ, কেহই আমার সঙ্কল্পে বাধা দিতে সমর্থ হইবে না। মোরাদ! বীরত্বে সাহসে যদিও তুমি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যদিও অগণিত সৈন্য তোমার সহায়, কিন্তু আমার কৌশলের কাছে তুমি অতি তুচ্ছ। এখন একটু পশ্চাৎপদ হইতে হইল আশা পূর্ণ করিতে একটু বিলম্ব ঘটিল। কয়েকজন সামন্তরাজ আমার হস্তগত হইয়াছে—কিন্তু একটা প্রবল শক্তি চাই। গৌড়েশ্বর জয়পাল, হেমন্ত সেন আত্মবিদ্রোহে উন্মত্তপ্রায়, তাহাদের দ্বারা আমার কার্য্যের সাহায্য হইবে না। দুইটা কণ্টক সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। কাঁটা তুলিতে কাটার আবশ্যক; কিন্তু তাহা পাই কোথায়! হাঁ, একটু আশা হইয়াছে বটে—দেখা যাক্ কি হয়।

সহজে আর সে-পথে নামিতেছি না। হরপালটা পাগল। মহাস্থান সিংহাসন, আর শীলাদেবী লাভের আশায় দাসবৎ আমার কার্য্য করিতেছে। আমিও ত তাই চাই। স্বপ্নের মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইব। কে বলিতে পারে অন্ধকার, দুর্গন্ধময় কারাকক্ষ তাহার ভবিষ্যৎ আবাসস্থল নির্দ্দিষ্ট হইবে না? শীলাদেবী বিজয় সিংহের অঙ্কলক্ষ্মী হইবে! তবে আমি কোন্ আশায় কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হইতেছি? সরলতা, সদ্‌গুণের অধিকারী হইলে দুনিয়া কাহাকেও সৌভাগ্যের অধিকারী করে না। তাই আমি, বিপদ্, বিভীষিকা, মৃত্যুভয় পূর্ণ, অন্ধকার পথে ছুটিতেছি। কে বলিতে পারে আমার ভাগ্যে কি আছে!

সহসা চিহ্লনের অগাধ চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়িল। দেখিল, সম্মুখে কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক পুরুষ দণ্ডায়মান। চিহ্লন বিস্মিত হইল না—কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—কে তোমরা—কি চাও?

—আমরা নবাগত মহাস্থান-সেনা।

—আমরা কাছে কি প্রয়োজন?

—আপনিই কি সেনাপতি চিহ্লন?

—হাঁ।

—মহারাজের আদেশ শ্রবণ করুন।

আমি বুঝিয়াছি। আমাকে বন্দী করিতে আসিয়াছ?

—কি করিব মহাশয়? রাজাদেশ।

—উত্তম, রাজাদেশ প্রতিপালন কর। তোমাদের প্রভু কোথায়?

—আপনি স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার না করিলে, অগত্যা প্রভুকে সংবাদ দিতে হইবে।

—সামান্য সৈনিকের হস্তে আমি বন্দী হইব না। তোমার প্রভুকে পাঠাও।

কয়েকজন সৈনিক চিহ্লনকে ঘিরিয়া রহিল। একজন সেনাপতি মোরাদের নিকট সংবাদ দিতে গেল। কিয়ৎকাল পরে প্রায় বিংশতি জন সশস্ত্র সৈনিক পুরুষ সেইস্থানে আগমন করিল।

চিহ্লন কহিল—আবার তোমরা আসিলে কেন?

জনৈক সৈনিক উত্তর করিল—আপনি রাজাদেশ পালন করিতেছেন না।

—আমি একবার মাত্র সেনাপতি মোরাদের সহিত সাক্ষাতের প্রার্থী।

—সাক্ষাৎ হইবে না—আমাদের প্রভু রাজপুরীতে নাই।

—কোথায়?

—বন্দীর সহিত সে পরিচয় দান নিষ্প্রয়োজন। এরূপ বাক্যালাপ রীতিবিরুদ্ধ। আপনি বিনাবাক্যব্যয়ে রাজাদেশ পালন করুন—অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বন্দিবেশ গ্রহণ করুন।

সেনাপতি চিহ্লন মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া অবস্থা বুঝিয়া লইল। আর বাক্যব্যয় করিল না; নীরবে পদোচিত বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া বন্দিবেশ গ্রহণ করিল। সৈন্যগণ তাহাকে ঘিরিয়া লইয়া কারাগৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কারাগৃহে

মহাস্থানরাজের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ চিহ্লন রাজাদেশে কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে। আগামী কল্য রাজদরবারে তাহার সমস্ত অপরাধের বিচার হইবে, এ-সংবাদ চারিদিকে তাড়িত বার্ত্তার ন্যায় ঘোষিত হইল। শত শত প্রজা কেহ-বা অভিযোগ করিতে, কেহ কেহ-বা বিচারফল

জানিবার জন্য রাজধানীতে সমবেত হইতে লাগিল। সকলেই চিহ্লনের শেষ পরিণাম দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিল। রজনী দ্বিতীয় প্রহর—চারিদিক নিস্তব্ধ। এই নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মাঝে মাঝে কেবল প্রহরীদিগের উচ্চ হাঁক শ্রুতিগোচর হইতেছে। রাজকীয় ঘটিকা যন্ত্রে ঢং ঢং করিয়া দ্বাদশ ঘটিকা বাজিল। কারাগৃহের যে-কক্ষে চিহ্লন বন্দী, চারিজন সশস্ত্র প্রহরী বিশেষ সতর্কতার সহিত সেই কক্ষের চারিদিকে পাহারা দিতেছে। ঘণ্টাধ্বনি হইবার পর প্রহরীচতুষ্টয় চলিয়া গেল। পুনরায় অপর চারিজন প্রহরী সেই স্থান অধিকার করিল এবং ঘন ঘন পদচারণা করিয়া আপনাদিগের কর্মকুশলতা জানাইতে লাগিল। প্রহরী চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন ছদ্মবেশী হরপাল। চিহ্লনের বিশ্বস্ত বন্ধু মাধবপুর-রাজকুমার হরপাল অপূর্ব্ব ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়াছে। জনৈক প্রহরী তাহাকে কহিল—ভাবে ঝিমাস্ কেন ?

—জানিস্ কি ভাই ! বড্ড নেশা হয়েছে—দাঁড়াতে পাচ্ছিনা। মাথাটা ঘুরিয়া পড়িতেছে।

—বটে ? অত মদ খেয়েছিস কেন ? বেহুঁস হয়ে পড়েছিস্ যে।

হরপাল একবার 'হোর' করিয়া বমনের অভিনয় করিল, মাতালের মত মত্ততার ভাণ করিয়া জড়িতকণ্ঠে কহিল—পা—পা—পাহারা দেওয়া ব—বা স্বকুমারীর কাজ। জনমানব লোক ছিল না, বাছা বাছা সৈন্য দিয়ে কারাগারে পাহারা! বাহবা বিচার, বড়—মা—মানের—কাজ পেয়েছি বাবা! বুড়ো—রা—রাজার যেমন বুদ্ধি। এ—ভাই রাজারাম! হিয়া মোটা মোটা লোহার সিক—নিশ্চিন্ত থাক দাদা! কয়েদীর বা—বাবার সাধ্যি কি পালায়। জেলখানা যে কয়েদী ঠিক রহো - রাম শো যাই। হরের্নামৈব কেবলম্।

হরপাল জনৈক প্রহরার পরিত্যক্ত খাটিয়ার উপর ধপাস্ করিয়া শুইয়া পড়িল— এবং কিয়ৎকাল মধ্যেই ঘন-ঘন নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিল।

অপর প্রহরীর নাম রামরাজা। রামরাজা জয়পালের অবস্থা দেখিয়া আপন মনে বলিল—এই সব নেমক-হারামের গুলিকে যদি একে একে মহাকালীর মন্দিরে বলি দেওয়া হয় তবেই ইহাদের প্রতি যথার্থ বিচার করা হয়।

রামরাজা দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ ও সাহসী যোদ্ধা। উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে সহচরদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া ঘন-ঘন পদচারণা করিতে লাগিল এবং এক একবার বন্দী কি-ভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিতেছিল। কারা কক্ষের এক কোণে একটা মৃন্ময় প্রদীপ মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। রামরাজা সেই ম্লান আলোকে দেখিল চিহ্লন জানুদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া বিমর্ষ-ভাবে বসিয়া আছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া অন্তরে ঈষৎ করুণার উদ্রেক হইল। রামরাজা অনুচ্চস্বরে ডাকিল, সেনাপতি মহাশয়! বিস্মিতভাবে চিহ্লন তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। কহিল—কে? রামরাজ! তুমি প্রহরায় নিযুক্ত। ভাল, আর কি লোক ছিল না?

রামরাজা ব্যঙ্গস্বরে কহিল—না, এ আর বেশী কি সেনাপতি মহাশয়! এ ত কর্ত্তব্য কার্য্য। আপনি যদি বন্দী না হইতেন, তাহা হইলে আমাদের পাহারা দিতে হইত না। স্বয়ং সেনাপতি বন্দী রামরাজার মত লোক পাহারা না দিলে কে দেবে বলুন। তার জন্য আমি দুঃখিত নই। এই রূপেই যেন নেমকের ধারটা শোধ করিয়া যাইতে পারি।

চিহ্লন রামরাজার কথার অর্থ বুঝিতে পারিল। বুঝিল এ এক প্রকার মিষ্ট তিরস্কার। আর কিছু বলিল না। মস্তক অবনত করিয়া নীরবে রহিল।

রামরাজা কহিল—বন্দীর সহিত বাক্যালাপ রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু আপনার এ-অবস্থা দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হইতেছে, তাই দুই চারিটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যিনি জীবনের সমস্ত সুখ উপেক্ষা করিয়া মহাস্থান রাজ্যের অশেষবিধ উন্নতি সাধন

করিয়াছেন—মহারাজ যাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষা বিশ্বাস করিতেন, হঠাৎ কি অপরাধে তাঁহার উপর এরূপ কঠিন আদেশ প্রয়োগ করিলেন সেনাপতি মহাশয় ?

চিহ্লন মস্তক উন্নত করিয়া কহিল—আরও বল রামরাজা! মহাস্থানকে কে গৌরবময় সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছে! মলদ্, বিরাট, কাম্‌তা, সুহ্ম প্রভৃতি রাজ্যের পরাক্রান্ত রাজগণকে কে বাহুবলে পদদলিত করিয়া দাসরাজা নরসিংহের পদতলে মস্তক অবনত করাইয়াছে।

রামরাজা কহিল—তা জানি; আপনি না হইলে বোধ হয় এমন অসাধ্যসাধন কেহই করিতে পারিত না। মহাস্থানরাজ্যের এই যে উন্নতি ইহা আপনারই গৌরবের নিদর্শন।

চিহ্লন গর্ব্বিত স্বরে কহিল—যে অসাধ্য সাধন করিতে পারে, সে কি নীচ? এই প্রশস্ত ললাট, এই বিশাল বাহু কি ভিখারী বালকের, না, হীনবীর্য্য কাপুরুষের?—না, তা নয়।

চিহ্লনের এই গর্ব্বোক্তি রামরাজার ভাল লাগিল না। তথাপি যেন সহানুভূতির স্বরে বলিল—আপনার অদৃষ্টে যে এমন শোচনীয় পরিণাম লিখিত ছিল, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না।

রামরাজার এই কথায় চিহ্লন অস্থির হইয়া কহিল—বলিতে পারি না, আমার ভাগ্যলিপি কি? আমার পরিণাম কি? আমার যেন মনে হয়, আমার সৌভাগ্যই আমাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছে।

চিহ্লনের কথাটা রামরাজার প্রাণের গভীরতর অংশে প্রবেশ করিল। মনোভাব গোপন রাখিয়া কহিল—এই আকস্মিক বিপদে আপনার মস্তিকের কিছু গোলাযোগ হয় নাই ত?

চিহ্লন কহিল—না রামরাজা! আমি পূর্ব্বের মতই প্রকৃতিস্থ আছি। আশার ছলনায় বিভ্রান্ত আমি; পিপাসিত কুরঙ্গের মত ছুটিতেছি—আমার এ-তৃষ্ণা নিবারণ হইবে না? না জানি অদৃষ্টে কি আছে!

চিহ্লনের এইরূপ দৃপ্ত বাক্য শুনিয়া রামরাজা অন্তরে হাসিয়া বলিল—ভগবানের নাম করুন, অবশ্যই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন।

চিহ্লন বলিল—ভগবান? কোথায় তিনি? তাঁহার ঈশ্বরত্ব বুঝি লোপ পাইয়াছে। তা যদি থাকিত আমি প্রতিকার্য্যে বাধা পাইতাম। আমার গন্তব্য পথ এরূপ সুগম হইত না। আমার চক্ষুর এই দানবী দীপ্তি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে মহাস্থান রাজ্যের সর্ব্বনাশের নব নব পন্থা দেখাইয়া দিতেছে, তবুও তিনি বাধা দিতে আসেন না!

রামরাজা অবিবেকী চিহ্লনের ভগবানের প্রতি এইরূপ অবিশ্বাস দেখিয়া কহিল—দেখিতেছি, সত্য সত্যই আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। মার্জ্জনা করিবেন সেনাপতি মহাশয়! নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইল, এখনই আমাদের পরিবর্ত্তে অন্য প্রহরী আসিতেছে। প্রণাম— এক্ষণে বিদায়।

চিহ্লন বলিল—হাঁ রামরাজা! আমিও তোমার কাছে বিদায়। মৃত্যুর দ্বারে অতিথি আমি, হয়ত জগতের কাছে এই আমার চির-বিদায়। তুমিও আমার প্রীতি-সম্ভাষণ গ্রহণ কর।

এই সময়ে কক্ষ মধ্যস্থ প্রদীপটা দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল। গাঢ় তমিস্র সমস্ত কক্ষ আচ্ছন্ন করিল।

রামরাজা ও অপর প্রহরীদ্বয় প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে একবার হরপালকে ডাকিল। সে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—কেন বাবা বিরক্ত কর—ঘুমুতেও দেবে না। যাও বাবা, আমি বেশ খাড়া জেগে সমস্ত রাত পাহারা দিচ্ছি—যাও—যাও।

রামরাজা ও প্রহরীদ্বয় প্রস্থান করিল।

রাত্রি আর এক প্রহর অবশিষ্ট। পুনরায় একদল নূতন প্রহরী আসিল। এই প্রহরীদিগের মধ্য হইতে একজন সুপ্ত হরপালের হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইয়া বসাইল। হরপাল চক্ষু মেলিয়া দেখিল, প্রহরিগণ তাহার পরিচিত। তাহাদিগকে সেখানে দাঁড়াইতে বলিয়া হরপাল একবার বেশ

করিয়া এ-দিক ও-দিক দেখিয়া লইল, তৎপরে কারা-কক্ষের অতি নিকটে গিয়া ডাকিল, সেনাপতি মহাশয় !

চিহ্লন অনুচ্চস্বরে কহিল—হরপাল ?

হরপাল কহিল—হাঁ, আপনি প্রস্তুত হউন। হরপাল অতি মৃদু বংশীধ্বনি করিল। অমনি কারাকক্ষের ছাদ হইতে কতকগুলি ইষ্টক স্থানচ্যুত হইল। অবিলম্বে সেই রন্ধ্র পথে একটা মই মৃদু সর-সর শব্দ করিয়া কক্ষ মধ্যে নামিল। চিহ্লন ধীরে ধীরে সেই মই অবলম্বনে ছাদের উপর উঠিয়া গৃহের পশ্চাৎ প্রান্তে উপস্থিত হইল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দেখিল এক গাছি রজ্জু ছাদের সহিত লৌহ-কীলকে আবদ্ধ। সেই রজ্জু অবলম্বন করিয়া চিহ্লন ধীরে ধীরে ভূমিতলে অবতরণ করিল। প্রতিদ্বারের প্রহরিগণ হরপালের প্রদত্ত অর্থে বশীভূত। চিহ্লন অনেক পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া নির্বিঘ্নে প্রসিদ্ধ তোরণ তাম্রদ্বার সমীপে উপস্থিত হইল। চিহ্লনের সৌভাগ্যে তাম্রদ্বারের বিশ্বস্ত প্রহরিগণও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। সে বিনা বাধায় একেবারে মহাস্থান গড়ের বহির্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহই তাহাকে বাধা দিতে সক্ষম হইল না।

ভোর হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। চিহ্লন অতি দ্রুতপদে পার-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, হরপালের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। পারঘাটে এক খানি মকরমুখ নৌকা বাঁধা। নৌকায় কোন আরোহী না দেখিয়া চিহ্লন নিঃসন্দেহে নৌকায় উঠিয়া বসিল। নৌকা ছাড়িবার সময়ে দেখিল, এক অন্ধকার মূর্ত্তি আস্তে আস্তে নৌকায় উঠিতেছে। চিহ্লনের হৃৎপিণ্ড দুরু-দুরু কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত শরীরের রক্ত জল হইবার উপক্রম হইল। আরোহী কিছু বলিল না। নৌকা ছাড়িয়া দিতে সঙ্কেত করিল।

চিহ্লন ভাবিল, আরোহীও বুঝি হরপালের প্রেরিত। তাড়াতাড়ি

নৌকা ছাড়িয়া দিল এবং প্রাণপণে দাড় টানিতে লাগিল। ক্ষুদ্র নৌকা যেরূপ বেগে ছুটিল বোধ হয় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বহুদূরে চলিয়া যাইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জল-পথে

কল্লোলিনীর জলতরঙ্গ ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র ছিপ তীরবেগে ছুটিয়াছে। চিহ্লন অবিরাম প্রাণপণে দাড় টানিতেছে। নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই, শ্রমজনিত ললাটের ঘর্ম্ম মুছিবার সময় নাই, এজন্য চিহ্লন নৌকারোহীকে একবার ফিরিয়াও দেখে নাই। দুই তীরে কত গ্রাম, কত জনপদ এড়াইয়া ছিপ অগ্রসর হইতেছে। সহসা নৌকারোহী ব্যক্তি নৌকা তীরে ভিড়াইতে বলিল। এখানে দুই তীরে ভীষণ অরণ্য। নানাজাতীয় বিহঙ্গের কাকলীতে বনভূমি মুখরিত হইতেছে। চিহ্লন দাড় রাখিয়া একবার শ্রান্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল এবং নৌকারোহী ব্যক্তির মুখপানে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল—কে তুমি?

—ভাই! কে আমি! বড় কঠিন প্রশ্ন।

চিহ্লন এই অদ্ভুত উত্তর শুনিয়া ভাবিতে লাগিল—তবে কি আমি ভুল করিলাম? এ বেটা কি হরপালের লোক নয়? প্রকাশ্যে কহিল—দেখ যে হও তুমি, আমি বড়ই বিপদে পড়িয়া তোমার নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।

নৌকারোহী ব্যক্তি কহিল—ভয় কি ভাই! খোদা বিপন্নের আশ্রয়-দাতা। তুমি বেশ করিয়াছ, খোদার বিজয়কেতনের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিপদ তাহার কাছেও আসিতে পারে না।

চিহ্লন কহিল—আকার প্রকারে তোমাকে যবন বলিয়া বোধ হইতেছে। সত্য পরিচয় দানে আমার উৎকণ্ঠা দুর কর। আমি বড়ই বিপন্ন।

'যবন' কথাটা শুনিয়া সেই ব্যক্তি বিরক্তির স্বরে কহিল—যবন কি? বিধর্মী কি? অন্ধ! এখনও চিনিতে পার নাই? সাম্প্রদায়িকতার অহঙ্কারে মানুষ চিনিতে পার না। পশু নয়, পক্ষী নয়, বিধাতার সৃষ্টি মধ্যে একমাত্র তত্ত্বদর্শী জাতি বিদ্যমান, তার নাম মানুষ। অধোগামী নয়! সমদর্শিতার তুঙ্গ শৃঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াও। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখ—উচ্চ নাই, নীচ নাই—জগতে এক মহান্ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। যবন বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়ো না।

চিহ্লন অপ্রতিভ হইয়া কহিল—তুমি কে?

নৌকারোহী ব্যক্তি কহিল—ঈশ্বরপ্রেরিত তোমার আশ্রয়দাতা আমি, ইহার অধিক পরিচয় জানি না।

—ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ! আমি বড় বিপন্ন; প্রাণ-ভয়ে এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি।

—খোদা আশ্রিতকে রক্ষা করেন। আমার সঙ্গে এস—নির্ভয়ে তাঁর রাজ্যে বাস কর।

অপরিচিত ব্যক্তির এইরূপ সহানুভূতিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া চিহ্লন কহিল—তবে কি তুমি সুলতান সাহ?

—হাঁ, আমিই সুলতান সাহ। ঐ নামে আমাকে সকলেই জানে। সংসার-ধর্ম্মে অনুরাগবিহীন সর্ব্বত্যাগী ফকির আমি খোদার নামে তরবারি ধারণ করিয়াছি।

—কেন?

—উদ্দেশ্য, মানবধর্ম্মস্থাপন। অবিশ্বাসী অন্ধের হৃদয়ে বিশ্বাসের বীজ রোপণ করিয়া একমাত্র খোদার সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিপন্ন করাই একেশ্বরবাদ। উহাই ইস্‌লাম ধর্ম্ম। নাস্তিক অবিশ্বাসী শয়তানকে ভুলিয়া হটতে সরাইয়া দিয়া এই প্রেম-ধর্ম্মসংস্থাপনই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

অপরিচিত ব্যক্তির এই কথা শুনিয়া চিহ্লন ব্যগ্র হৃদয়ে কহিল— আমি ধর্ম্ম বুঝি না। ধর্ম্মানুরাগের জন্য তোমার শরণাগত হইতে চাহি না। হৃদয়ে তীব্র অনল হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। বড় অপমান—সুলতান সাহ, বড় জ্বালায় তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি।

সুলতান সাহ চিহ্লনের মনের অবস্থা বুঝিয়া কহিল—খোদার বিজয়-কেতনের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে কাহাকেও নিরাশ হইয়া ফিরিতে হয় না। আমি তোমাকে আশ্রয় দিলাম।

চিহ্লন আশ্বস্ত হইয়া কহিল—তুমি কেন মহাস্থানে আসিয়াছিলে?

—তোমারই উদ্ধারার্থে।

—কে তোমাকে পাঠাইয়াছিল?

—খোদা।

—আমি কে? আমার সঙ্কল্প কি, তা কি জান?

—জানি। তুমি মহাস্থান-সেনাপতি চিহ্লন। আমি যুবরাজের আদেশে কারাগৃহ হইতে তোমায় উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলাম।

—যুবরাজ কে?

—বল্খ্ রাজ্যের যুবরাজ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এতদ্দেশে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারার্থে সসৈন্যে আগমন করিয়াছেন।

চিহ্লন ব্যগ্রচিত্তে কহিল—আমি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাই।

—আমি তাঁহার কাছেই তোমাকে লইয়া যাইতেছি।

—কেন?

—তুমি এই রাজ্যমধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা কর।

—তাহাতে লাভ?

—যাহা চাও তাহাই পাইবে। সংসার, রাজ্য, সম্পদ আমরা কিছুই চাহি না। রাজ্যময় ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

চিহলন আশ্বস্ত হইয়া কহিল—আমি যাহা চাহিব তাহা দিবেন কি ?

—হাঁ, তুমি ইসলামের শরণাগত, খোদা তোমাকে আশ্রয় দিয়াছেন। তুমি খোদার কার্য্য সম্পন্ন কর; তিনিই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। অগণিত ধনরত্নপরিপূর্ণ মহাস্থান নগরীর সিংহাসন তোমার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার।

হজরৎ, রাজা নরসিংহ বর্ত্তমান থাকিতে এ প্রদেশে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার সহজ হইবে না।

তাই যদি হয়, রাজাকে জাহান্নমে পাঠাইব। উপযুক্ত সাহায্য পাইলে আমরা অতি অল্পায়াসে গড় হস্তগত করিতে পারি। আমার পরাক্রান্ত সৈন্যদল পিপীলিকাশ্রেণীর মত গড় ঘিরিয়া ফেলিবে।

—আমি প্রাণপণে আপনার সাহায্য করিব। বৌদ্ধ-রাজগণ কেহ প্রকাশ্যে, কেহ-বা পরোক্ষে আপনার সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

—উত্তম, এ-কার্য্যে তুমিই আমাদের দক্ষিণ হস্ত। তোমার সাহস, তোমার বিক্রমের বিষয় আমি অবগত হইয়াছি। জানিয়া রাখ বীর! তুমি প্রার্থী, আমরা দাতা। তুমি সাহায্য চাহিতেছ, আমরা সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইতেছি। কিন্তু যেন বেইমানী করিয়ো না।

—শপথ করিব কি, হজরৎ!

—প্রয়োজন নাই। তোমার বাক্যই আমাদের বিশ্বাস। আমরা তোমার কথার উপরে নির্ভর করিয়াই এ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেছি।

—এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।

—আপাততঃ আমাদের আস্তানায় চল। যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ কর।

—আস্তানা কোথায় ?

—ফকিরের আস্তানার স্থিরতা নাই। বৃক্ষতলে, জন-শূন্য প্রান্তরে,

অথবা নদীতটে—সুবিধামত স্থানেই আস্তানা করা হয়। কাল যেখানে আস্তানা দেখিয়াছ, আজ সেখানে না থাকিতেও পারে।

—নৌকা-পথে আর কত দূর যাইতে হইবে?

—আর অল্প দূরেই কশাড় বন। বনান্তরালে নৌকাখানি ডুবাইয়া রাখিয়া পদ-ব্রজে যাইতে হইবে।

—আপনার নৌকাখানা বড়ই সুন্দর।

—হাঁ, এমনভাবে প্রস্তুত, দূর হইতে দেখিলে বোধ হইবে, তরঙ্গ মধ্যে এক মকর মৎস্য মস্তক উন্নত করিয়া ছুটিয়াছে। এই নৌকায় আমি অনেক বিপদসঙ্কুল স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকি।

একাকী নির্ভয়ে অগণিত শত্রু-পুরীতে গিয়াছিলেন, ধন্য আপনার সাহস।

প্রাণের ভয় করিলে এ-কার্য্যে সাহসী হইব কেন?

—কোনও সামন্তরাজ কি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে?

—প্রকাশ্যে নহে, অপ্রকাশ্যভাবে কেহ কেহ রাজা নরসিংহের বিরুদ্ধে যুবরাজের কাছে অভিযোগ করিয়াছে বৈ কি!

—যুবরাজ কি অভিযোগ শ্রবণ করিয়াছেন?

—পাষণ্ডগণের দমনের জন্যই তাঁহার এতদ্দেশে আগমন। শুনিবেন না কেন? তবে তোমার মত ব্যক্তির সাহায্য না পাইলে আমরা দূর হইতে কি করিতে পারি।

সুলতান সাহেব কথায় চিল্লন অতিশয় গর্ব্ব অনুভব করিয়া কহিল—তাহা যথার্থ। আমিও অপমানিত, লাঞ্ছিত হইয়া মহাস্থান-রাজপুরীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনার শরণাগত হইলাম। ছলে, বলে, কিম্বা কৌশলে মহাস্থানের সর্ব্বনাশ সাধন করাই আমার জীবনের মূলমন্ত্র। সুলতান! বাঘমতীর স্রোতের মত নরসিংহের রাজ্য টল-মল করিতেছে। যে-কেহ সামান্য চেষ্টায় এখন গড় অধিকার করিতে পারে'।

পতনোন্মুখ বৃক্ষের মূল আমিই এতদিন ধারণ করিয়া ছিলাম। এখন সামান্য আঘাতেই জীর্ণবৃক্ষ ভূমিসাৎ হইবে।

—হাঁ, এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করি নাই। তোমার নাম কি ভাই?

—চিহ্লন মিশ্র।

—না, অদ্য হইতে তোমার নাম মহম্মদ খাঁ। এই নামে তুমি আমার আস্তানায় সকলের নিকট পরিচিত হইবে। হিন্দু নামে পরিচিত হইলে ইস্‌লাম-সৈনিকগণ তোমাকে সম্মানের চক্ষে দেখিবে না।

—জনাব! আজ চিহ্লন মিশ্র মরিল। আপনার অনুগত সেবক মহম্মদ খাঁ সম্মুখে দণ্ডায়মান। যাহা কর্তব্য হয় আদেশ করুন।

—মহম্মদ! ভাই! আজ যে তুমি আমাকে কত সুখী করিলে তাহা আর কি বলিব। অদ্য হইতে তুমি আমার অন্তরের একস্থান অধিকার করিয়া রহিলে। তোমার মঙ্গলসাধন আমার এ-জীবনের প্রধান কর্তব্য। আর বিলম্বে কাজ নাই, এখন নৌকা ছাড়িয়া দাও। তোমার অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকেই চর প্রেরিত হইবে। এখনো আমরা নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে পারি নাই।

সুলতানের সাহের নূতন অনুচর মহম্মদ খাঁ পুনরায় নৌকা ছাড়িয়া দিল। মৎস্যাকার নৌকা পবনগতিতে হেলিয়া দুলিয়া ছুটিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণাগার

মন্ত্রণাগারের এক নিভৃত কক্ষে বহুমূল্য আসনে মহারাজ পরশুরাম বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখকমল চিন্তাক্লিষ্ট। অদূরে রাজকুমারী পৃথক

আসনে বসিয়া কত কি ভাবিতেছেন। সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রাজকুমারী কহিলেন—পিতা! আমায় কি জিজ্ঞাসা করিবেন?

মহারাজ পরশুরাম তনয়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—মা! তোমাকে যাহা বলিবার জন্য তোমার মহাল হইতে ডাকিলাম, তাহা ভুলিয়া যাইতেছি। বয়সের দোষ! যেরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বের সেই বল-বিক্রম ফিরাইয়া আনিতে পারিলে ভাল হয়। কাল ত কাহারও কথা শুনে না! তিমলন কারাগৃহ হইতে পলায়ন করিল, সেটা যে মঙ্গলের কথা নয় তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছ। মা! আমি বৃদ্ধ, এই জরাজীর্ণ দেহ কয়দিন ধরাধামে বর্ত্তমান থাকিবে? ভাবিয়া দেখ, বালক রাজপুত্রের প্রতিভূস্বরূপ বিপন্ন নরসিংহের রাজত্ব কে রক্ষা করিবে? তাই ভাবিতেছিলাম, তোমায় পাত্রস্থ করিয়া রাজ্যভার জামাতার করে অর্পণ করি। শুভদেবী আমার সমস্ত শক্তি হরণ করিয়া গিয়াছেন।

শীলাদেবী কহিলেন—বাবা! রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যাহা উচিত মনে করেন, তাহাই করিবেন।

মহারাজ পরশুরাম স্নেহার্দ্রস্বরে কহিলেন—বিজয় সিংহ রূপে গুণে অতুলনীয়; ভাবিতেছি, তাহার করে তোমাকে অর্পণ করিলে, সমস্ত বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

শীলাদেবী মস্তক অবনত করিলেন। রাজা কহিলেন—মা! লজ্জা করিয়ো না। তোমার গর্ভধারিণী থাকিলে, আমি তোমার কাছে এ-প্রস্তাব করিতাম না। তুমি আমার একমাত্র দুহিতা। তোমাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

রাজকুমারী মাথা হেঁট করিয়া সলজ্জভাবে কহিলেন—বাবা! মহাস্থানের মঙ্গলের জন্য, ভাই রাজেন্দ্রের জন্য, যাহা কিছু বলিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এখন ত সে সময় নয়।

রাজা সোদ্বেগে কহিলেন—কেন মা!

রাজকুমারী কহিলেন—আর এক নূতন সংবাদ শুনিলাম। এক দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান অগণ্য বাহিনী লইয়া মহাস্থানরাজ্যের প্রান্ত-সীমায় উপস্থিত। এখন সমস্ত কর্ত্তব্য ফেলিয়া সেই দিকেই মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। চিন্তা নাই বাবা! পাল্‌তাপাত মহাস্থান-রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

মহারাজ পরশুরাম আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন -উত্তম, এই সব বিষয়ের একটা কিনারা হইলেই আমি তোমাকে পাত্রস্থ করিয়া নিশ্চিন্ত হইব। ইহাই সুযুক্তি।

এই বলিয়া তিনি বিষয়ান্তরের অবতারণা করিয়া কহিলেন—মা! তুমি প্রজাগণের অভিমত ও রাজ্যের অবস্থা জানিবার জন্ত গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলে। সেই গুপ্তচর কি ফিরিয়া আসিয়াছে?

শীলাদেবী কহিলেন—হাঁ বাবা! গুপ্তচর ফিরিয়া আসিয়াছে।

রাজা সোৎসুকচিত্তে কহিলেন—গুপ্তচর কি সংবাদ দিল মা?

শীলাদেবী কহিলেন—সংবাদ শুভ নয় পিতা, বরেন্দ্রভূমির অনেক সামন্ত-রাজা সুলতানের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে।

রাজা ব্যগ্র হইয়া কহিলেন—সুলতান কে?

শীলাদেবী কহিলেন—সাহ সুলতান মুসলমান ফকির। সেই দুর্দ্দান্ত দরবেশ সসৈন্যে রাজ্যের প্রান্ত-সীমায় শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে। চরমুখে শুনিলাম, আত্রেয়ী-তীরবাসী প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচারের সীমা নাই। তাহারা প্রাণভয়ে ঘরবাড়ী ফেলিয়া পলায়ন করিতেছে।

মহারাজ পরশুরাম হতাশভাবে কহিলেন—সামন্তরাজগণ গোপনে সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে! কারণ কি? তাহারা মুসলমানের সাহায্যে কি মহাস্থান রাজ্য ধ্বংস করিতে চায়!

শীলাদেবী কহিলেন—পিতা! শুধু তাহাদের দোষ নয়? সশস্ত্র প্রহরিবেষ্টিত রাজ-কারাগার হইতে সেনাপতির পলায়ন অদ্ভুত নয় কি? এই রাজপুরীর কে তাহাকে সাহায্য করিল—কাহার সাহায্যে সে পলায়ন

করিতে সমর্থ হইল! সে-সব কথা ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, এই রাজভবনের চৌকাঠগুলিও যেন রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইয়াছে।

রাজা অসহায়ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—মা! প্রতিহারী এখনও ফিরিতেছে না কেন? সেনাপতি আসিতে বড়ই বিলম্ব করিতেছে।

শীলাদেবী কহিলেন—ঐ যে বাবা! তিনি আসিতেছেন।

সেনাপতি মীর্জ্জা মোরাদ ও মন্ত্রী পুণ্ডরীক উভয়েই মন্ত্রণাভবনে প্রবেশ করিলেন।

রাজকুমারী কহিলেন—আমি এখন আসিতে পারি, বাবা!

রাজা কহিলেন—হাঁ, তুমি যাও।

রাজকুমারী প্রস্থান করিলেন। মন্ত্রী ও সেনাপতি রাজাদেশে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রেরিত গুপ্তচর কি সংবাদ দিল পুণ্ডরীক!

—সংবাদ বিশেষ সন্তোষজনক নয়। শুনিলাম, মাধবপাল-নন্দন হরপাল আত্রেয়ী-তীরে শত্রুশিবিরে উপস্থিত।

—আর কোনও সংবাদ নাই?

—সুযোগ পাইলেই সুলতান সাহ সসৈন্যে মহাস্থান-গড়ে উপস্থিত হইবে।

—গৌড়ে বাছা-বাছা সৈন্য প্রেরণ করা ভাল হয় নাই। যে-সব সৈন্য এখন গড়ে অবস্থান করিতেছে, তাহারা চিল্লনের বশীভূত, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। এখন একমাত্র ভরসা মোরাদ—আর বিজয়ের সৈন্যদল।

মোরাদ কহিলেন—শুনিলাম শত্রু-সেনা অসংখ্য। কেবল আমাদের সৈন্যবল লইয়া শত্রু-সেনার সম্মুখীন হওয়া সম্ভবপর নয়। এমত অবস্থায়

আত্ম রক্ষার উপায় না করিয়া হরিহর সিংহকে গৌড়ে পাঠান উচিত হয় নাই।

মন্ত্রী কহিলেন—পূর্ব্বে এ সংবাদ জানিতে পারিলে পাঠাইতাম না। গত বিষয়ের অনুশোচনায় কালক্ষয় করা বৃথা। এক্ষণে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।

মোরাদ কহিলেন—ভাবিয়া কি হইবে। আমার যে সৈন্য আছে, তাহাতেই পাঠান শত্রুর মহড়া লইতে পারি। কিন্তু আরও সৈন্য পাইলে সুবিধা হইত।

রাজা কহিলেন—মোরাদ! মহাস্থান-সেনাকে সন্তুষ্ট করিয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা কর। উহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রাণপণে কাজ করিলে বোধ হয় আর অধিক সৈন্যের আবশ্যক হইবে না। কেমন?

—মহারাজ! আমার চেষ্টার ত্রুটী নাই। বি[illegible] সিংহ আর একটী নূতন সৈন্যদল গঠন করিয়া লইতেছেন। দেশীয় কোচ, ভীল, বাগ্দি, ধীবর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু জাতি লইয়া বেশ এক সৈন্যদল গঠন করিয়াছেন। ইহারা যেমন সাহসী, তেমনি নির্ভীক সরল উদারচেতা। আমার মনে হয়, সে-সব সৈন্যের তুলনায়, মহাস্থান-সেনা অতি নগণ্য। কার্য্য দেখিয়া এক-একবার মনে হয় তাহাদিগকে গড় হইতে বিতাড়িত করি।

সেনাপতি! সাধ্যমত চেষ্টা কর, যদি না হয়, শেষে হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এক এক দুরাত্মাকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ কর। বৃদ্ধ বয়সে চিহ্লন আমাকে যে শিক্ষা দিয়াছে, তেমন শিক্ষা জীবনে কখনও পাই নাই। মন আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চায় না।

পুণ্ডরীক কহিলেন—মহারাজ! গৌড় হইতে আর এক সংবাদ আসিয়াছে।

—কি সংবাদ!

—জয়পালদেব কয়েকটী নগর ছাড়িয়া দিয়া হেমন্ত সেনের সঙ্গে সন্ধি করিতেছেন।

—এ-সন্ধির কারণ কি? এরূপ সন্ধি যে পরাজয়েরই নামান্তর।

পুণ্ডরীক কহিলেন— তবে, হেমন্ত সেন এখনও সম্মত হয় নাই। তাহার উদ্দেশ্য, গৌড়-সিংহাসন একেবারে হস্তগত করা।

সেনাপতি কহিলেন—আজ হউক, কাল হউক, গৌড়ের সিংহাসন পালবংশের হস্তচ্যুত হইবেই, একমাত্র জয়পালদেবের সাম্রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিহীনতাই তাহার প্রধান কারণ।

রাজা কহিলেন সেনাপতি! গৌড়ের চিন্তায় প্রয়োজন নাই। এখন কিসে মহাস্থানের গৌরব রক্ষা হয় তাহারই উপায় চিন্তা কর।

সেনাপতি কহিলেন— এখনকার প্রথম কর্ত্তব্য, শত্রু সৈন্যের গতিবিধি লক্ষ্য করা। দ্বিতীয়, রাজকোষে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করা; তৃতীয়, বিপুল বাহিনী সংগঠন। প্রথম ও তৃতীয় ব্যবস্থা আমি করিতেছি। মন্ত্রী মহাশয় যথাসম্ভব অর্থ সংগ্রহে মনোযোগ দান করুন।

মন্ত্রী কহিলেন চিন্তা করিবেন না সেনাপতি! রাজ ভাণ্ডারে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত আছে।

—উত্তম। বুঝিয়াছেন মন্ত্রী মহাশয়! এই রাজাবাসী সকলেই অর্থের দাস—দুঃখের বিষয় কেহই নেমকের গোলাম নহে। আবার অর্থ পাইলে বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও কুণ্ঠিত নহে।

রাজা বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন- মোরাদ! আমার আদেশ শ্রবণ কর। বিশ্বাসঘাতকগণকে আগামী কল্য প্রভাতে, রাজহস্তীর পদতলে দলিত করিবে।

সেনাপতি কহিলেন—যো হুকুম।

মহারাজ পরশুরাম ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া রুদ্ররোষে কহিলেন—

আর আগামী কল্য প্রকাশ্য দরবারে বন্দী প্রহরী কয়জনের সমুচিত দণ্ড-বিধান আমি নিজে করিব।

সেনাপতি কহিলেন—মহারাজ! একজন স্ত্রী-বন্দিনী আছে

রাজা অবরুদ্ধ রোষাবেশে কহিলেন—ওঃ, বিশ্বাসঘাতিনী মতিয়া। তাহার ব্যবস্থা রাজকুমারী লীলা দেবী করিবেন।

সেনাপতি কহিলেন—উত্তম।

রাজা হৃদয়ের ব্যথা চাপা দিয়া কহিলেন—গুপ্তভাবে শত্রু-সৈন্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে কাহাকে পাঠাইতেছ সেনাপতি?

সেনাপতি কহিলেন—মহারাজ! আমার প্রিয় শিষ্য দিজনদের খাঁকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

মহারাজ পরশুরাম কহিলেন—তুমি যাহাকে বিশ্বাস কর তাহাকেই পাঠাইতে পার। এই বলিয়া তিনি মন্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—তাহা হইলে উপস্থিত সভাভঙ্গ করা যাইতে পারে। কেমন মন্ত্রী! এ বিষয়ে তোমার আর ত কিছুই জিজ্ঞাস্য নাই?

মন্ত্রী কহিলেন—অদ্যকার মত আর নাই। আমি প্রয়োজনমত জিজ্ঞাসা করিয়া লইব

রাজা কহিলেন—মন্ত্রী। তোমাকে সরল পাইয়া, চিহ্লন তোমার উপর বেশ একচাল চালিয়াছে। পুণ্ডরীক! রাজকার্য্য বড়ই জটিল, খুব সাবধানে কার্য্য করিয়ো।

মন্ত্রী পুণ্ডরীক অধোবদনে রহিলেন। রাজা গাত্রোত্থান করিলেন। সেনাপতি কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কেবল মন্ত্রী পুণ্ডরীক কাহার অপেক্ষায় সেইস্থানে বসিয়া রহিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিচার

আজ বিশ্বাসঘাতক প্রহরীদিগের বিচার হইবে। এজন্য সকালবেলা হইতে রাজসভায় লোক-সমাগম আরম্ভ হইয়াছে। রাজসভার কার্য্য-নির্ব্বাহকগণের ব্যস্ততার সীমা নাই। চারিদিকেই হাঁক-ডাক এবং রাজকর্ম্মচারিগণের সাবধান পর্য্যবেক্ষণ। যথাসময়ে মহারাজ নরসিংহ পরশুরাম রাজসভায় উপস্থিত হইলেন মন্ত্রী, সেনাপতি ও অন্যান্য সভাসদগণ যে-যাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে সমাসীন। রাজা বজ্রগম্ভীর স্বরে আদেশ করিলেন বন্দীদিগকে আনয়ন কর।

মন্ত্রী করজোড়ে কহিলেন—মহারাজ ! আমার কিছু বক্তব্য আছে।

রাজা কহিলেন—পরে শুনিব, অগ্রে বিচার শেষ হউক।

সেনাপতি দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন—মহারাজ ! রাজসকাশে আমিও কিছু নিবেদন করিতে চাই।

রাজা রোষ-কটাক্ষ করিয়া কহিলেন—তুমি আবার কি বলিবে ?

—মহারাজ ! আপনি ন্যায়পরায়ণ, সূক্ষ্ম বিচারক।

—সেনাপতি ! বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া আমার সময় নষ্ট করিয়ো না। বন্দীদিগকে হাজির কর।

কিয়ৎকাল মধ্যেই হস্তপদশৃঙ্খলাবদ্ধ রামরাজা ও অন্যান্য বন্দী সকলকে লইয়া কারাধ্যক্ষ উপস্থিত হইলেন।

রাজা সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বন্দী ছিহ্লনের কারাকক্ষের দ্বারে পাহারা দিবার ভার কোন্ সৈনিককে অর্পণ করিয়াছিলে ?

সেনাপতি মোরাদ দণ্ডায়মান হইয়া করজোড়ে কহিলেন—বিশ্বস্ত সৈনিক রামরাজাকে। কিন্তু রামরাজা নির্দ্দোষ

দোষাদোষ সপ্রমাণের পূর্ব্বে, তুমি কেমন করিয়া জানিলে রাম-রাজা নির্দ্দোষ ?

— মার্জ্জনা করিবেন মহারাজ ! রামরাজার ঐ মুখে বিশ্বাস-ঘাতকতার কোনও চিহ্ন দেখিতেছি না।

—তোমার ভ্রম হইতে পারে। চিহ্লন আমাকে সে-শঙ্কা দিয়া গিয়াছে। তাই যদি না হইত মোরাদ ! তাহা হইলে এ বৃদ্ধ বয়সে পত্নী-শোক দগ্ধ হইতে হইত না। রামরাজা বীর—রামরাজা সৈনিক, সে সৈনিক-ব্রত ভঙ্গ করিয়াছে। তাহারই অমনোযোগিতায় বন্দী কারাগৃহ হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। এ-জন্য সম্পূর্ণ অপরাধী রামরাজা।

রাজা বন্দীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—বন্দিগণ ! তোমরা অপরাধ কি বুঝিতে পারিয়াছ ?

রামরাজা উত্তর করিলেন—না মহারাজ ! বুঝিতে পারি নাই।

রাজা উগ্র কণ্ঠে কহিলেন—তবে শোন, রামরাজা ! তুমি তোমার এই সব সহচরগণের সহিত মিলিয়া রাজদ্রোহী চিহ্লনের পলায়নের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছ।

রামরাজার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। সে গদগদ কণ্ঠে কহিতে লাগিল—মহারাজ ! ন্যায়ের চক্ষে, ধর্ম্মাধিকরণের চক্ষে আমি সম্পূর্ণ দোষী। কিন্তু ধর্ম্ম জানেন, বিধাতা জানেন আমার মনে পাপ আছে কি না। মহারাজ ! পুত্র স্নেহে আমাকে এতদিন পালন করিয়া আসিয়াছেন, স্বহস্তে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দান করিয়াছেন, সেই অধিকারে একটী কথা বলিতে চাহি। আমি জানি এরূপ অপরাধের চরম দণ্ড—প্রাণদণ্ড। আপনি রাজা, প্রতি-পালক, আমার অস্ত্রগুরু ; আপনার আদেশে যদি প্রাণ যায়, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও দুঃখ নাই। মহারাজ ! এ অকিঞ্চিৎকর জীবন অনেক দিন আপনার পায়েই উৎসর্গ করিয়াছি। আমার একনিষ্ঠ হৃদয় আমাকে সান্ত্বনা

দান করিতেছে। কিন্তু এই দুঃখ রহিল, ললাটে কলঙ্কের কালী মাখিয়া ইহসংসার হইতে বিদায় হইতেছি।

রাজা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—রামরাজা! প্রীতি, বিশ্বাস ও স্নেহের প্রতিদান তোমরা আমাকে বিশেষরূপেই দিয়াছ। তোমাদের অশ্রুজল আর আমাকে প্রতারিত করিতে পারিবে না।

রামরাজা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—মহারাজ! আমি প্রাণ ভিক্ষা চাহি না। কিন্তু আমার অপরাধে এতগুলি নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন যায় কেন? যে দণ্ড হয় আমি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। মহারাজ! ইহাদিগকে মুক্তি দিন্।

সেনাপতি কহিলেন—মহারাজ! এই ধর্ম্মাধিকরণে—মহারাজের দয়ার রাজ্যে মার্জ্জনারও স্থান আছে। ক্ষমা করুন মহারাজ! ক্ষুদ্র পিপীলিকা বধ করিয়া রাজ্যের উন্নতি সাধন হইবে না।

রাজা উদাস স্বরে কহিলেন বল দেখি সেনাপতি! চিহ্লনকে কে মুক্তিদান করিল?

—কাল তাহাকে মুক্তি দিয়াছে মহারাজ! কাল পূর্ণ হইলে আপনিই সে আপনার জালে আবদ্ধ হইবে। নির্দ্দোষ প্রভুভক্তগণের শোণিতে মহাস্থানসিংহাসন কলুষিত করিবেন না।

- সেনাপতি! বৃদ্ধ আমি, আমার দৃষ্টিশক্তি তত প্রখর নয়। আমার পরম শত্রু আমারই অন্নে দেহ পরিপুষ্ট করিতেছে। অথচ এতদিন আমি তাহা দেখিতে পাই নাই। মহাস্থানের প্রধান অমাত্য এক সরলপ্রাণ ব্রাহ্মণ।—সেনাপতি! তুমি কি গড় শত্রুশূন্য করিতে পার না? বিদ্রোহি-গণকে হস্তিপদতলে দলিত করিতে পার না?

—স্থির হউন মহারাজ! কুচক্রিগণ কতদিন আমাদের চক্ষে ধূলি দিতে সমর্থ হইবে! তাহাদের কাল পূর্ণ হইয়া আসিতেছে।

সেনাপতির যুক্তিপূর্ণ কথায় রাজা আশস্ত হইয়া কহিলেন—সেনাপতি!

চিল্লনের অনুসন্ধান কর। চতুর্দ্দিকে চর প্রেরণ কর। কাল বিষধরকে বিশ্বাস নাই।

সেনাপতি কহিলেন—মহারাজ! আপনার আদেশের পূর্ব্বেই আমি সুদক্ষ চর প্রেরণ করিয়াছি। অতি শীঘ্রই দুরাত্মার পাপের সমুচিত দণ্ড বিধান করিব।

রাজা পুঞ্জীভূত ক্রোধাবেশে কহিলেন—মাধবপালকে বিশেষরূপ বিশ্বাস করিতাম। সামন্তশ্রেষ্ঠের গৌরবময় আসন তাহাকে পুরস্কার দান করিয়াছিলাম। বৃদ্ধ বয়সে সে-ও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাজা মাধবের দণ্ডের ব্যবস্থা আমি করিয়া রাখিয়াছি।

—এদের সম্বন্ধে তোমরা কি বলিতে চাহ?

নিরপরাধ বন্দীদিগকে মুক্তির আদেশ দিন্ মহারাজ!

—রামরাজাকে তোমার নির্দ্দোষ বলিয়া ধারণা?

—হাঁ মহারাজ! রামরাজা নির্দ্দোষ।

—আচ্ছা, তোমাদের অনুরোধে আমি বন্দীদিগের প্রাণভিক্ষা দিলাম। কিন্তু জানিয়া রাখ রামরাজা! তোমরা যতদিন কার্য্যদ্বারা আমার মনে বিশ্বাস না জন্মাইতে পার, ততদিন, তোমাদের প্রতি পূর্ব্বের সেই অটল বিশ্বাস নরসিংহের অন্তরে ফিরিয়া আসিবে না।

রামরাজা ছলছল চক্ষে কহিল মহারাজ! আমায় প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিন্।

—কেন?

—মহারাজ! অবিশ্বাসী জীবন লইয়া ধরাধামে থাকিতে চাহি না। মৃত্যুই আমার চরম শাস্তি। আমায় শাস্তি দিন্ মহারাজ!

—সৌনক! এই তোমার চরম শাস্তি। দৈব অভিশাপের মত আমার অবিশ্বাস বহন কর,—অনুতাপের শতবৃশ্চিক তোমার হৃদয়ে দিবা-যামিনী দংশন করুক।

রামরাজা রোরুদ্যমান কণ্ঠে কহিল—প্রভু! পিতা! আমায় দণ্ড দিন্—মৃত্যুদণ্ডের বিধান করুন। এ-রূপ দণ্ডের চেয়ে মৃত্যুও আমার পক্ষে শতগুণে শ্রেয়ঃ। মনের আবেগে রামরাজা কাঁদিয়া ফেলিল।

সেনাপতি বন্দীদিগের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন—মৃত্যুর জন্য ব্যস্ত কেন ভাই! সৈনিকের জীবন-মরণ একই কথা। প্রভুভক্ত রামরাজা! তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না—মহারাজ এই ব্যাপারে কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন!

রাজা ব্যথিত স্বরে কহিলেন—রামরাজা! তুমি আমার অন্তরে যে বেদনা দান করিয়াছ, তেমন যাতনা জীবনে আর কখনো অনুভব করি নাই। তুমি নরসিংহের নামের অবমাননা করিয়াছ,—শিক্ষাকে ব্যর্থ করিয়াছ।

রামরাজা মহারাজের পদধূলি গ্রহণ করিল।

রাজা কহিলেন—মহাস্থানের একনিষ্ঠ সন্তান! তোমরা থাকিতে আজ মহাস্থানের এই দশা কেন? মহাস্থান রাজ্যে অমঙ্গল-রাশি মূর্ত্তিমান হইয়া আসিতেছে কেন? পুত্র! প্রাণপণে আবার এই রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা কর, এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ তাই দেখিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ুক্।

রামরাজা কহিল—মহারাজ! কলঙ্ক-মাখা প্রাণ মহাস্থানের জন্য রক্ষা করিলাম—শত শেল বক্ষে লইয়া আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু প্রভো, যে অমূল্য রত্ন আজ হারাইলাম, শতবার মরণেও আর তাহা ফিরিয়া আসিবে কি?

রাজা সহানুভূতির স্বরে কহিলেন—দুঃখিত হইয়ো না রাম! কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে পুত্র-স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়াছি।

—মহারাজ! আমি সেজন্য দুঃখিত নহি। এ আমার অলঙ্ঘনীয় বিধিলিপি। তাহা না হইলে, বিশ্বাসঘাতকগণের হস্তে বন্দীর ভার অর্পণ করিয়া আমি বিশ্রাম করিতে যাইব কেন? পাপিষ্ঠ চিহ্লন পলায়ন করিতে

সমর্থ হইবে কেন? চিহ্লন আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়া গেল। যদি কখনও সময় পাই, তাহার হৃদয়-শোণিতে এ অপমানের প্রতিশোধ লইব।

রাজা মন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—মন্ত্রী! বিশ্বাসঘাতিনী মতিয়ার কি ব্যবস্থা করিব?

মন্ত্রী কহিলেন- স্ত্রী হত্যা করিয়া কাজ নাই। এইরূপে কারাগারেই তাহার পাপ জীবনের অবসান হউক।

রাজা কহিলেন—উত্তম। সেনাপতি! মন্ত্রণা-ভবনে চল, গৌড় হইতে গুপ্তচর ফিরিয়া আসিল।

সভাভঙ্গ হইল। রাজা, মন্ত্রী ও সেনাপতি সমভিব্যাহারে মন্ত্রণাভবনে গমন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ধীবরালয়ে

নির্জ্জন বনস্থলীর মধ্য দিয়া তরঙ্গিণী করতোয়া উধাও ছুটিয়াছে; দুই তীর ঘন তালবনসমাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে গ্রাম্য ঘাট। মধ্যে মধ্যে দুই একখানি পর্ণকুটীর পরিদৃষ্ট হয়। একদা বৈকালে এইরূপ এক কুটীর-মধ্য হইতে এক নবমবর্ষীয়া বালিকা বাহির হইল। তাহার হস্তে একটী সুন্দর পাখী। বালিকা আপন মনে পাখীটাকে কত কথা বলিল—কত আদর, কত স্নেহ, কত মিষ্ট সম্ভাষণ করিল; তার পর পাখীটী উড়াইয়া দিল। পাখী আকাশে উড়িয়া গেল দেখিয়া, বালিকা আকাশ পানে চাহিয়া অভিমানের স্বরে বলিল,—"খোলা হাওয়ায় গান গাস্ -ধরতে গেলেই ভুলে যাস্ কেন?

বালিকা উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী; মুখ-চোখের গঠন মন্দ নহে। মস্তকের ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশদাম অযত্নবিন্যস্ত। পরিধানে সাধারণ লালপেড়ে সাড়ী। এই চটুলা বালিকার নাম শ্যামা। শ্যামা পাখীটা উড়াইয়া দিয়া আকাশ-পানে চাহিয়া আছে, এমন সময়ে পশ্চাদ্দিক হইতে কে ডাকিল—শ্যামা!

বালিকা বলিল—যাই বাবা!

তীরে একটী মৃৎকলস গড়াগড়ি যাইতেছিল। তাড়াতাড়ি কলসটী কক্ষে তুলিয়া শ্যামা ঘাটে নামিল এবং কলস ভরিয়া লইয়া ত্বরিত পদে কুটীরে গমন করিল।

শ্যামার পিতা ভৈরব জাতিতে ধীবর। সামান্য এই পর্ণকুটীর, রন্ধনের জন্য একখানি ছোট চালা—কয়েকটা ঘটী বাটী তৈজসপত্র লইয়াই ভৈরবের গৃহস্থালী। শ্যামার স্বহস্তমার্জ্জিত পরিষ্কৃত অঙ্গনে একখানি অর্দ্ধছিন্ন মাদুরের উপর বসিয়া ভৈরব ধূমপান করিতেছে। শ্যামা জলপূর্ণ কলস গৃহ মধ্যে রাখিয়া বাবার কাছে আসিয়া বসিল। ভৈরব বলিল—মা! যা বলেছি, সব তৈরি করেছিস্?

—হাঁ বাবা! চিঁড়ে ভিজিয়ে রেখেছি, দুধ জ্বাল দিয়ে দিয়ে ঘন আটা করেছি।

—বেশ, আমার লক্ষ্মী মেয়ে!

—কই বাবা! রাজা ত এল না।

—আস্‌বে বই কি। আস্‌বার কথা আছে; তবে বিলম্ব হচ্চে, বোধ হয়, বিলম্বের কোন কারণ আছে।

—হাঁ বাবা! রাজা আস্‌বে; হাতী-ঘোড়া লোকজন আস্‌বে না?

—পাগলী মেয়ে! রাজা যদি হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্কর নিয়ে আসে তবে আমরা তাকে কি খেতে দেব?

—কেন দুধ আছে, আমি চিঁড়ে ভিজিয়ে রেখেছি।

—হা পাগলী! ও-সব কি বড়লোকে খায়? আর আমরা কি অত লোককে খেতে দিতে পারি?

—খায় না কেন বাবা! ও, বুঝেছি, আমরা কাঙ্গাল—তাই আমাদের বাড়ী রাজার খেতে নাই।

—খাবে না কেন মা! বিজয় সিংহ কাঙ্গালের রাজা, যে তাঁকে ভক্তি করে, আদর করে ডাকে তিনি তারই বাড়ী যান। বিদুরের ক্ষুদ-কুঁড়োও তিনি খেতে ঘৃণা করেন না।

—রাজা কখন আস্‌বে বাবা! সাঝ হ'য়ে এল যে।

—চুপ্‌ কর্‌, ঐ দেখ্‌ রাজা আস্‌চেন।

শ্যামা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া রাজার কাছে গেল। রাজার বেশ-ভূষা নিতান্তই সাধারণ। রাজার সঙ্গে লোকজন, হাতী-ঘোড়া নাই, পাল্কী, মিছিল নাই। পরণে শাদা ধুতি, তাও আবার মালকোচা দিয়ে পরা; গায়ে শাদা কোর্ত্তা, মাথায় উষ্ণীষ, তাও দুগ্ধধবল। জরি-কিংখাবের পোষাক নাই, মাথায় চক্‌চকে-ঝক্‌ঝকে কিরীট নাই, এ কেমন রাজা!

শ্যামা বড় আশা করিয়া রাজা দেখিতে গিয়াছিল। কিন্তু দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল না। রাজার পশ্চাৎ ধীরে ধীরে তাহার বাবার কাছে গেল। উঠানের একপাশে মুখখানা ভারী করিয়া বসিয়া পড়িল। আগন্তুক ব্যক্তিকে রাজা বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইল না। ভাবিল, বাবা তাহার সঙ্গে তামাসা করিয়াছে; সে মনে মনে পিতার সঙ্গে মস্ত রকমের একটা আড়ি করিয়া বসিল।

রাজা বিজয় সিংহ কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র চৌকিতে বসিয়া আছেন। ভৈরব তাঁহাকে তালপত্রের পাখা লইয়া ব্যজন করিতেছে। ভৈরব রাজার কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল—আমি ভাবিলাম, বুঝি আজ আর আপনি আসিলেন না।

—আরও পূর্ব্বে পৌছিতাম। কিন্তু মহাস্থান-রাজধানী হইতে দূত আসায় বিলম্ব হইল।

—আমরা কল্য হইতেই প্রস্তুত হইয়া আপনার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি।

—বোধ হয় দু-একদিনের মধ্যে আর রাজধানীতে না গেলেও ক্ষতি নাই। এক নূতন আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।

—কি ?

—মাধবপুরের ভুঁইয়াকে একটু শিক্ষা দিতে হইবে।

—ভুঁইয়ারা কি মহাস্থানের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে ?

—সম্পূর্ণ রূপে। ভৈরব! আরও এক আশ্চর্য্য সংবাদ শুন। অদ্য মাধবপুরে একদল মুসলমান আসিবে।

—কেন ?

—তাহা পরে বলিতেছি। অগ্রে তোমার জাতি-ভাইদের খবর দাও।

—আজই কি যাইতে হইবে ?

আজ নয় বন্ধু! এখনই। বিলম্বে মহাস্থান-রাজের সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

—মাধবপুরে মুসলমান আসিবে, এ-সংবাদ আপনি কোথায় পাইলেন ?

—পরে বলিতেছি, এখন তুমি সব লোককে প্রস্তুত কর।

ভৈরব চলিয়া গেলে, শ্যামা ক্রমে ক্রমে, রাজার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল।

রাজা শ্যামার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন—তোমার নাম কি ?

—আমার নাম শ্যামা।

রাজা কহিলেন—শ্যামা! বেশ নাম!—তোমার মা কোথায় ?

—তা জানিনে, বাবা বলেন আমার মা ঐ আকাশে আছেন। হাঁ রাজা ?

—কেন মা!

—তোমার মাথায় টুপি নাই কেন? বেশ চকচকে কোর্ত্তা নাই কেন?

—আমার ত তা নাই মা!

—তবে তুমি কেমন রাজা! তোমার কিছুই নেই তবে তুমি কেমন করে রাজা হবে?

—হাঁ মা! তোমার বাবাকে বল না কেন? আমায় একটা ভাল টুপি কিনে দিতে!

—আমরা গরীব—আমরা কোথায় পাব রাজা!

—টুপি কিনে দিতে না পার কিছু খেতে দাও।

—তোমরা বড় লোক, আমরা গরীব, কি খেতে দেব রাজা!

—বড় ক্ষুধা পেয়েছে মা! খেতে দিতেই হবে।

—না রাজা! আমি তোমায় খেতে দেব। বাবার উপর রাগ কোরো না। আমি তোমার জন্যে কত কি জোগাড় করেছি। চিঁড়ে ভিজিয়ে রেখেছি, দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন আটা করে রেখেছি।

—আমি কি তোমাদের পরে রাগ করতে পারি।

—বল রাগ করনি ত, আমি তোমার জন্যে সব জোগাড় করে আন্‌ছি।

ভৈরব দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইল। ও কি করেন মহারাজ! দেখ্‌ছেন ও পাগলী মেয়ে—এখনই দুধ চিঁড়ে এনে আপনার সুমুখে হাজির করবে।

—আহা, ভৈরব! বালিকার অন্তর কেমন সরল—কেমন পবিত্র। শ্যামা! দুধ চিঁড়ে নিয়ে এস।

শ্যামা ছুটিয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দুগ্ধের সহিত চিনি ও চিঁড়ে একত্র করিয়া লইয়া আসিল। বাটী এবং গ্লাসপূর্ণ জল রাজার

সম্মুখে রাখিয়া দিল। বিজয় সিংহ দরিদ্র প্রজার শ্রদ্ধায় দান সানন্দে গ্রহণ করিলেন। হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তে রাজা তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন।

শ্যামা ভৈরবের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—কোথায় যাবি বাবা!

ভৈরব কহিল—মহারাজার সঙ্গে লড়াই করতে যাব।

—আমি লড়াই দেখ্‌বো।

—পাগলী মেয়ে! তুমি কুটীরে থাক; আমি লড়াই করে তোমার জন্যে ভাল ভাল জিনিষ আন্‌বো।

—আমি লড়াই দেখ্‌বো বাবা!

—ক্ষ্যাপা মেয়ে! সেখানে কি কেউ যায়? সেখানে মানুষে মানুষ মারে।

—হাঁ রাজা! সত্যি?

রাজা কহিলেন—সত্যি বৈ কি মা!

—তবে তোকে যেতে দিব না বাবা! মানুষে তোকে মেরে ফেল্‌বে।

—মানুষে আমায় মারতে পারবে না। মানুষ আমায় ভয়ে, রাজার ভয়ে পালিয়ে যাবে।

—সত্যি?

—আমি কি তোর কাছে মিছে কথা বলি মা!

—কখন্ ফিরবি বাবা!

—আমি আজই ফিরবো।

—বাবা! আমি বল্লম ধরতে জানি। এই দেখ না আজ একটা কেমন খরগোস শিকার করেছি।

শ্যামা গৃহ হইতে বল্লম বাহির করিয়া বলিল—দেখ রাজা! আমি এই বল্লম দিয়ে খরগোস মেরেছি।

রাজা সবিস্ময়ে শ্যামার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—ভৈরব! দেখ দেখ, দৈত্যদলনীর মত শ্যামা কেমন বল্লম ধরে দাঁড়িয়েছে।

শ্যামা কহিল—হাঁ রাজা! আমায় একখানা হাতিয়ার দিবে! বেশ চকচকে—খুব ধারালো।

—নিয়ে কি করবে?

শ্যামা কহিল—আমি বাবার সঙ্গে লড়াই করতে যাব।

—লড়াইয়ে মানুষ মারতে হয়।

—কেউ যদি আমায় মারতে আসে—তবে ত মারবো।

—তুমি চুপটী করে কুটীরে থাক, আমি তোমায় বেশ ধারালো একখানা ছুরি দিব।

ভৈরব কহিল—মহারাজ! এই একটী মাত্র অবলম্বন লইয়া আমি এই হীন জীবনের বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছি।

—ভৈরব! শ্যামা তোমার লক্ষ্মী মেয়ে। চিনেছি মা! ধীবর-কুল উজ্জ্বল করিতেই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তাচ্ছিল্য করিয়ো না ভাই! শ্যামাকে অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষাদান কর। এমন উজ্জ্বল রত্ন হেলায় হারাইয়ো না। সংসারে দানবদলনীর আবির্ভাব হইতে দাও।

ভৈরব কহিল—মহারাজ! সন্ধ্যা সমাগত। প্রস্তুত হইব কি?

—আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

রাজা শ্যামার দিকে চাহিয়া বলিলেন—শ্যামা! আমি তোমার বাবাকে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি এখন কি করবে?

—দেখ না রাজা! কেমন চাঁদ উঠেছে। এই চাঁদের আলোয় বসে বসে মালা গাঁথ্‌ব।

—মালা গেঁথে কি হবে?

—কেন, অমনি গাঁথ্‌ব। নিজে পরবো। এ বকুল ফুলের মালা, শুকিয়ে গেলেও নষ্ট হয় না। ঘরে তুলে রাখ্‌ব।

—ভৈরব! শ্যামা কি এই কুটীরে একা থাকিতে পারিবে?

—পারিবে বৈ কি মহারাজ! এ যে জেলের মেয়ে।

অদূরে বংশীধ্বনি হইল। রাজা ও ভৈরব সময়োচিত বেশ-ভূষা ও অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

ঐশ্বর্য্যের আর একদিক

রাজা মাধব পাল, মাধবপুরের সামন্ত রাজা। মহাস্থানের মহাসামন্ত নরসিংহ পরশুরামের অধীনে একজন করদ নৃপতি। মাধব পাল মহাস্থানের চিরানুগত ও বিশ্বস্ত। মহারাজ পরশুরাম রাজা মাধবের রাজভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া, সামন্তপ্রধান উপাধি ও সামন্ত-শ্রেষ্ঠের গৌরবময় আসন প্রদান করিয়াছেন। মাধব আপনাকে গৌড়ের সম্রাটগণের জাতি বংশধর বলিয়া জনসমাজে পরিচয় দিতেন, কিন্তু অনেকের মনে সে-বিষয়ে সংশয় ছিল। কেহ কেহ তাঁহাকে নীচ কুম্ভকার জাতি বলিয়া সন্দেহ করিত। মাধব পাল রাজা, আজ অতুল ধনের অধিপতি। বংশ-সম্বন্ধে সুনাম না থাকিলেও ঐশ্বর্য্য তাঁহার সকল গৌরবরক্ষা করিয়াছিল। রাজা মাধবের একমাত্র পুত্র হরপাল—ভবিষ্যতে রাজ্য ও সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী। রাজা মাধব পক্ককেশ বৃদ্ধ। এই বৃদ্ধবয়সেও সমুদয় বিষয়কার্য্যই স্বহস্তে পর্য্যালোচনা করেন। তবে কোন কোন বিষয়ে পুত্রের পরামর্শ গ্রহণ করেন। রাজা মাধব ধীর, শান্তপ্রকৃতি, আর কুমার হরপাল চপল, উচ্ছৃঙ্খল ও বিপথগামী। পুত্রের উদ্ধতস্বভাবের জন্য পিতা নিয়ত মনোতুঃখে কালযাপন করেন। কিসে কুমার ভাল

কিসে তাহার চরিত্র সংশোধন হইবে, নিজের বোঝা নিজেই বহন করিতে সমর্থ হইবে, নিয়তই তাঁহার মনে সেই চিন্তা।

করতোয়ার তীরভূমিতে তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকা। রাজা মাধব স্বীয় বিশ্রাম-কক্ষে একখানি বিচিত্র চৌকির উপর উপবেশন করিয়া কি ভাবিতেছেন। কুমার হরপাল আর একখানি আসনে উপবিষ্ট। উভয়েই নীরব।

কিয়ৎকাল পরে কুমার সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিল—কি স্থির করিলেন, পিতা!

—হর্! এ বৃদ্ধবয়সে আমাকে রাজদ্রোহী হইতে বলিয়ো না। মহারাজ পরশুরাম আমার পরম মিত্র। তাহা হইলে আমাকে রাজদ্রোহী, মিত্রদ্রোহী এই উভয়বিধ পাপেই লিপ্ত হইতে হইবে। ধন, ঐশ্বর্য্য আমার কিছুরই অপ্রতুল নাই। বেশী লোভ করিয়া সমূলে নষ্ট হইয়ো না।

—আপনি বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ হইয়া এমন আদেশ করিতেছেন কেন? এমন সুযোগ কি পরিত্যাগ করিতে আছে? রাজা নরসিংহের দক্ষিণ বাহু ভগ্ন। বীর চিল্লন অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন। সামন্তরাজগণ আপনারই মুখপানে চাহিয়া বসিয়া আছে। তার পর, এক অজেয় শক্তি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া আপনার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতেও কি আপনি নিশ্চেষ্ট থাকিবেন? সুখ-সম্পদ্ বৃদ্ধির পথে কে না অগ্রসর হইতে চাহে, পিতা!

রাজা ক্রুদ্ধ নেত্রে হরপালের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, অর্ব্বাচীন বালক! লোভে আত্মহারা হইয়া, একেবারে সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইয়াছ? তোমার ভবিষ্যৎ জ্ঞান নাই—খাল কাটিয়া কুম্ভীর আনিতেছ! দেখ যে-আগুন জ্বালিতেছ, সে-আগুনে আপনি পুড়িবে না, সমগ্র বরেন্দ্রভূমি দগ্ধ হইবে। আর কিছু না হউক, হর্! মহারাজ পরশুরাম হিন্দু। হিন্দু হইয়া হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিবে?

—আমরা হিন্দু নহি, বৌদ্ধ

—হিন্দু ও বৌদ্ধের ধর্ম্মসম্বন্ধে পার্থক্য থাকিলেও জাতীয়তায় কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। ন্যায়পরায়ণ মহাত্মা পরশুরাম জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করেন। যদি কেহ রাজা থাকে তবে সে নরসিংহ—যদি কেহ ধার্ম্মিক থাকে তবে সে পরশুরাম। আমাকে এমন মহাত্মার সর্ব্বনাশ করিতে বল! শোন হর্! আমি জীবন থাকিতে মহাস্থানের বিরুদ্ধাচরণ করিব না। ও-প্রসঙ্গ পরিত্যাগ কর।

—আমি চিহ্লনকে আশ্বাস দিয়াছি।

—তুমি নির্ব্বোধ, তাই দুর্ব্বৃত্ত চিহ্লনের প্ররোচনায় এমন পথে অগ্রসর হইয়াছ। আমার কথা শোন; পাপিষ্ঠকে বন্দী করিয়া রাখ। বুঝিতেছ না এ সমস্তই প্রতারণা। এখন হেলায় যাহা পরিত্যাগ করিতেছ পরে এই সুখ-সম্পদ কিছুই ফিরিয়া পাইবে না।

—আকাশ-কুসুম কল্পনা করিয়া দেখিতেছি সব দিক নষ্ট করিতে চাহেন। ভাবিয়া দেখুন দেখি, রাজা নরসিংহ আপনাকে প্রতিপদে অপমানিত করিতেছে কি না? বাল্যকালের কথা স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি?

—আমাকে এ-কথা বলিতে তোমার লজ্জা হয় না। পুত্র বলিয়া অনেক ক্ষমা করিতেছি, অনেক সহ্য করিতেছি। মনে করিয়া দেখ দেখি, তুমিই কি আমার আশা-পাদপের মূলে কুঠারাঘাত কর নাই? তুমি যদি সচ্চরিত্র হইতে- তোমার যদি বিবেক-বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে চৌর্য্য অপরাধ মস্তকে বহন করিয়া মহাস্থান রাজধানী হইতে ফিরিতে হইত না। ধনকুবের মাধব পালের পুত্র হইয়া সামান্য রত্নহারের লোভ সম্বরণ করিতে পার নাই। তোমার পাপে বারেন্দ্র-জন-সমাজে আমার মুখ দেখাইবার স্থান নাই।

—আমার কৃত-কার্য্যের ফল আমিই ভোগ করিব, আপনি করিবেন না। এ-কার্য্যের ভাল-মন্দ আমিই বেশ বুঝিতে পারি।

—তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন—তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।

—আপনি বৃদ্ধ—বিচক্ষণ, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু দেখিতেছি, আপনি মহাস্থানের পাদুকাবহনে চির-অভ্যস্ত। আর আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিব না।

—মূর্খ! এখনও ফের—আমার কথা শোন। ইচ্ছা করিয়া হিন্দু-জাতির সৌভাগ্য-রবি চির-অস্তমিত করিয়ো না!

-আপনি যাহাই বলুন, আমি এ-বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প। বিধাতা জানেন—আর ফিরিব কিনা। যদি এমন সুযোগ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে যথার্থ মূর্খের মত কার্য্য করা হইবে।

—যাহা ইচ্ছা হয় কর। আমাকে কখনো আর কিছু জিজ্ঞাসা করিয়ো না। তোমার পরিণাম তুমিই ভোগ করিবে। এ জীর্ণদেহ আর কয়দিন ধরাধামে থাকিবে!

—চিহ্লন ও বিরাট প্রদেশ হইতে রাজা মহেন্দ্র আসিয়াছেন। তাঁহারা আপনার সহিত সাক্ষাতের আশায় বসিয়া আছেন। সাক্ষাৎ করিয়া আর ফল কি! এইরূপ উক্তি শুনাইতে তাঁহাদিগকে আর আপনার সম্মুখে আনিতে চাহি না।

—বেশ, আনিয়ো না। আমিও ঐসব দলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি না। যে-কটা দিন বাঁচি, আমাকে একটু নিশ্চিন্ত থাকিতে দাও। তুমি তোমার পাপ সহচরগণকে লইয়া অন্য কোন স্থানে ষড়যন্ত্র কর—তাহা হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব।

—আপনা হইতে আমরা কোনও রূপ সাহায্যই প্রাপ্ত হইব না?

—সে-কথা কি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে হইবে?

—তাই জিজ্ঞাসা করিলাম।

—এরূপ জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য?

—ভাবিয়াছেন কি? সাহায্য না করিলেও আপনার নিষ্কৃতি নাই। আমি যদি সসৈন্যে মহাস্থানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হই, কোন্ মূর্খ আপনাকে পরশুরামের বন্ধু বলিবে?

—কুলাঙ্গার! তোমার মত পুত্র থাকার চেয়ে আমার নিঃসন্তান হওয়াই মঙ্গল। তুমি মাধবপুর হইতে এই মুহূর্ত্তেই দূর হও। আমি তোমার মুখ দেখিতে চাহি না।

—দেখিতেছি, বৃদ্ধ হইয়া আপনার বুদ্ধি বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে।

—তোমার মত মূর্খের পরামর্শ লইয়া আমাকে কাজ করিতে হইবে নাকি?

—দেখিতেছি আমাকে আরও অধর্ম্মে লিপ্ত করিতে চাহেন!

—চরম কার্য্য কর, হর্! এই বৃদ্ধের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া এই পৃথিবী হইতে সরাইয়া দাও। তোমার পথ মুক্ত হউক।

হরপাল সহাস্য বদনে কহিল—সে-কথা বলিয়া আপনাকে কষ্ট পাইতে হইবে না। প্রয়োজন হইলে তাহাও করিব, অথবা কারাগৃহের নিভৃত প্রদেশে আপনার বিশ্রাম-কক্ষ প্রস্তুত করিয়া রাখিব।

—হাঁ, তোমার মত সন্তান যার, সে-পিতার কারাগৃহই বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান। তাই কর, জীবনের শেষ কয়টা দিন, তাহা হইলে একান্তে বসিয়া ঈশ্বর-চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পারি।

হরপাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল—পিতঃ! এখনও স্থিরচিত্তে বিবেচনা করুন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে কেন বিড়ম্বনা ভোগ করিবেন? দুর্নাম হইতে পরিত্রাণের কোনও উপায় নাই।

—সে মুসলমানের নাম কি? কত সৈন্যবল তার?

—বলিতেছি, অগ্রে প্রতিশ্রুতি দান করুন।

—বিবেচনার সময় দাও। হয়ত তোমার করে আমার সমস্ত বিষয়-

তার অর্পণ করিয়া আমরা দুই স্ত্রী-পুরুষে কাশী যাত্রা করিব। আমি এ-কার্য্যে এখনও তোমায় নিষেধ করি। দেখ হর্! তুমি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দিতেছ, তথাপি পুত্র-স্নেহ যাইতেছে না। আমি যতই তোমার মঙ্গলের জন্য বলিতেছি, ততই বিপরীত বুঝিয়া যাহা ইচ্ছা বলিতেছ। তা বল—আমার আর কয়দিন! এই কার্য্যের ফল তুমিই ভোগ করিবে। তবে মনে বড় দুঃখ হয়! আমি দরিদ্রের সন্তান; বড় কষ্টে এই রাজ্য-সম্পদ লাভ করিয়াছি। তুমি নিজের মঙ্গল-ঘট নিজেই পদাঘাতে চূর্ণ করিতে বসিয়াছ—আমি আর কি করিব। হায়! বড়ই দুঃখের কথা—বরেন্দ্র-সন্তান অনেকেই তোমার এ-কার্য্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

—আমি না হয় মিথ্যা বলিতেছি—বন্ধুর কথায় বিশ্বাস করুন। আপনি একটু অগ্রসর হইলেই বিনা আয়াসে মহাস্থান গড় হস্তগত করা যায়।

—একমাত্র চিল্লনের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া আমি এ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। তাহার ব্যবহার পূর্ব্বেই আমি বিলক্ষণ অবগত আছি।

—বরেন্দ্র-ভূমির প্রধান প্রধান রাজা ও অভিজাতবর্গই আপনার সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

—হর্! তুমি আমার একমাত্র কুলপ্রদীপ। তোমার যাহাতে উন্নতি হইবে সে-কাজ আমি করিতে পরাঙ্মুখ নহি। স্নেহের বন্ধন, দারুণ মায়াপাশ অচ্ছেদ্য। দেবতারাও এ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না; মানুষ কোন্ ছার। আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কিন্তু চারিদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়া শুনিয়া কাজ করিতে হইবে। সেটা তোমারই মঙ্গলের জন্য।

পিতার বাক্যে দুরাশায় মত্ত কুমার হরপাল সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত হইল।

ছল ছল চক্ষে রাজার পদধারণ করিয়া কহিল—পিতঃ! আমার মার্জ্জনা করুন, আমি বুঝতে না পারিয়া আপনাকে অনেক দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি।

—পা ছাড়িয়া দাও হয়্! আমি তোমার রূঢ় ব্যবহারে দুঃখিত হইলেও রাগ করি নাই। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, তোমার মঙ্গল হউক। তিনি তোমায় সুমতি দিন্। শেষ জীবনে আমায় বড়ই জটিল সমস্যায় ফেলিলে। কি করিব, মত না দিলেও তুমি সন্তুষ্ট হইতেছ না—কিন্তু একার্য্যে মত দেওয়াও বড় কঠিন। যাহাই হউক, আর বুঝিয়া দেখিবারও সময় নাই। তোমরা একেবারে সদলবলে প্রস্তুত হইয়াছে। বড়ই বিষম সমস্যা।

—আজ সুলতানের মাধবপুরে আসিবার কথা।

—আঃ, অগ্রেই এখানে কেন? এটা যে মহাস্থানের অতি নিকটবর্ত্তী স্থান, তাও কি জান না? শুনিয়াছি, দস্যুরাজ বিজয় আর মোরাদ এখন মহাস্থানের সর্ব্বেসর্ব্বা। বিজয় সিংহের চরেরও অসদ্ভাব নাই। সর্ব্বত্রই তাহাদের অবাধগতি। তাহাদের বাধা দেয়, এ-প্রদেশে এমন ক্ষমতা ত কাহারো নাই। হঠাৎ একটা কাজ করিয়া ফেল—এতেই মনে বড় দুঃখ হয়।

—ভয়ের কোনই কারণ নাই। সন্ন্যাসিবেশী সুলতান সাহকে কেহই চিনিতে পারিবে না। সুলতান এদেশের ভাষায় বেশ অভিজ্ঞ। অ-হিন্দু বলিয়া কেহই তাঁহাকে বুঝিতে পারিবে না।

—কবে আসিবে, বলিলে?

—অদ্যই।

—আমাকে পূর্ব্বে একবার জিজ্ঞাসা করাটা উচিত ছিল। খুব গুপ্ত স্থানে তাহাদের সহিত মিলিত হইতে হইবে।

—আপনি, কখন্ কোথায়, বিবেচনা করেন।

—রজনী দ্বিপ্রহরে, তোমার শয়নকক্ষে। ভাল, সুলতানের সঙ্গে অন্য কেহ আসিবে কি?

—দুই একজন অনুচর আসিতে পারে।

—হর্! বেশী বিশ্বাস করিয়ো না। বাহিরেই কোনস্থানে পরামর্শ করা সুবিধাজনক। চিল্লনকে তোমার শয়ন-কক্ষে যাইতে দিতে সাহসী হইনা। হাঁ, বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়ো—এইস্থানেই সাক্ষাৎ করা যাইবে।

—উত্তম।

—যথাযোগ্য অতিথি-সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছ ত?

—হাঁ।

—হর্! তবুও মন যেন এ-কার্য্য করিতে চাহিতেছে-না। কি করিব, তুমি আমার একমাত্র সন্তান—তোমার মুখ চাহিয়াই আমি এ-কার্য্যে অগ্রসর হইলাম--ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিলাম না।

হরপাল পিতৃচরণে প্রণত হইল ও অতিথি-সৎকারার্থে বহির্দ্দেশে গমন করিল। রাজা মাধব গণ্ডদেশে হস্তস্থাপন করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। হায়! স্নেহের মোহিনী মায়ায় মানুষ কি এইরূপেই আত্মবলি দেয়?

বিংশ পরিচ্ছেদ

অদ্ভুত অতিথি

কুমার হরপালের প্রস্থানের কিয়ৎকাল পরেই এক সশস্ত্র যোদ্ধৃপুরুষ রাজা মাধবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে আপনি?

— অধীনের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমি আপনার অনুমতি না লইয়াই, আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। কি করিব, বাধ্য হইয়াই আসিতে হইয়াছে। আপনার দ্বারপাল আমাকে বাধা প্রদান করায় আমি সবলে দ্বার অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি।

—তুমি কে? তোমার স্পর্দ্ধা ত কম নয়! নিষেধ করা সত্ত্বেও বিনানুমতিতে পুরদ্বার অতিক্রম করিয়া দেখিতেছি মরণের পথ পরিষ্কার করিয়াছ।

—মরণে ভয় থাকিলে এরূপ কার্য্য করিতে সাহসী হইব কেন? মহারাজ! নিতান্ত প্রয়োজনের অনুরোধেই রীতি-বিগর্হিত কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছি।

রাজা তীব্র দৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের পানে চাহিলেন। বোধ হয় সে-মূর্ত্তি চিনিলেন। হাসিয়া বলিলেন—ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, রাজন্! আমি চিনিয়াছি—এখন আসন গ্রহণ করুন।

আগন্তুক আসন গ্রহণ কবিলেন না। কহিলেন, অতিথিপরায়ণ রাজা মাধব পালের দর্শনলাভেই আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আর বসিয়া কাজ নাই। এখন অতিথিসৎকার সম্পূর্ণ করুন, রাজা! আমি অতিথি।

—রাজা বিজয় সিংহ আমার দ্বারে অতিথি, এযে, আমার পরম সৌভাগ্য, রাজন্!

—আপনার সৌভাগ্য কি আমার সৌভাগ্য তাহা বলিতে পারি না, মহারাজ! অতিথি আমি একা নহি। বরেন্দ্রভূমির অনেক রত্নই আপনার রাজভবন অলঙ্কৃত করিতে আসিবে।

রাজা মাধবের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি, কাসিয়া একটু গলা ঝাড়িয়া কহিলেন—সে কি? সে কি? তবে কি—

বিজয় সিংহ বাধা দিয়া বলিলেন—তবে কি নয়, মহারাজ! আপনি না বলিলেও জোর করিয়া আপনার মজলিসে আমায় স্থান লইতে হইবে।

—আপনি বসুন।

বৃদ্ধ রাজা, বিজয় সিংহের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন—এই আসনে আপনি উপবেশন করুন। কথাবার্ত্তা পরে হইবে। ওরে কে আছিস্, রাজা আসিয়াছেন, কুমারকে ডেকে দে।

বিজয় সিংহ আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন—ব্যস্ততায় প্রয়োজন নাই, মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া সদলবলে উপস্থিত হইয়াছি। এখন নিশ্চিন্ত মনে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করুন। কুমারকে ডাকুন, অতিথি আগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই।

রাজা মাধব যথাসম্ভব আত্মগোপন করিয়া গম্ভীর বদনে কহিলেন—আপনি এ-সব কি বলিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

—বুঝিয়া কাজ নাই, মহারাজ! আপনাদের কার্য্য আপনারা চালাইতে থাকুন, আমি বাধা দিতে আসি নাই। বরং যাহাতে আপনার কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়, আমি সে-বিষয়ে আপনার যথেষ্ট সাহায্য করিব। হরপাল কোথায়?

—কে? কুমার? বোধ হয় সে তাহার বিশ্রাম-ভবনে গিয়া থাকিবে।

—বেশ, তাঁহাকেও আমার দুই চারিটী কথা বলিবার আছে। সংবাদ দিতে পারেন কি?

—আমি তাহাকে এখনি সংবাদ দিতেছি। ওরে কে আছিস্, কুমারকে এইখানে ডেকে আন্।

ভৃত্য কুমারের নিকটে সংবাদ দিতে গেল। ইত্যবসরে ভৈরব দশজন সশস্ত্র অনুচর সহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

রাজা মাধব ভীত চকিতনেত্রে চাহিয়া বলিলেন—রাজন্! কি অভিপ্রায়ে আজ সদল-বলে এখানে আগমন? সহসা আপনার আগমনে বড়ই শঙ্কিত হইয়াছি।

—শঙ্কার কোন কারণ নাই, মহারাজ! বরেন্দ্রভূমির প্রধান প্রধান রাজা ও অভিজাতবর্গ যখন আপনার দ্বারে অতিথি, তখন আমি অতিথি হইব এর আর বিচিত্র কি?

—আপনি এ-সব কি বলিতেছেন? বরেন্দ্র-ভূমির রাজা ও প্রধান প্রধান অভিজাতবর্গ, আমার দ্বারে অতিথি, এ-সব কি কথা?

—এ-সব যে কি কথা মহারাজ, আমিও তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। সে-কথা যাক্—আমার কথার উত্তর দিন্। আপনি কি মহাস্থান-রাজের সমুদয় অধীনতা-পাশ ছেদন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন?

—অতি আশ্চর্য্য কথা। মহারাজ পরশুরাম আমার বাল্যবন্ধু, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ছেদন করিব, এ যে অতি বিস্ময়জনক ব্যাপার।

—মহারাজ! এই আদেশ-লিপি পাঠ করুন। সম্বন্ধ ছেদন করা-না-করা আপনার ইচ্ছা।

বিজয় সিংহ রাজা মাধবের হস্তে, পরম মাহেশ্বর মহারাজ পরশুরামের হস্তাঙ্কিত একখানি লিপি প্রদান করিলেন। রাজা মাধব নিবিষ্টচিত্তে লিপিখানি পাঠ করিয়া কহিলেন—থানতাপতি! আপনি সম্মানে তুল্য হইলেও বয়সে আমার পুত্রস্থানীয়। তাই আপনার নিকটে দুই এক কথা বলিতে সাহসী হই। আমি জীবনে কখনও মহাস্থানের বিরুদ্ধাচরণ করিব বলিয়া কল্পনা করি নাই। মহারাজ পরশুরাম যেরূপ বিপন্ন, এসময়ে সাহায্য করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—কিন্তু গৌড়ের সম্রাট জয়পাল দেবের আদেশ ব্যতীত আমি তাঁহাকে সৈন্য সাহায্য করিতে পারিব না।

—এতদিন কি আপনি গৌড়েশ্বরের আদেশমত কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন?

—না, এতদিন গৌড়েশ্বরকে আমরা চিনিতাম না; মহারাজ পরশুরামের আদেশমতই কার্য্য করিয়াছি এবং তাঁহারই আদেশমত আমার সমস্ত সৈন্য গৌড়েশ্বরের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছি। পুররক্ষিগণ ব্যতীত আমার একজন সৈন্যও রাজপুরীতে নাই। গৌড়েশ্বরের বিনা আদেশে আমার প্রেরিত সৈন্যদল মাধবপুরে ফিরিবে না। আমি কেমন করিয়া মহারাজের সাহায্য করিব।

—সৈন্য না দিতে পারেন—অন্যরূপেও সাহায্য করিতে পারা যায়।

—কি? অর্থ? দেখুন মহাস্থানরাজের সাহায্য করিতে করিতে আমার ধনভাণ্ডার শূন্যপ্রায়। তথাপি যাহা পারি, তাহা প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হইব না।

—বুঝিয়াছি মহারাজ! আর বুঝিতে বাকী নাই। ইহা জানিবেন, বিজয়-সিংহ মহাস্থানরাজের পক্ষে ভিক্ষার্থী হইয়া আপনার দ্বারদেশে উপস্থিত হয় নাই।

—আমার উপর রাগ করিবেন না: আমার অবস্থা বুঝিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।

—হাঁ মহারাজ! আপনি যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দেখুন, আমি মহারাজ পরশুরামের আদেশপালক। তাঁহার আদেশ, আপনি পালন করিতে অসমর্থ হইলে, লেখনী-মস্যাধার আনয়ন করুন। আমাকে স্পষ্টভাবে লিখিয়া দিন্—আমি চলিয়া যাই।

—উত্তম, আমি লিখিয়া দিতেছি।

রাজা মাধব লেখনী ও মস্যাধার বাহির করিয়া একখানি ভূর্জ্জপত্রে প্রত্যুত্তর লিখিলেন এবং তাহা বিজয় সিংহের হস্তে প্রদান করিলেন।

বিজয় সিংহ প্রত্যুত্তর-লিপি সযত্নে অঙ্গাবরণী মধ্যে রক্ষা করিয়া কহিলেন—মহারাজ! এখন বুঝিয়া দেখুন, আপনি পরোক্ষভাবে মহাস্থানের সহিত সম্বন্ধ ছেদন করিলেন কি না?

—তাও কি হয়; মহারাজ আমার বাল্যবন্ধু, সে সম্বন্ধ কখনও ছিন্ন হইবে না। আমি আগামী কল্য প্রভাতেই যথাযোগ্য উপঢৌকন সহ কুমারকে রাজধানীতে পাঠাইব।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মহাস্থান-ধনভাণ্ডার এখনও তত দরিদ্র হয় নাই। উপঢৌকন না পাঠাইলেও রাজকার্য্যে অর্থের অসদ্ভাব হইবে না।

রাজা মাধব দ্বারের দিকে পুনঃপুনঃ চাহিয়া বলিলেন—কুমার আসিল না কেন ?

—বিজয় সিংহের নাম শুনিলে, বোধ হয় তিনি এস্থানে আসিবেন না।

—বীর বিজয় সিংহের নাম শুনিলে বরেন্দ্রভূমির কে না শঙ্কিত হয় রাজন্ ?

—সে আমার খুব শ্লাঘার বিষয় নহে, মহারাজ ?

—কেন ?

—সে-কথা থাক্। মহারাজ। এখনও আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই; তথাপি আমাকে যাইতে হইতেছে। শুনুন, আপনি বর্ত্তমান বর্ষের থাল্‌তা মায়ের ভেট পাঠান নাই। সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। আমি সময়মত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব। এস ভৈরব। মহারাজ ! অদ্যকার মত বিদায়—

বিজয় সিংহ ও ভৈরব দ্রুতপদে অনুচরগণ সহ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রলয়ান্ধকারে

উঠ ঝড় উঠ। প্রলয়ান্ধকার ! কাল মেঘে সমস্ত বিশ্ব ঢাকিয়া ফেল। কলনিনাদিনা তরঙ্গমালিনী করতোয়া ! তালে তালে তাথৈ তাথৈ নৃত্য কর। হুহুঙ্কারে সমস্ত বিশ্ব এক নিমিষে চূর্ণ কর। কেন ? এমন সাধের সাজান বাগান চূর্ণ করিবে কেন ? এমন সুন্দর ধরণী—তরুলতা ফলফুলে সুশোভিত, নর-নারী, পশু-পক্ষী প্রভৃতি সহস্র প্রাণিকণ্ঠমুখরিত সংসার-উদ্যান এক নিমিষে ফুরাইয়া যাইবে কেন ?. মানব ! তোমার সাজান বাগান তুমিই ত ভাঙ্গিয়া ফেল। বিশ্ব নানারূপে তোমায়

ভালবাসিতে ছুটিয়া আসে। তুমি কি কখন তাহাকে আদর করিয়া প্রাণের মধ্যে টানিয়া লও? তুমি সুখের নন্দনকাননকে, নরকের পূতি গন্ধে পূর্ণ কর। তোমার স্নেহ মিথ্যা—প্রেম মিথ্যা। তুমি সংসারকে একটা মিথ্যার আবরণে আবৃত করিয়াছ—তাই সংসারও মিথ্যা। এই আছে—এই নাই।

নাচ মা! নাচ। ঐ কালমেঘে কার এলোকেশ দোলে! এই নিবিড় অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া, উন্মাদিনী করতোয়ার বুকে তালে তালে পা ফেলিয়া নৃত্য কর! তুমি কে মা!

ঝটিকাবিক্ষুব্ধ করতোয়ার উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া তিন খানি ছিপ দ্রুতবেগে চলিয়াছে। নিবিড় অন্ধকারে দিক্ নির্ণয় করা কঠিন। ঝঞ্ঝার শন্‌শন্ শব্দে কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। বিজয় সিংহ অগ্রবর্ত্তী ছিপের উপর বসিয়া আছেন। আকাশের পানে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন —ভৈরব! আজ কেমন সুন্দর দৃশ্য। ঘন ঘোর অন্ধকারে তরঙ্গের কল্লনাদ, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমক, গুরুগম্ভীর মেঘগর্জ্জন প্রকৃতির মুখে কেমন করাল অট্টহাসি--তবুও কত সুন্দর!

ভৈরবের সে-কথা ভাল লাগিল না। সে বলিল রাজা! দেখিতেছেন কি? আজ বুঝি আমাদের শেষ দিন, আর রক্ষা নাই। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রভু! মৃত্যু হোক, ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার শ্যামার কি গতি হইবে? কে সে অনাথ বালিকার মুখের পানে চাহিবে?

বিজয় সিংহ কহিলেন, ভয় কি ভাই! প্রাণপণে দাঁড় চালাও। আমাদের নৌকা ডুবিবে না। ব্যস্ত হইয়ো না। আমি হাল ধরি। এই বলিয়া তিনি ভৈরবকে দাঁড়ের কাছে ঠেলিয়া দিয়া নিজেই হাল ধরিলেন।

প্রবল বাতাসে নৌকা তীর বেগে ছুটিল—বিজয় সিংহ সহাস্য বদনে বলিলেন—ভাই সব! তোমরা থাল্‌তা মায়ের সেবক—তোমাদের কাছে যমও ঘেঁসিবে না। মায়ের নাম কর, সব বিপদ কাটিয়া যাইবে।

"জয় থাল্‌তা মায়ী কি জয়" রবে নাবিকগণ সমুৎসাহে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সকলেই সাহসে বুক বাঁধিল।

অকস্মাৎ হুহুঙ্কার করিয়া প্রবল ঘূর্ণিবায়ু প্রবাহিত হইল। করতোয়ার জলরাশি ভীষণ তরঙ্গ-বাহু তুলিয়া যেন মৃত্যু-দেবতাকে আহ্বান করিতে লাগিল। দূর হইতে শব্দ হইল—রক্ষা কর, রক্ষা কর।

বিজয় সিংহ সে-শব্দ শুনিয়া বলিলেন—ভাই সব! বন্ধু সব! ঐ শোন! বিপন্ন হইয়া ঐ কালীদহের মাঝখানে কে চীৎকার করিতেছে। প্রাণভয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে।

—বল কি রাজা! ওখানে কি যাওয়া যায়! কি ভয়ানক ঘূর্ণিপাক? সেখানে গেলে কি আর রক্ষা আছে?

—ভাই সব! একদিন মরিতেই হইবে। মরিতে ভয় পাইলে আমার সঙ্গে আসিয়াছ কেন? দেখ তোমরা যদি না যাও—এখনই আমি জলে ঝাঁপ দিয়া মরিব।

ভৈরব কহিল—তোমার অমূল্য প্রাণের যদি মায়া না থাকে মহারাজ! আমাদের প্রাণেরই বা মমতা কি? চালাও ভাই! আজ সকলে এক সঙ্গে প্রাণ দিব। "জয় থাল্‌তা মায়ী কি জয়।"

তিন খানি ছিপ মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াও ঘূর্ণিপাকের দিকে অগ্রসর হইল।

বিজয় সিংহ চীৎকার করিয়া কহিলেন—ঐ—ঐ, আব্‌ছায়ার মত দেখা যায়। ঐ দেখ নৌকাখানি ঘুরিতেছে—এখনই ডুবিয়া যাইবে! ভাই সব! জোরে—আরও জোরে—

আর জোরে চালাইতে হইল না। স্রোতোবেগে নৌকা আপনি ঘূর্ণিপাকের দিকে পবনগতিতে ছুটিল।

ভৈরব কহিল—প্রভু! মহারাজ! পায়ের ধুলো দাও। এই আমাদের শেষ দেখা—এই আমাদের শেষ বিদায়।

বিজয় সিংহ কহিলেন—হাল ছাড়িয়ো না ভাই! সাবধানে নৌকা চালনা কর। যে মহান্ উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়া আমরা অগ্রসর হইয়াছি তাহা পূর্ণ হইবেই। "শুভ কার্য্যের সহায় ভগবান" এই ধ্রুব-সত্য ভুলিয়ো না। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ—আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে।

ভৈরব উর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখিল, আকাশ নির্ম্মল—ঝড়ের বেগ মন্দীভূত। ভৈরবের মনে সাহস ফিরিয়া আসিল। সে কহিল—ভাই সব! আর ভয় নাই—খুব জোরে হাল চাপিয়া ধর।

দেখিতে দেখিতে তিন খানি ছিপ ঘূর্ণপাকের মধ্যে পড়িল। কই, কোথায় কে বিপন্ন? কোথাও ত কেহ নাই! কুম্ভকারের চক্রের মত ছিপ তিন খানি ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।

বিজয় সিংহ কহিলেন—তবে কি ভুল শুনিলাম!

ভৈরব কহিল—না প্রভু! ভুল নয়, আমিও শুনিতে পাইয়াছি। ঠিক এইখানেই সেই আকুল আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। আমার বোধ হয় নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে।

—আমাদের সব চেষ্টাই কি বিফল হইল?

সহসা জনৈক নাবিক চীৎকার করিয়া উঠিল, মহারাজ! আমাদের শ্রম সফল হইয়াছে। এই দেখুন এই হালের সঙ্গে কতগুলি মানুষের হাত।

বিজয় সিংহ সবিস্ময়ে দেখিলেন, তিনটী মনুষ্য-মূর্ত্তি প্রাণপণে হালের অগ্রভাগ চাপিয়া ধরিয়া ছিপের সঙ্গে ঘূর্ণিপাকে ঘুরিতেছে।

বিজয় সিংহ নাবিকগণের সাহায্যে তিন জনকেই নৌকায় উত্তোলন করিলেন। ভৈরব ও নাবিকগণ প্রাণপণ চেষ্টায় বহু কৌশলে ঘূর্ণিপাক অতিক্রম করিল। স্রোতের মুখে ছিপ তিনখানি পুনরায় ছুটিল।

বিজয় সিংহ উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—ভাই সব! বন্ধু সব! যাঁহার দয়ায় আমরা এই বিপদে প্রাণ পাইলাম, বিপন্নগণের জীবন রক্ষা হইল—একবার তাঁহার জয় ঘোষণা কর।

সকলে উচ্চকণ্ঠে কহিল—"জয় খালতা মায়ী কি জয়", "জয়, রাজা বিজয় কি জয়।"

বিজয় সিংহ কহিলেন—ভৈরব! আমরা এখন কোথায়?

ভৈরব বলিল—বন গাঁয়ের কাছাকাছি।

—একবার মশাল জ্বালো দেখি। তোমাদিগের স্ব স্ব উত্তরীয় বস্ত্র এই জলমগ্নগণকে দাও। ইহারা ভিজা কাপড়ে কতক্ষণ থাকিবে।

নাবিকগণ উত্তরীয় বস্ত্র ছাড়িয়া দিল। বিপন্ন মনুষ্যত্রয় স্বস্ব সিক্ত বস্ত্র পরিত্যাগ করিল। বিজয় সিংহের আদেশে প্রত্যেক ছিপে তিনটী করিয়া মশাল প্রজ্বলিত হইল। বিজয় সিংহ উজ্জ্বল মশাল আলোকে জলমগ্ন ব্যক্তিগণের মুখের পানে চাহিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। কহিলেন, ভগবান্! তোমার লীলা কি বিচিত্র। যাহা স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই, তাহাই ঘটিল। মহাবীর চিহ্লনকে এমন অবস্থায় প্রাপ্ত হইব তাহা ভাবি নাই।

এই বিপন্ন জনগণের মধ্যে একজন আমাদের পূর্ব্বপরিচিত, মহাস্থানের রাজ-কারাগার হইতে পলায়িত সেনাপতি চিহ্লন। বিজয় সিংহ কহিলেন—মহাশয়, এই ভীষণ ঝড়জল মাথায় করিয়া কোথায় যাইতেছিলেন?

চিহ্লন এতক্ষণ অধোবদনে রহিয়াছিল। বিজয় সিংহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল বিজয় সিংহ! কেন তুমি আমায় বাঁচাইলে? এই ভয়াবহ আবর্ত্ত মধ্য হইতে কেন তিনজনকে উদ্ধার করিলে?

—আমি বরেন্দ্রভূমির শত্রু চিহ্লনকে বাঁচাইব মনে করিয়া যাই নাই। নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়াছিলাম, ভাই!

—বিজয়! তুমি দেবতা। দেবতা না হইলে, কে প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া ঘোর ঝঞ্ঝাবাত তুচ্ছ করিয়া, ঘূর্ণিপাকের মধ্যে বিপন্নকে উদ্ধার করিতে যায়?

—আমায় লজ্জা দিয়ো না ভাই! আমি কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি মাত্র।

—জান না কি বিজয়! আমি কে? আমি কি হইয়া গিয়াছি। আমি দিনে দিনে কতদূরে নামিয়া পড়িয়াছি? বিজয় সিংহ! বীর! কর্ত্তব্য সম্পাদন কর। আজ স্বহস্তে পাইয়া ছাড়িয়া দিয়ো না। বরেন্দ্রভূমির মঙ্গলসাধন কর। বিশ্বাসঘাতক পলায়িত রাজদ্রোহীকে এই মুহূর্ত্তে বন্দী কর, এমন সুযোগ হেলায় হারাইয়ো না। আর মহাস্থানের মঙ্গলকামী চিহ্লন নাই—চিহ্লন নাই। চিহ্লন মরিয়াছে। যাহাদিগকে তুমি আসন্ন মৃত্যুর করাল কবল হইতে এইমাত্র উদ্ধার করিলে, তার একজন আমি মহম্মদ খাঁ, আর ইনি সুলতান সাহ—আমাদের সঙ্গী এই যুবক বিরাট রাজ্যের রাজকুমার মহেন্দ্র পাল।

বিজয় সিংহ বিস্মিতভাবে সুলতানের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, এ কি অচিন্তানীয় ব্যাপার! ইনি সুলতান সাহ! চিহ্লন, তুমি কি হিন্দু-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছ?

—কি জানি! ধর্ম্ম কাহাকে বলে আমি তা জানি না। আমি সুলতানের আদেশে মহম্মদ খাঁ নাম গ্রহণ করিয়াছি।

—আমি থালতার রণক্ষেত্রে যে-বীরের অপূর্ব্ব সমর-কৌশল দর্শন করিয়াছি, এবং যাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আমার রণায়াস সার্থক হইয়াছে, তাহাকে ভুলিতে পারিব না। অস্ত্রমুখে যাহার সহিত আমার চিরপরিচয় সে পরিচয় এত অল্প দিনেই কেমন করিয়া ভুলিব ভাই! তুমি আমার পরমশত্রু, আবার তুমিই আমার পরম গৌরব।

—বিজয় সিংহ! আমি বুঝিয়াছি, আমার এই নৈরাশ্যময় জীবন একটা বিয়োগান্ত নাটকের শেষ যবনিকা। শান্তির আগে সব হারাইলাম, এখন অশান্তির দাবানলে দগ্ধ হইতেছি। আমিও তাই চাই; আমার লক্ষিত নামের আবরণের উপর তোমার পুণ্যময় মহিমময় নাম

উজ্জ্বল অক্ষরে ফুটিয়া উঠুক্। অকৃতজ্ঞ নরাধম আমি, তোমার এই অপূর্ব্ব অবদানের কৃতজ্ঞতা এ-জীবনে জানাইতে পারিলাম না। আমায় ক্ষমা করিয়ো।

—সুলতান সাহেব! আমার সেলাম গ্রহণ করুন। আশা করি, শীঘ্রই আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিব।

সুলতান চিহ্লনের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—সেনাপতি! আমাদের প্রাণদাতা এই বন্ধুটী কে?

—জনাব! ইঁহার পরিচয়ে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন কি? ইনি আমাদের পরম শত্রু বিজয় সিংহ।

—বিজয় সিংহ! সেই দস্যুপতি? না মহম্মদ! ইনি অন্য কেহ হইবেন। দস্যুর অন্তঃকরণ এত কোমল, এত উদার নয়। নীরস কঠিনপ্রাণ দস্যু কি পর-দুঃখে বিগলিত হয়?

—বিজয় সিংহ দস্যু নয় জনাব! বিজয় বীর, ধার্ম্মিক। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হিন্দু-সন্তান দস্যুতার চিরকলঙ্ক ললাটে লেপন করিয়া আত্মগোপন করিয়া আছেন

—তথাপি ইনি আমাদের প্রাণদাতা। রাজা! বুঝিতে পারিতেছি না, তোমার এই মহত্ত্বের কি পুরস্কার দান করিব। আমি তোমাদের পরম শত্রু; শত্রুতা-সাধনের জন্যই বরেন্দ্রভূমিতে আগমন করিয়াছি। নতুবা যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদানে এ-ঋণের কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতাম।

বিজয় সিংহ সহাস্য বদনে কহিলেন—সাহেব! আপনার এই কৃতজ্ঞতা স্বীকারই মহত্ত্বের পরিচয়। আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি মাত্র। ইহার জন্য পুরস্কার প্রার্থনা করি না। আপনাদিগের জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছি ভগবানের কাছে ইহাই আমার যোগ্য পুরস্কার।

চিহ্লন সহাস্যবদনে কহিল—বল দেখি বিজয়! তুমি আমাদের সন্ধানেই ছিপ্ লইয়া ছুটিতেছিলে কি না?

বিজয় সিংহ হাসিয়া কহিলেন—হাঁ, সুলতান সাহের আগমন-সংবাদ আমি মাধবপুরেই অবগত হইয়া, আপনাদের সন্ধানেই চলিতেছিলাম।

সুলতান বিজয় সিংহের কথা শুনিয়া কহিলেন—মহম্মদ! তবে কি আমরা বন্দী হইলাম ?

বিজয় সিংহ কহিলেন—সুলতান। আজ নয়। আজ আপনারা মুক্ত। স্বচ্ছন্দে চলিয়া যান। নিরাপদে গন্তব্যস্থানে যতক্ষণ না পৌছিবেন আমি সসৈন্যে ততক্ষণ এইস্থানেই অপেক্ষা করিব। যাহাকে প্রাণপণে উদ্ধার করিলাম, পুনরায় তাহাকে মৃত্যুমুখে তুলিয়া দিব না। নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যান। প্রয়োজন হইলে, আবার কাল আপনার অনুসরণ করিব।

সুলতান কহিলেন—বীর! তোমার এ-মহত্ত্ব আরও প্রশংসনীয়। তোমার মত শত্রুকে কবলে পাইলে আমি বোধ হয় এমনভাবে ছাড়িয়া দিতাম না।

চিহ্লন কহিল—বিজয় সিংহ! ভাই! মহম্মদ খাঁ কাল সর্প - তুমি সেই কাল-সর্পের উদ্ধার সাধন করিয়াছ। ভাল কর নাই, ভাই! না জানি কখন এই ক্রূর কালসর্প তোমার হৃদয়দেশে দংশন করিবে!

—চিহ্লন! সর্প যাঁর শিরোভূষণ সেই ভূতভাবন ভগবান বিজয় সিংহের রক্ষক। সর্পের বিষদন্ত ভগ্ন করিতে বেশী আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

চিহ্লন বিজয় সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, আসি ভাই! এখন এই পর্য্যন্ত। প্রয়োজন হইলে আবার অস্ত্রে অস্ত্রে আলিঙ্গন করিব।

চিহ্লন, সুলতান সাহ ও মহেন্দ্র পাল নৌকা হইতে অবতরণ করিল। তৎপরে বিজয় সিংহের ইঙ্গিতে ছিপ তিন খানি করতোয়ার তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া আবার নক্ষত্রবেগে ছুটিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

মায়ের মন্দিরে

দেবী থাল্‌তেশ্বরীর মন্দির প্রাঙ্গণে বিজয় সিংহ করজোড়ে দণ্ডায়মান। দিবা দ্বিপ্রহর। পুরোহিত মায়ের প্রসাদী নির্ম্মাল্য পুষ্পদাম রাজার করে অর্পণ করিল। রাজা বিজয় সাষ্টাঙ্গে মায়ের চরণে প্রণাম করিয়া নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিলেন। সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিলিপ্ত, জটাবল্কলধারিণী যোগিনী বম্‌বম্ রবে মায়ের মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। বিজয় সিংহ যোগিনীর চরণে প্রণত হইয়া কহিলেন, মা! দেবীর নির্ম্মাল্য অক্ষয় কবচ অঙ্গে ধারণ করিলাম—এখন আদেশ কর।

যোগিনী বলিলেন—হিন্দুসন্তান! মায়ের মন্দির স্পর্শ করিয়া অগ্রে শপথ কর।

—কি শপথ করিব মা!

—পুত্র! বরেন্দ্র-সন্তানগণ পথভ্রষ্ট। পবিত্র বরেন্দ্রভূমি—তোমাদের জন্মভূমির দিকে আর কেহই ফিরিয়া চাহিতেছে না। অ-হিন্দু আত্মসুখ-পরায়ণ বৌদ্ধগণ অহিংসার নামে অনাচারের স্রোতে রাজ্য নাস্তিকতার লীলাস্থলে পরিণত করিয়াছে; আবার সুলতান সাহ তরবারি হস্তে ঐক্যের কুহক-ভেরী বাজাইতে বাজাইতে সোনার দেশ রক্তধারায় ডুবাইবার উপক্রম করিয়া তুলিল। হিন্দু ছিলেন, অ-হিন্দু বৌদ্ধগণ দেশের সুখ-সম্পদ সুলতানের পদতলে অঞ্জলি দিতে উদ্যত। বৃদ্ধ মহাস্থানরাজ একমাত্র তোমার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন। বৎস! চারিদিকে অনল প্রজ্বলিত। যদি এখনও তাহা নির্ব্বাণ করিতে না পার তবে এই অনলে সব ভস্মীভূত হইবে। মহাস্থানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর সৌভাগ্য-রবি চির-অস্তমিত হইবে। শপথ কর, জীবন থাকিতে মহাস্থানরাজকে ফেলিয়া পাল্‌তায় ফিরিবে না!

—মা! আমি কি তোর সন্তান নই? এই বরেন্দ্রভূমিতে কি আমি জন্মগ্রহণ করি নাই? মহাস্থানের গৌরব সে কি মা আমার গৌরব নয়? আমি শপথ করিতেছি, আমার ধমনীর শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত বরেন্দ্রভূমির জন্য দান করিলাম।

—বড়ই অন্যায় করিয়াছ বৎস! যদি সুলতানকে বন্দী করিতে, তাহা হইলে বরেন্দ্রভূমির সকল গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিত। চিহ্নলনের কৌশল, বিদ্রোহীদিগের ষড়যন্ত্র একমুহূর্ত্তে থামিয়া যাইত। কেহই মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে পারিত না। এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিলে কেন বাপ!

—সে শিক্ষা ত দাও নাই জননী! আমি সুলতানকে মৃত্যু-মুখ হইতে উদ্ধার করিয়া নিরাপদে মুক্তপথে যাইতে দিয়াছি। কেন দিলাম? দৈবপীড়িত শত্রুকে বন্দী করিতে প্রবৃত্তি হইল না। সুলতান যাইবার সময় বলিলেন, বীর! আমি যদি এমন অবস্থায় তোমাকে পাইতাম, বোধ হয় ছাড়িতে পারিতাম না। বল মা! আমি কি অন্যায় করিয়াছি!

—তুমি মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ, দেবতার মত কার্য্য করিয়াছ; কিন্তু রাজধর্ম্ম ত পালন কর নাই বাপ! আজ তোমার বিবেচনার দোষে মহাস্থানরাজ বিপন্ন। শত শত শত্রু একদিকে, আর মোরাদ একদিকে; বিপন্ন রাজা পরশুরামকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে? সুলতান কোথায় গেল জান? সে তোমার মহাস্থান গমনের পথ রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছিল। আজ যদি মহাস্থানে না পৌছিতে পার, কাল তুমি আর মহাস্থানরাজের কোনও উপকার করিতে পারিবে না। তোমার অগ্রগমনের পথ রুদ্ধ হইবে।

—এতক্ষণে বুঝিলাম। মা! সুলতানের পশ্চাতে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছি।

—এদিকের সমস্ত প্রস্তুত ?

—হাঁ।

—আমার উপদেশমত মগধে দূত প্রেরণ করিয়াছ ?

—হাঁ।

—বাপ! হিন্দু রাজার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। এ-ব্যবস্থা আরও পূর্বে করা উচিত ছিল। হেমন্ত সেনের যশঃ গৌরবে বঙ্গবিহার ভরিয়া গিয়াছে। তেমন উদার কর্তব্যপরায়ণ বীর আর এদেশে কেহ নাই। শরণাগত মহাস্থানরাজকে মগধেশ্বর প্রাণপণে রক্ষা করিবেন। বিজয়! এ-কথা তাঁর কর্ণে প্রবেশ করিলে, সুলতানকে বরেন্দ্র-বিজয়-আশা পরিত্যাগ করিয়া এতদিন পলায়নের পথ অন্বেষণ করিতে হইত। তা ত হবার নয়,—হিন্দুর যে ঘরে ঘরে শত্রু। রাজাকে কে এ সৎ পরামর্শ দান করিবে? যাক্—সুলতান কোথায়?

—শুনিলাম আত্রেয়ীতীরের ছাউনী তুলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

—মোরাদ কি অগ্রগমনে বাধা দিতে যায় নাই ?

—না। তবে কোনও কারণ থাকিতে পারে।

—উত্তম, তোমরা অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হও। আমি তোমার মঙ্গলার্থ একবার মায়ের নাম জপ করি।

যোগিনী ব্যাঘ্রচর্মাসনে উপবেশন করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।

রাজা বিজয় দণ্ডায়মান হইয়া অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতেছেন। সহসা পৃষ্ঠদেশে কাহার কর-স্পর্শ অনুভূত হইল। তিনি বিস্মিতভাবে পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন—বালিকা শ্যামা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—দেখ রাজা! কেমন জব্দ? কেমন? ভয় পেয়েছ ত?

বালিকার সরল হাস্য দেখিয়া রাজা হাসিয়া কহিলেন—তুমি মা! মায়ের কি ছেলেকে ভয় দেখাতে আছে?

—না রাজা! আমি তোমার মা হব না। তোমার মা যে রাজরাণী, আমি গরীব জেলের মেয়ে। গরীব পেয়ে কি তামাসা করতে আছে রাজা!

—না, আমি তামাসা করি নাই। সত্যই তুমি আমার মা!

—আমি যদি তোমার মা, তবে রাজা! আমার পরণে ছেঁড়া কাপড়, আর হাতে পেতলের বালা কেন?

—আমিও যে মা তোর ভিখারী সন্তান, কেমন করে রাজ-আভরণে তোকে সাজাব! এস মা, বীরকুললক্ষ্মী কুমারীরূপিণী থাল্‌তেশ্বরী! আজ তোমায় মনোমত করে সাজাই।

—আমায় একখানি লালপেড়ে শাড়ী দাও—আমি এর বেশী আর কিছু চাই না।

—এস মা, আমার সঙ্গে এস।

—হাঁ রাজা।

—কেন মা!

—আজ নাকি বাবার সঙ্গে আমায় যেতে হবে। সেই যেখানে খুব বড় রাজবাড়ী আছে। সেখানে নাকি লড়াই হবে। আমি তোমার সঙ্গে বাবার সঙ্গে লড়াই দেখ্‌তে যাব। কখন যাবে রাজা!

—খুব ভোরে।

—আমি আজ সারাটী রাত ঘুমোব না। দেখ না আমি কেমন জেগে থাক্‌তে পারি।

—জাগো মা। তুমি জাগো! আর চেতনাবিহীন সন্তানকে আলস্যের তন্দ্রা হতে চিরজাগ্রত কর।

—আমি শুধু বসে থাক্‌ব না রাজা! লড়াই করব—সেখানকার রাজার মেয়ে লড়াই করবে—আর আমি বুঝি পারব না! আমি সব শিখেছি। হাঁ রাজা! আমায় যে একখানা হাতিয়ার দেবে বলেছিলে?

—দেব বই কি মা। তোমার জন্য বেশ ধারালো হাতিয়ার তয়ের করে রেখেছি।

—তবে আমি তোমার মা হব। বাবা কোথায় গেছে রাজা!

—তোমার বাবা এখনি আস্‌চেন। এস মা! আমি তোমায় লাল শাড়ী পরিয়ে দি।

রাজা বিজয় স্বহস্তে একখানি সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত গোলাপী রঙ্গের শাড়ী শ্যামাকে পরিতে দিলেন। শ্যামা আহ্লাদে গলিয়া গেল।

শ্যামা শাড়ী পরিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, বেশ্ হয়েছে—আজ আমি রাজার মা। আর আমাকে কেউ জেলের মেয়ে বলিয়া গালি দিতে পারিবে না।

এস মা! এখন ঘরে চল—তোমার জন্য সন্দেশ, ফলমূল রেখেছি—কিছু খাবে এস।

—আমি অমনি খাব না। আমায় মাও বল্‌বে, আবার জেলের মেয়ে বলে ঘৃণাও করবে—তা হবে না। আমায় কোলে করে নিয়ে চল!

—এত ছলনা—এত পরীক্ষা! হৃদয়ে আছ—তবুও কি হৃদয় দেখ্‌তে পাও নাই। এস মা! আমার কোলে এস।

শ্যামা এক লম্ফে বিজয় সিংহের কোলে উঠিল। স্নেহময়ী তনয়ার মত তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। বাৎসল্যভাবে রাজার অন্তর পূর্ণ হইল।

যোগিনী মাতার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি রাজার ক্রোড়ে শ্যামাকে দেখিয়া কহিলেন—হ্যাঁলা শ্যামা! তুই নাকি রাজার মা! তবে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছিস্ কেন?

শ্যামা তাড়াতাড়ি রাজার ক্রোড় হইতে নামিয়া বলিল—দেখ

ঠাকরুণ! আমি বসিয়া থাকিতে পারি না। বাব আসিবেন, তবে ত আমি কাজ করিব। তুমি তার কি বুঝিবে? আমার কত কাজ তা জান? আমি তীর, ধনুক, বল্লম সব ঠিক করে গুছিয়ে রেখেছি। আমি চুপটা করে বসে থাক্‌বার মত মেয়ে নই।

যোগিনী হাসিয়া কহিলেন—হ্যাঁলা শ্যামা! তুই কি আমার সতীন? তাই ঝগড়া করতে উঠেছিস্‌।

বালিকা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল,—না ঠাকুরুণ! ও-কথা বোলো না—আমার ঘাট হবে। ছি! তোমরা দেবতা মানুষ, আর আমি জেলের মেয়ে। রাজা! আমি তোমার কোলে উঠে অন্যায় করেছি; এ-কথা শুনলে বাবা রাগ বে। আমি তোমার পায়ে পড়ি, তাকে বোলো না? দেখ বল্‌বে না ত?

—না, বল্‌বো না। তুমি লক্ষ্মী মেয়েটীর মত আমার সঙ্গে কিছু খাবে এস।

—খাব বই কি রাজা! বাবা বলে, তোমার খেয়েই আমরা মানুষ। তা খাব বই কি? তুমি যদি খেতে না দাও আমরা দুটী বাপে ঝিয়ে না খেয়েই যে মারা যাব।

রাজা শ্যামার হাত ধরিয়া ভোগ-মন্দিরের প্রাঙ্গণে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে মায়ের প্রসাদ খাইতে দিলেন।

শ্যামা প্রসাদ খাইতেছে- এমন সময়ে শিবনাথ নামে এক ধীবর-যুবক সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি শিবু, খবর কি? তোমাদের সর্দার কোথায়?

—আজ্ঞে সর্দার ছিপে আছেন, আমাকে পাঠাইয়া দিলেন।

—খবর কি? সমস্ত প্রস্তুত?

—হাঁ মহারাজ! আর এক নূতন খবর আছে।

—কি ?

—সর্দার বাবা দিলবর খাঁ নামে একজন শত্রুর গুপ্তচরকে ধৃত করিয়াছেন।

—জলপথে, না স্থলপথে ?

—বোধ হয় জলপথে। হ্যাঁ, তার নৌকাখানা কুড়াল মারিয়া ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

—উত্তম, তুমি এক কাজ কর। তুমি শ্যামাকে নিয়ে ওর বাবার কাছে রেখে এস।

—মায়ের মন্দির রক্ষার জন্যে কে থাকিবে মহারাজ !

—মায়ের মন্দির মা রক্ষা করিবেন। তথাপি রাধাবল্লভকে রাখিয়া যাইব। রাধাবল্লভ সসৈন্যে থালতাপুরী রক্ষা করিবে।

শ্যামার প্রসাদ খাওয়া শেষ হইল। শ্যামা কহিল—হাঁ শিবু দাদা! তুই প্রসাদ খাবিনে ?

শিবনাথ কহিল—না, তুই খা। আমি প্রসাদ খাব এখন। আয় তোকে রেখে আসি। এই বলিয়া শিবনাথ শ্যামাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

যোগিনী মাতা রাজাকে ডাকিয়া কহিলেন—শুনিলাম, থালতা পর্য্যন্ত সুলতান গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছে। প্রস্তুত হও, আর বিলম্ব করিয়ো না।

মায়ের মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইল। রাজা ও যোগিনী মাতা তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিপথে

অন্ধকার বেশ একটু জমাট বাঁধিয়াছে। রাত্রি প্রহরেক অতীত। গড় মহাস্থানের প্রসিদ্ধ তোরণ তাম্রদ্বার-পথে এক যুবতী ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে বাহির হইল ও রাজপথ বাহিয়া উত্তর দিকে চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিল—পথিপার্শ্বে লতাকুঞ্জের অন্তরালে এক অন্ধকার মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। যুবতী সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইল এবং অতি মৃদু বংশীধ্বনির ন্যায় সাঙ্কেতিক শব্দ করিল। একাকিনী অন্ধকার পথে কে এ রমণী!

রমণী ধীর-পাদবিক্ষেপে অন্ধকার মূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া কহিল—তোমার আগমন সংবাদ অনেক পূর্ব্বেই অবগত হইয়া বাহির হইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলাম। রাজকুমারী এতক্ষণে ঘুমাইল—তবে বাহির হইতে পারিলাম।

—হরপাল তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিল কি প্রকারে?

—সে অনেক কথা। সে-কথা থাক্; তুমি আসিলে কেন? জান নাকি, কেহ টের পাইলে ঘাতকের তীক্ষ্ণ খড়্গে তোমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইবে!

—তাহা জানি, তবুও আসিয়াছি। আসিয়াছি কেন শুনিবে? সমুদ্রের মত গভীর ভালবাসা তোমাকে—

চঞ্চলা একটু আত্মহারা হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—দেখ, এই পথে প্রহরিগণ আসিতে পারে।

—ভয় নাই সুন্দরি প্রহরী এই পথে আসিলে শাণিত ছুরিকা

তাহার হৃদয়দেশে আমূল বিদ্ধ হইবে। সে তাহার প্রভুর নিকটে সংবাদ দিবার অবসরও পাইবে না।

—ছি! তুমি বড় নির্দ্দয়।

—তোমার প্রেম আমায় আরও কঠিন করিয়া তুলিতেছে।

—তাহা হইলে তুমি আমায় যথার্থ ভালবাস না।

—শুন চঞ্চল! ঊর্দ্ধে অনন্ত নৈশাকাশ সাক্ষী, আর রজনীর এই অন্ধকারের মত গভীর আমার হৃদয় সাক্ষী,—আমি সত্যই তোমায় ভালবাসি।

চিহ্লনের এই কথা শুনিয়া চঞ্চলা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া কহিল—বল দেখি কেন আসিয়াছ?

চিহ্লন কহিল দেখ চঞ্চল! আমার আশা অনেক, তাহা তোমাকে শুনাইব বলিয়াই আসিয়াছি। আমার কথা শুন—বুঝিয়া উত্তর দাও। ইহাতে আমাদের উভয়েরই শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে।

চঞ্চলা ব্যস্ত হইয়া কহিল—ভূমিকা ছাড়িয়া দিয়া এখন কাজের কথাটাই বল না?

—আমি মহাস্থান-সিংহাসন অধিকার করিতে চাই।

—তার পর।

—তুমি আমার ভাবী রাজ্যের পাটরাণী হইবে। বুঝিয়াছ?

—বুঝিলাম। বুঝিলাম, তুমি দুরাশায় উন্মত্ত হইয়াছ। কিন্তু এ-কার্য্য কি সম্ভব?

—হাঁ, তুমি কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য করিলেই আমি অল্লায়াসে গড় হস্তগত করিতে পারি।

—আমি কি করিতে পারি—আমার ক্ষমতা কি! আমি সামান্য স্ত্রীলোক বই ত নয়!

—তুমিই পারিবে। দেখ চঞ্চল! কৌশলেই অসাধ্য সাধন হয়।

চঞ্চলা ব্যস্ত হইয়া কহিল—না, আমি পারিব না। রাজা, রাজকুমারী সকলেই আমাকে বিশ্বাস করেন। দেখ অধর্ম্মের ফল কখনই শুভ হইবে না। আরও দেখ, বিজয় সিংহ, মীর্জ্জা মোরাদ যে-তরণীর কর্ণধার সে-তরণী ডুবাইয়া দেওয়া কি তোমার-আমার সাধ্য, চিহ্লন!

চিহ্লন উদাস দৃষ্টিতে চঞ্চলার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল—দেখ, আমি বড় আশা করিয়া আসিয়াছি, আমায় নিরাশ করিয়ো না। এই বলিয়া চিহ্লন চঞ্চলার হস্ত ধারণ করিল। চঞ্চলার হৃদয়-মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিল। এক নিমিষে আত্মহারা হইয়া কহিল—তোমার সন্তোষের জন্য যদি আমাকে নরকে ডুবিতে হয়—ডুবিব। বল কি করিতে হইবে?

চিহ্লন চঞ্চলার কানের কাছে মুখ লইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল। চঞ্চলা চমকিত ভাবে বলিল, বল কি? না, আমি পারিব না। কর্ত্তব্য-কঠোর রাজমন্ত্রীর আবাস-ভবন হইতে রাজকোষের চাবি অপহরণ করা—এ যে অসম্ভব কল্পনা!

—আবার অন্য মত? ছি চঞ্চলা! নিজের সুখের পথ নিষ্কণ্টক করিতে চাহ না? একটু কৌশল; তাহা হইলেই আমাদের সকল কণ্টক ঘুচিয়া যায়—সমস্ত বরেন্দ্রভূমি আমাদের পদানত হয়। এই কথা বলিয়া চিহ্লন আকুল আবেগে চঞ্চলাকে বক্ষে ধারণ করিয়া সাদরে তাহার মুখ চুম্বন করিল।

চঞ্চলা এত আদর, এমন সোহাগ জীবনে বুঝি কখনো পায় নাই। সে আপনা ভুলিল। প্রেমের মদির মোহে তাহার কর্ত্তব্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। এতদিন কত যত্নে যাহা রক্ষা করিয়াছিল, আজ একটী নিমিষে কোন্ স্বপ্নের মধ্যে ডুবিয়া চঞ্চলা আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিল।

লেখনী! নরকের ছবি আঁকিতে কম্পিত হইয়ো না। সংসারের ঘৃণা দৃশ্য মানুষের চক্ষুর সম্মুখে এমনি ভাবেই ফুটিয়া উঠে। লোভে আত্মজ্ঞান

করিতে না শিখিলে এইরূপেই পদস্খলন হয়। বালির বাঁধে সমুদ্র-তরঙ্গ রুদ্ধ হয় না, কিন্তু শিল্পীর প্রাণ-পাতী চেষ্টায় খরস্রোতা পদ্মার তরঙ্গলীলাও রুদ্ধ হইতে পারে।

চঞ্চলা আর বিলম্ব করিল না। ত্বরিত পদে তাম্রদ্বার সমীপে উপস্থিত হইল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

সন্দেহ

সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া মহারাজ পরশুরাম, সেনানায়ক মোরাদকে লইয়া মন্ত্রণা-ভবনে প্রবেশ করিলেন। নির্জ্জন মন্ত্রণাগারের প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে স্ফটিকাধারে দীপ প্রজ্বলিত। সমস্ত কক্ষ আলোকোদ্ভাসিত। মহারাজ আসন গ্রহণ করিলে, মোরাদ অপেক্ষাকৃত নিম্নাসনে উপবেশন করিলেন। মহারাজ একখানি লিপি পাঠ করিতে করিতে বলিলেন, বেশ কৌশলময় প্রত্যুত্তর। মোরাদ তুমিও পত্রখানি পাঠ কর।

পত্র পাঠ করিয়া মোরাদ কহিলেন—কেমন যেন সন্দেহের ছায়া আসিতেছে, মহারাজ!

মহারাজ পরশুরাম কহিলেন—মাধব পাল সামান্য সৈন্য-সাহায্য করিতে অক্ষম—এটা কেমন কথা। নিমন্ত্রিত সমস্ত সামন্ত ও বন্ধু রাজগণ মহাস্থানে সসৈন্যে উপস্থিত—কিন্তু সামন্তশ্রেষ্ঠ মাধব পাল অসুস্থতার ভাণ করিয়া উপস্থিত হইল না। দেখ কেমন চতুরতা করিয়া আপন নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য পুত্র হরপালকে পাঠাইয়াছে। একা মাধব পাল নয়, মোরাদ! অনেকেই এই পথ অবলম্বন করিয়াছে। মাধব পাল রাজনীতির চক্ষে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহী, পরোক্ষে মহেন্দ্র পাল প্রভৃতি অনেকেই আছে।

সেনাপতি কহিলেন—উপস্থিত কি করা কর্ত্তব্য আদেশ করুন।

পরশুরাম কহিলেন—পরামর্শের জন্যই ত তোমায় নির্জ্জনে ডাকিয়াছি।

সেনাপতি কহিলেন—মহাস্থান-সৈন্যের ভাব-গতিক বড় সুবিধা বোধ হইতেছে না। কেমন যেন ছাড় ছাড় ভাব; নিতান্ত দায়ে পড়িয়া যেন কার্য্য করিতেছে।

রাজা কহিলেন—তুমি কি করিতে চাহ?

মোরাদ কহিলেন—আমি শত্রুর অগ্রগমনে বাধা দিতে চাই। কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে কই? সকলেরই মত এইখানে যুদ্ধ করা। আমি সেই মতেই মত দিতে বাধ্য হইলাম।

পরশুরাম কহিলেন—এটাও যেন মন্দ নয়। শত্রুপক্ষ তাহাদের অজানিত স্থানে আসিবে—আর এই স্থান আমাদের চিরপরিচিত।

মোরাদ কহিলেন—চিহ্লন সুলতানের পদানত, সুতরাং গড় মহাস্থানের অন্ধিসন্ধি তাহার জানিতে বাকী নাই। আর মহাস্থান-সৈন্যের ভাবগতিক দেখিয়া মনে শঙ্কা হইতেছে, ইহারা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

রাজা পরশুরাম কহিলেন—তাহা হইলে বুঝিব, মোরাদ! এই বাঙ্গালা দেশে কোনও রাজারই সিংহাসনের ভিত্তিমূল দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। কুলাঙ্গারগণ যদি জাতি ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা ভুলিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহা হইলে মহাস্থান-রাজ্য সর্ব্বনাশের অতল জলে নিমগ্ন হইবে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদিগের সন্তানসন্ততিগণ নিরবচ্ছিন্ন সুখে দিন যাপন করিতে পারিবে না। রক্তস্রোতে বাঙ্গালার সিংহাসন টলমল করিবে। এই বরেন্দ্র-ভূমি অত্যাচারীদের লীলাস্থল হইয়া উঠিবে। বিশ্বাসঘাতক বরেন্দ্র-সন্তান আমার অভিশাপে যুগে যুগে রাজার চির অবিশ্বাসের ভার মস্তকে বহন করিয়া ধরাতলে বিদ্যমান থাকিবে।

মোরাদ কহিলেন—মহারাজ! বরেন্দ্রদেশবাসী হিন্দুসন্তান অবিশ্বাসী নয়। কিন্তু অ-হিন্দু বৌদ্ধরাজগণ আর চিহ্লনের উৎকোচে বশীভূত হিন্দু

সৈনিকগণ বিশ্বাসঘাতক। কি করিব মহারাজ! শত্রু অদূরে—নতুবা বিশ্বাসঘাতকগণকে গড় হইতে এই মুহূর্ত্তে বিতাড়িত করিতাম।

পরশুরাম কহিলেন—বিজয় সিংহের সহিত বহু সৈন্য আসিয়াছে; আর আর হিন্দুরাজগণও সসৈন্যে উপস্থিত। পালরাজাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া বিদ্রোহী সৈনিকদলকে বন্দী করিলে কেমন হয়?

মোরাদ কহিলেন—বিদায় করিয়া দেওয়া অপেক্ষা সামান্য কার্য্যে নিয়োগ করিয়া তাহাদের কার্য্যের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখা মন্দ নয়।

রাজা কহিলেন—বিজয়ের সহিত পরামর্শ করিয়াছ?

মোরাদ কহিলেন—হাঁ মহারাজ! তাঁহার নবগঠিত ধীবর ও কোচ সৈন্য, আর আমার বশীভূত সৈন্যদলের সাহায্যেই আমি সুলতানের মহড়া লইতে সমর্থ হইব।

রাজা পরশুরাম একটু আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন—আর এই সংবাদ অবগত হইয়া বহুস্থান হইতেই এতদ্দেশবাসী হিন্দুবীরগণ প্রত্যহই উপস্থিত হইতেছে। পরমানন্দ রায় তাহার পুত্রদ্বয়কে লইয়া জয়সহর হইতে ফিরিয়াছে কি মোরাদ?

মোরাদ কহিলেন—না মহারাজ! অদ্য তাঁহার ফিরিবার কথা।

রাজা কহিলেন—মোরাদ! সে বৃদ্ধের দেহে এখনও যুবকের মত শক্তি আছে। কিন্তু আমি কি হইয়া গিয়াছি। আমার বাহুবল, হৃদয়ের শক্তি, প্রিয়তমা সাধ্বীপত্নী শুভদেবীর সঙ্গে সব হারাইয়াছি। আগে কি জানি মোরাদ! তাহা হইলে কি চিহ্ললকে এতটা বিশ্বাস করিতাম। কালসর্প পোষণ করিয়া এখন বিষের জ্বালায় দগ্ধ হইতেছি।

মোরাদ সহানুভূতির স্বরে কহিলেন—আরও যেন কি শুনিলাম মহারাজ!

রাজা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—কি শুনিলে?

মোরাদ শূন্য দৃষ্টিতে কহিলেন—বড় ভয়ানক কথা! রাজ-কোষাগার শূন্য—মন্ত্রী পলায়িত!

রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন—কই! আমি ত মন্ত্রীকে এজন্য কিছুই বলি নাই। রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় রাজকোষের যাবতীয় ধনরত্ন অপহৃত হওয়া আমারই অদৃষ্টের ফল—এ-বিষয়ে মন্ত্রীর দোষ কি? জগতের যত অমঙ্গল মূর্ত্তিমান হইয়া, আমার উপরে আপতিত হইতেছে।

মহারাজের এইরূপ উত্তর শুনিয়া মোরাদ কহিলেন—তাহার জন্য চিন্তা করিবেন না, মহারাজ! মোরাদের সর্ব্বস্বই আপনার। এতদিন যে-ধন অর্জ্জন করিয়াছি, এখন তাহার সদ্ব্যবহার করিব।

মহারাজ পরশুরাম স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে মোরাদের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন—তুমি তোমার সর্ব্বস্ব মহাস্থানের জন্য দান করিবে কেন? অদৃষ্টের প্রহার আমারই মস্তকে পতিত হইতে দাও।

মোরাদ ব্যগ্র কণ্ঠে কহিলেন—মহারাজ! প্রভু! ধনে আমার প্রয়োজন কি? যাহার সংসার আছে, স্ত্রী-পুত্রাদি আছে, তাহারই ধনের প্রয়োজন। আপনি না বলিলেও আমি মহাস্থানের জন্য আমার সর্ব্বস্ব দান করিব।

রাজা পরশুরাম স্নেহসিক্ত স্বরে কহিলেন—রাজ্যের একনিষ্ঠ ভক্ত! আমি তোমার শ্রমলব্ধ অর্থ গ্রহণ করিব না। অন্য কোন উপায় নাই কি, বৎস!

মোরাদ কহিলেন—যে রসদ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতেই এক মাস যুদ্ধ চলিতে পারে। প্রয়োজন হইলে অর্থের অসদ্ভাব হইবে না। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় পলায়ন করিলেন কেন?

রাজা কহিলেন—তাহার কোন দোষ নাই। সরলপ্রাণ পুণ্ডরীক লজ্জায়, ঘৃণায় মৃতপ্রায় হইয়া মহাস্থান রাজ্য ত্যাগ করিয়াছে।

মোরাদ! আগামী পরশ্ব সমর-সভার দিন স্থির করিয়াছি। এমন সময়ে মন্ত্রী অনুপস্থিত থাকিলে চলিবে কেন?

মোরাদ কহিলেন—মহারাজ! আপনার আদেশের পূর্ব্বেই আমি মন্ত্রী মহাশয়ের অন্বেষণে চতুর্দ্দিকেই চর প্রেরণ করিয়াছি।

রাজা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—না মোরাদ! তুমি নিজেই বাহির হও। আকস্মিক দুর্ঘটনায় হৃদয়াবেগে ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিতে পারে।

মোরাদ কহিলেন—নিশ্চিন্ত হউন মহারাজ! আমি আমার উপস্থিত কার্য্যভার বিজয় সিংহের করে অর্পণ করিয়া মন্ত্রী মহাশয়ের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলাম। এই বলিয়া মোরাদ রাজাকে যথোচিত অভিবাদন করিয়া মন্ত্রণাগার ত্বরিত পদে হইতে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ পরশুরাম শূন্যমনে আসনখানি বাতায়ন পার্শ্বে টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন এবং গণ্ডদেশে হস্ত স্থাপন করিয়া গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন। সমগ্র বরেন্দ্রভূমির একচ্ছত্র অধীশ্বর মহারাজ পরশুরামের আবার চিন্তা কি? রাজা ভাবিতেছেন—ভগবন্! কোন্ পাপে আমার অদৃষ্টে এত বিড়ম্বনা! বৃদ্ধ আমি—জরাজর্জ্জরিত দেহ। সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তোমার চরণ চিন্তা করিব, তা না হইয়া প্রভু! জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে এ কি অসার-চিন্তায় দগ্ধ হইতেছি। জীবনে কি একদিনও নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে পাইব না? দীন কুটীরবাসীও আমা অপেক্ষা সুখী। তাহারাও নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রার সুকোমল অঙ্কে অঙ্গ ঢালিয়া দুই দণ্ড বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে পারে। হায়, আমি কি দুর্ভাগ্য! দিন নাই—রাত্রি নাই, অবিরাম কোলাহলের মধ্যে অঙ্গ ঢালিয়া চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছি। রাজ্য-সম্পদ কিছুই নয়। ঐশ্বর্য্যের কনক মুকুটের প্রতি পরধনপ্রয়াসী দস্যু সর্ব্বদাই লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। ধনীর

আজীবন শ্রমলব্ধ ঐশ্বর্য্য—রাজার কষ্টার্জ্জিত রাজ্য কিছুই নিরবচ্ছিন্ন সুখের নয়। তবে কেন এ তৃষা! মানুষের কেন এ ভ্রান্তি? অর্থ অর্থ করিয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেন এত ছুটাছুটি! সুলতান মহাস্থানে আসিতেছে, সে-ও অর্থলোভে। কিন্তু হায়! কেউ ত জানে না—এই বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর নরসিংহ আজ কপর্দ্দকহীন। অগণিত ধনরত্ন যেন যাদু-মন্ত্রে কোথায় উড়িয়া গেল। তার জন্য চিন্তা কেন? বহুকালপ্রোথিত তুচ্ছ অঙ্গার হীরকের জন্মদাতা। মণি-মাণিক্য একটা নামমাত্র—বিনিময়ের জন্য মানব-কল্পনা। অতি তুচ্ছ—কিন্তু হায়, মন বুঝে না কেন?

রাজা এইরূপ কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে রাজকুমারী লীলাদেবী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—দ্বার রুদ্ধ করিয়া কি ভাবিতেছেন, পিতা!

রাজা উদাস দৃষ্টিতে তনয়ার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—কি আর ভাবিব মা! ভাবিবার কতই আছে। তাহা না ভাবিয়া একটা অসার চিন্তায় কালক্ষেপ করিতেছি।

—কি শুনিলাম বাবা!

—যাহা শুনিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে। রাজকোষ শূন্য—মন্ত্রী পলায়িত। আগুন জ্বলিয়াছে, জ্বলিতে দাও মা! তুমি কেমন করিয়া এ-কথা শুনিলে? এ-কথা যে মা, অন্যের অপরিজ্ঞাত।

—অপরিজ্ঞাত নয় বাবা! সমস্ত নগরময় এ-কথার আলোচনা হইতেছে।

—অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কেমন করিয়া এ-কথা নগরে রাষ্ট্র হইল! তবে কি যাহা ভাবি নাই, ভাবিতেও প্রবৃত্তি হয় না, সেই কথাই সত্য? সাধু, সদাশয় মন্ত্রী পুণ্ডরীক চোর? না, না, ইহা আমার ভ্রম। এ-কথা মিথ্যা! ইহাও কুটিল কুচক্রী চিহ্লনের আর একটা কৌশল।

শীলাদেবী কহিলেন—পুণ্ডরীক কাকা পলায়ন করিলেন কেন বাবা!

—লজ্জায়, ঘৃণায় মৃতপ্রায় হইয়া ব্রাহ্মণ মহাস্থান ত্যাগ করিয়াছে। ইহাই সত্য। মা শীলা! আমার মন বলিতেছে—পুণ্ডরীক নির্দ্দোষ। কি জানি, অন্ধকার পরহৃদয়-রহস্য কি বুঝিব মা!

—কি হবে বাবা! চতুর্দ্দিকেই যে বিপদ উপস্থিত।

রাজা শূন্য মনে কহিলেন—দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না মা! মহাকালী যাহা করিবেন তাহাই হইবে। তাহার জন্য চিন্তা কি? রাজ্য, সম্পদ্ কিছুই চিরস্থায়ী নয়; এই আছে—এই নাই। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের এই গৌরবময় সিংহাসনে কত রাজা সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছেন, আবার কত রাজার মহিমময়, গৌরবময় রাজমুকুট সমরক্ষেত্রে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যের এই ত পরিণাম। কালের ইচ্ছা কে রোধ করিবে মা!

রাজকুমারী কহিলেন—এ অবস্থায়, বাবা! আপনাকে অসীম ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে। কি বিপদের কথা! সুলতান মহাস্থান আক্রমণে উদ্যত—এই ঘোর বিপদের সময়ে রাজকোষের সমুদয় অর্থ অপহৃত হইল!

রাজা কহিলেন—চিন্তা কেন মা! অদৃষ্টের প্রহার নীরবে সহ্য করিব। এ-সংবাদ গোপনে থাকাই কর্ত্তব্য। এখন দুর্ব্বল দেখিলে শত্রুগণ আরও প্রবল হইয়া উঠিবে।

শীলাদেবী কহিলেন—মহাকালীর চরণ চিন্তা কর বাবা! এ বিপদে তিনি ভিন্ন আর কে রক্ষা করিবে?

রাজা কহিলেন—ভয় কি মা! তাঁহার মহাস্থান তিনিই রক্ষা করুন। এই বৃদ্ধ বয়সে আমি তাঁহার মহাপূজার আয়োজন করিতেছি। রণক্ষেত্রে সহস্র শত্রুর বক্ষ-শোণিতে, মায়ের প্রবল পিপাসার শান্তি করিব। শক্তিময়ী মা! দাও মা! এই বৃদ্ধের বাহুতে আবার যুবার মত

শক্তি দাও—মনে মত্ত হস্তীর বল দাও। করজোড়ে তোর পায়ে শক্তি ভিক্ষা করি!

শীলাদেবী হতাশ ভাবে কহিলেন—মন্ত্রী কাকা চলিয়া গেলেন। এ শত্রুপুরীতে আর আপনার বলিতে কেহই নাই।

রাজা কহিলেন—ব্রাহ্মণ কেন গেল। চতুর্দ্দিকেই অশুভ লক্ষণ। রাজলক্ষ্মী রাণী শুভদেবী গেলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুলতান সাহ মহাস্থান আক্রমণে উদ্যত। অগণিত ধন রত্ন অপহৃত। কেশ শুক্ল, দন্ত পতিত। পুত্রোপম পুণ্ডরীক এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে বিপদের মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল। আত্মীয় বন্ধুর বিচ্ছেদভার বুকে লইয়া প্রহেলিকার রাজ্যে কি কাজ, মা! রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে মহাস্থানের সৌভাগ্যরবি চির-অস্তমিত হইয়াছে। ভোজবংশের বিজয়-গৌরবের কীর্ত্তিস্তম্ভ আজ ধূলি-বিলুণ্ঠিত।

শীলাদেবী কহিলেন—রাত্রি অনেক হইয়াছে, বাবা! এখন একটু বিশ্রাম করুন।

রাজা কাতর প্রাণে কহিলেন—বিশ্রাম? কোথায় বিশ্রাম? বিশ্রামের অবসর কই মা! উৎপীড়িত প্রজাপুঞ্জের নিদারুণ অভিশাপ, দীন আর্ত্তগণের কাতর ক্রন্দন, অনশন-ক্লিষ্ট দরিদ্রের মর্ম্মভেদী হাহাকার, নিয়ত আমার শ্রবণবিবর বধির করিতেছে। আমার চক্ষে ঘুম আসিবে কেন মা! ঘুম আর একদিন আসিবে—সে-ঘুম হইতে আর জাগ্রত হইব না।

রাত্রি প্রহরেক অতীত। রাজকুমারী পিতার হস্ত ধারণ করিয়া প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইলেন এবং নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্যে রাজাকে প্রবোধ দান করিয়া বিশ্রাম ভবনে লইয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

নগরোপকণ্ঠে

"শ্যামলী ! ও শ্যামলী !"

কক্ষে ভিক্ষার ঝুলি, দ্বাবিংশবর্ষীয় এক গৌরকায় ব্রাহ্মণযুবক সমস্তদিন ভিক্ষা করিয়া কুটীরে ফিরিলেন। নগরের পূর্ব্ব প্রান্তে তাঁহার খড়ের চালা ঘর ; তাহাও অর্দ্ধভগ্ন। সেই ভগ্ন কুটীর আলো করিয়া দেবীপ্রতিমার মত এক সুন্দরী পূর্ণাবয়বসম্পন্না যুবতী বসিয়া ছিলেন। যুবকের নাম রঘুপতি শর্ম্মা, আর এই দেবীপ্রতিমা তাঁহার সাধ্বী পত্নী শ্যামলী।

বৈশাখী দ্বিপ্রহর। সূর্য্যদেব অনল বর্ষণ করিতেছেন। রঘুপতি ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কুটীরে ফিরিলেন। দ্বারপ্রান্তে দাড়াইয়া ডাকিলেন :-- শ্যামলী ! ও শ্যামলী !

শ্যামলী কুটীর হইতে বাহির হইলেন। স্বামীকে শুষ্কমুখ ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর দেখিয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় একখানি কুশাসন বিছাইয়া দিলেন। রঘুপতি তাহাতে উপবেশন করিলে শ্যামলী একখানি ব্যজনী লইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন।

রঘুপতি হাসিয়া কহিলেন—পেটের ভিতর দারুণ জ্বালা, বাহিরের হাওয়ায় শীতল হইবে কি ?

শ্যামলী স্বামীর আতপক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন—আজ ফিরিতে একেবারেই বেলা শেষ। এত কষ্ট কি শরীরে সয় ? দেখ, এই পোড়া পেটের জন্যই তোমার এত কষ্ট।

আমি আজ থেকে আধ-পেটা খেয়ে থাকৃব; আমার জন্য আর তোমাকে কষ্ট করিতে দিব না. পা ধোও; স্নান আহ্নিক সমাপন করিতেই বেলা শেষ হইয়া যাইবে।

রঘুপতি কহিলেন—যাক্—তাহাতে ক্ষতি কি শ্যামলী! আমার এমন কি কষ্ট! কিন্তু তুমি যে সারাটা দিন মুখে জলবিন্দুও দাও নাই, এ-কষ্ট রাখিবার স্থান আমার নাই।

রঘুপতি স্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিয়া পূজার আসনে উপবেশন করিয়াছেন—এমন সময়ে বহিঃপ্রাঙ্গণ হইতে কে যেন ডাকিল "মা!"

শ্যামলী বাহির হইয়া দেখিলেন, কুটীর-সন্নিকটস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষে হেলান দিয়া এক প্রৌঢ় ব্যক্তি চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছে।

শ্যামলী ত্বরিতপদে স্বামিসান্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন—কার ধ্যান কর ঠাকুর! নারায়ণ যে সম্মুখে উপস্থিত।

রঘুপতি বিস্মিত ও চমকিত ভাবে চক্ষু মেলিলেন। কহিলেন—কই, কই শ্যামলী!

শ্যামলী কহিলেন—শীঘ্র পূজা সাঙ্গ কর। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য; ঐ দেখ অশ্বত্থ বৃক্ষতলে এক উপবাসী ব্রাহ্মণ। ঠাকুর! আজ অতিথিরূপী নারায়ণ সশরীরে উপস্থিত। এতদিন আমাদের এ সৌভাগ্য ঘটে নাই। আজ আমাদের কুটীর পবিত্র হইল।

রঘুপতি পূজা শেষ করিয়া উঠিলেন এবং ত্বরিত পদে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ছিন্নবসনপরিহিত রাজমন্ত্রী পুণ্ডরীক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছেন। রঘুপতি বিনীতভাবে বলিলেন—মার্জ্জনা করিবেন, আমি আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি। এইমাত্র পত্নীর মুখে আপনার আগমন-বার্ত্তা অবগত হইলাম। মহাত্মন্!

আপনি অভুক্ত ; কাঙ্গালের কুটীরে পদরেণু দান করিয়া কৃতার্থ করুন। আতিথ্য স্বীকার করিয়া দীন ব্রাহ্মণদম্পতীকে ধন্য করুন।

—ঠাকুর! আমার অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত হইলে বোধ হয় আপনি এরূপ অনুরোধ করিবেন না।

—মহাশয়! আমি ভিক্ষুক, আপনার সেবা করিব এরূপ সঙ্গতি আমার নাই। তবে শুনিয়াছি, নারায়ণ কাঙ্গাল বিদুরের অন্ন গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আপনাকে আমি চিনিয়াছি। মহাভাগ! পদধূলি দানে কাঙ্গালের পর্ণকুটীর পবিত্র করুন। মহাশয়! আমরা সারাটী দিন জলবিন্দুও গ্রহণ নাই। আপনি ব্রাহ্মণ; আপনাকে অভুক্ত রাখিয়া কেমন করিয়া জল গ্রহণ করিব ?

—আমার অবস্থা শুনিয়াও যদি আমাকে কুটীরে লইয়া যাইতে সাহস করেন, আমার আপত্তি নাই। আমি পলায়িত, গুরুতর অপরাধে অপরাধী, রাজপুরুষগণের চক্ষু এড়াইয়া এই স্থানে আসিয়া বসিয়াছি। আর একটু পরেই সন্ধ্যা হইবে। অন্ধকার ঘনীভূত হইলেই, কোন সুদূর দেশে চলিয়া যাইব। নিরপরাধ দরিদ্র ব্রাহ্মণ!, আমাকে চিনিয়াছেন ত ? আমাকে আশ্রয় দিয়া, আমার সমস্ত দোষের বোঝা আপনার স্কন্ধে চাপাইয়া লইবেন কেন।

—মন্ত্রীমহাশয়! বলিতে পারি না, আপনার এ-দশা কেন ? আহা! মুখে-চোখে কালী পড়িয়াছে, দারুণ দুশ্চিন্তায় শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দয়া করিয়া কুটীরে আসুন এবং আতিথ্য স্বীকার করিয়া দীন ব্রাহ্মণকে কৃতার্থ করুন।

—দেখুন, মানুষের এই শোচনীয় পরিণাম। পদ-গৌরবে কেন মানুষ অন্ধ হয়, কেন আত্মবিস্মৃত হয় ? হায়! কে আমি! কাল যার হস্তে সমগ্র বরেন্দ্রভূমির শুভাশুভ অর্পিত ছিল, আজ সে পথের ভিখারী— প্রাণভয়ে, মানভয়ে, কুক্কুরের মত পলায়িত! অদৃষ্টের কি নির্ম্মম

অভিশাপ! সংসারে যার আশ্রয়স্থান নাই,—পুত্র কলত্র লইয়া মায়ার বন্ধন নাই—সমস্ত জীবনের সুখ, সমস্ত জীবনের আশা করতোয়ার অতল জলে নিক্ষেপ করিয়া মহাস্থানের মঙ্গলে যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, মহারাজের প্রীতিভাজন সেই পুণ্ডরীক ধনলোভী—বিশ্বাসঘাতক। দিকে দিকে জনস্রোত সেই ঘোষণাই করিতেছে। এই পুরস্কার, ঠাকুর। সমস্ত জীবন শ্রম করিয়া এই খ্যাতি অর্জন করিলাম।

—আমিও আজ ভিক্ষায় গিয়া সেই কথাই শুনিলাম। আমার তখনই মনে হইল এ-কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দেবতার মত স্বভাব আপনার, আপনি রাজকোষাগার হইতে ধনরত্ন চুরি করিবেন এ কথা কি বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়?

—অসংখ্য প্রহরীবেষ্টিত রাজ-কোষাগার। আমার বিনাসুমতিতে একটা মক্ষিকারও তথায় প্রবেশাধিকার নাই। চাবি যে আমারই হাতে। কোন্ যাদুকর মায়ামন্ত্রে আমার সেই সযত্নরক্ষিত চাবি হস্তগত করিল! চিহ্নলন নাই—তবে কি তার চাতুর্য্য এখনও সমভাবে গড়মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতেছে! আমার উপর কার এ তীব্র প্রতিহিংসা? রাজকার্য্যের শত অনুরোধেও আমি বিবেক-বুদ্ধি পরিত্যাগ করি নাই; কখন ভ্রমেও কাহারও অনিষ্ট করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সহস্র সহস্র শত্রু একদিকে, আর রাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী একা আমি;—রক্ষা করিতে পারিব কেন? এখন ধরিতে পারিলে রাজা আমার প্রাণদণ্ড না করিতে পারেন, কিন্তু অন্ধকারময় কারাগৃহে এ-জীবনের পরিসমাপ্তি হইবে।

পুণ্ডরীকের দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু বিগলিত হইল।

রঘুপতি ব্যথিত চিত্তে কহিলেন—বিচলিত হইবেন না মন্ত্রী মহাশয়! সমস্তই শ্রীহরির ইচ্ছা। মানুষ অবস্থার দাস। এ-সংসারে মানুষের গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। ধন, ঐশ্বর্য্য কিছুই চিরস্থায়ী নয়।

এই আছে, এই নাই। কালের বিচিত্র গতি। রাজার গৌরবময় রাজমুকুট, ভিখারীর ভিক্ষার ঝুলি, উভয়ই সমান। কিন্তু মানুষ ত তাহা বোঝে না। তাই দুঃখের পসরা মাথায় লইয়া সংসারে বিচরণ করে। আসুন, আর বিলম্ব করিবেন না। দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল।

রঘুপতির এইরূপ সহানুভূতিপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া পুণ্ডরীক কহিলেন—আমি যে চতুর্দ্দিকে বিপজ্জালে জড়িত, তাই মনে ভয় হয়, শেষে আমার জন্য যদি আপনারা বিপদাপন্ন হন্।

রঘুপতি কহিলেন—কিসের বিপদ মন্ত্রীমহাশয়! বিপদ-হারী মধুসূদনই বিপন্নের একমাত্র আশ্রয়। আমার প্রাণ থাকিতে কেহ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না।

পুণ্ডরীক কহিলেন—আপনি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, কি সাহসে এমন কথা বলিতেছেন?

রঘুপতি কহিলেন—মহাত্মন্! দরিদ্রের একমাত্র বল হৃদয়। যার হৃদয় আছে তার সবই আছে! আসুন, আমি আপনাকে আশ্রয় দিব।

রঘুপতি ঠাকুর মহাস্থান-রাজমন্ত্রীর হস্তধারণ করিয়া কুটীরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার ভোজনের স্থান করিয়া দিলেন। পুণ্ডরীক হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার আহার অর্দ্ধসমাপ্ত হইয়াছে—এমন সময়ে বহির্দ্দেশ হইতে কে ডাকিল—ঠাকুর মহাশয়! বাড়ী আছেন?

রঘুপতি ব্যজনী লইয়া অতিথির অঙ্গে ব্যজন করিতেছেন। ডাক শুনিয়া চমকিত হইলেন। এ কার কণ্ঠস্বর! তবে কি রাজপুরুষগণ পলায়িত মন্ত্রীকে ধরিতে আসিয়াছে? রঘুপতি কহিলেন—আপনি নিশ্চিন্ত মনে আহার করুন, আমি বাহিরে যাইতেছি। শ্যামলী!

তুমি এঁর কাছে থাক। ইনি বড় বিপন্ন—আমি ইঁহাকে আশ্রয় দিয়াছি।

শ্যামলা দেবী দূর হইতে উভয়ের বাক্যালাপ শুনিয়াছিলেন। স্বামীর কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া ইঙ্গিতে মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। রঘুপতি নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গেলেন।

রঘুপতি দেখিলেন, কয়েকজন সশস্ত্র যোদ্ধৃ-পুরুষ বহিঃপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান। রঘুপতি বিস্মিত হইলেন। কিন্তু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন না। নম্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আপনারা?

একজন অগ্রবর্ত্তী হইয়া সহাস্য বদনে কহিল—আকার দেখিয়া বুঝিতে পারেন নাই?

রঘুপতি কহিলেন—বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, তোমরা রাজপুরুষ। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের কুটীরে এইরূপ অসময়ে আগমন, একটু আশ্চর্য্যজনক বৈ কি?

অগ্রবর্ত্তী সৈনিকবেশধারী পুরুষ মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন—ঠাকুর! আপনার মত দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে একজন রাজকীয় অপরাধীকে আশ্রয় দান করা ততোধিক আশ্চর্য্য। কেমন? নয় কি?

রঘুপতি দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—আমি রাজকীয় অপরাধীকে আশ্রয় দান করি নাই। হিন্দুর প্রধান কর্ত্তব্য অতিথি-সেবা। আমি শুধু আতিথ্য-ধর্ম্ম পালন করিয়াছি।

—আমি জানি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মিথ্যা কথা বলিতে জানে না। ঠাকুর রঘুপতি কি আমাদের নিকট সত্য গোপন করিবেন?

—না, আমি যাহা জানি তাহা গোপন করিব না। আমার নিকট আপনার এমন কি জিজ্ঞাস্য বিষয় আছে, বুঝিতে পারিতেছি না।

—আমার সন্দেহ হইতেছে, বুঝি আপনি মনোভাব গোপন করিবেন।

—কেন?

—সে-কথায় এখন প্রয়োজন নাই। অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন্।

—বলুন।

—আপনি কিয়ৎকাল পূর্ব্বে কুটীর মধ্যে কাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন? এখন আপনার কুটীরে আপনার স্ত্রী ভিন্ন অপর কোনও ব্যক্তি অবস্থান করিতেছে কি না?

—এ-কথা জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্য? আপনি কাহার অনুসন্ধান করিতেছেন?

—চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী মহাস্থান-রাজমন্ত্রীর।

—মিথ্যা কথা। মহাত্মা পুণ্ডরীক চোর এ-কথা যে বলিবে তাহার জিহ্বা কলুষিত হইবে। এই বরেন্দ্রভূমিতে তেমন সরলপ্রাণ সহৃদয় ব্যক্তি আর আছে কি না সন্দেহ।

—আপনি তাঁহাকে জানেন?

—মহাস্থান-রাজমন্ত্রীকে না চেনে কে?

—আপনার সহিত বাক্যালাপ করিয়া বুঝিতেছি, যে সন্দেহ করিয়া আমরা এখানে আসিয়াছি, সে-সন্দেহ অমূলক নয়।

—কিসের সন্দেহ?

—আপনার মত ব্যক্তিই লুক্কায়িত রাজমন্ত্রীর আশ্রয়দাতা।

—দিলেই বা ক্ষতি কি?

—রাজকীয় অপরাধীকে আশ্রয় দিলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। যাহা হউক আমাদের সন্দেহ হইয়াছে, আমরা আপনার কুটীর পর্য্যবেক্ষণ করিব। আপনার তাহাতে আপত্তি আছে কি?

—আপনি কে?

—আমি মহাস্থান সেনার-অধিনায়ক—নাম মীর্জ্জা মোরাদ।

রঘুপতি ঠাকুর সসম্মানে সেলাম করিয়া কহিলেন—পূর্ব্বে বলেন নাই কেন? আমি সাধারণ রাজ-অনুচর বিবেচনায় আপনার সহিত বাক্যালাপ:

করিয়াছি। আপনার ন্যায়বিচারে, গুণগ্রামে মহাস্থানবাসী সকলেই সন্তুষ্ট. আপনাকে কুটীর মধ্যে যাইতে দিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু—

—বুঝিয়াছি, আপনি ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, আমার সুবিশ্বাসী সহকারী রামরাজা আপনার কুটীর অনুসন্ধান করিবে। কুটীর মধ্যে মা ঠাকুরাণী আছেন, তাঁহাকে সরিয়া যাইতে বলুন।

—আপনি রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা—পিতা। আমরা প্রজা, পুত্রতুল্য; অতএব আপনি প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত যাইতে পারেন।

রঘুপতি অগ্রে, তৎপশ্চাতে সেনাপতি সদলবলে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। শ্যামলী রাজপুরুষগণকে দেখিয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ-করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন।

মোরাদ ডাকিলেন—মা! আমি এই রাজ্যের সেনাপতি! রাজ-কার্য্যের অনুরোধে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। আমার সঙ্গে কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিবেন না—আমি আপনার সন্তান।

শ্যামলী ভিতর হইতে উত্তর দিলেন—বলুন।

—মা! মহাস্থান-রাজমন্ত্রী কি অদ্য আপনার কুটীরে অতিথি হইয়াছেন?

—আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করুন।

—বুঝিয়াছি, মা! ঠাকুর মহাশয়! মন্ত্রী কি আপনার কুটীরে অতিথি হইয়াছিলেন?

—হাঁ।

—এতক্ষণ বলেন নাই কেন? কোথায় তিনি?

—কেমন করিয়া জানিব, তিনি এখন কোথায়। আমার আতিথ্য স্বীকার করিয়া তিনি আমার বাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

—আমাদের তাহা বিশ্বাস হইতেছে না। আমাদের মনে হয় মন্ত্রী আপনার গৃহ মধ্যেই আছেন।

—না।

—উত্তম। আমি গৃহ অনুসন্ধান করিতে চাই।

—বেশ। শ্যামলী! গৃহ হইতে বহির্গত হও।

শ্যামলী দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন। সেনাপতির অনুমতি ক্রমে রামরাজা ও আরও কয়েকজন অনুচর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। রামরাজা তন্ন তন্ন করিয়া গৃহ অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল—না, এ গৃহে কেহই নাই।

মীর্জ্জা মোরাদ রঘুপতিকে কহিলেন—দেখুন ঠাকুর! আপনি বড়ই অন্যায় কার্য্য করিতেছেন। মন্ত্রী পুণ্ডরীক চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী, একথা সর্ব্বৈব মিথ্যা, আমারও সম্পূর্ণ বিশ্বাস। মহারাজও তাঁহাকে দোষী বলিয়া মনে করেন না। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। তাঁহাকে বাহির করিয়া দিন্।

রঘুপতি কহিলেন—আমি মিথ্যা বলিতেছি না। মন্ত্রী এতক্ষণে বোধ হয় গড় মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

মোরাদ কহিলেন—ঠাকুর! আমি কি জানি না, মন্ত্রীর কোনও দোষ নাই। দস্যু ছিল্লন—বিশ্বাসঘাতক রাজকর্ম্মচারিগণ মহাস্থানের অগণিত ধন-রত্ন যাদু-মন্ত্রে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। সকলেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় লজ্জায়, ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কেন রাজধানী ত্যাগ করিলেন। আমরা না থাকিলে শত আততায়ীর হস্ত হইতে মহারাজকে কে রক্ষা করিবে? মানুষ যদি খোদার চক্ষে নির্দ্দোষ হয়, জগৎ দোষী করিয়া তাহার কি করিবে?

রঘুপতি কহিলেন—জনাব! খলের কুটিল কৌশলে কিছুদিন বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় মাত্র।

সেনাপতি কহিলেন—সে কতক্ষণ। খোদার সূক্ষ্ম বিচারে পাপের অন্ধকার ক্ষেত্রের উপর আবার পুণ্যের অমলধবল স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে।

ঠাকুর! বেলা শেষ হইয়া আসিল এখন আমি চলিলাম। আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর ধর্ম্মবুদ্ধি অতি চমৎকার। আমি আপনাদের ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। খোদা আপনাদিগের মঙ্গল করুন। এই বলিয়া মোরাদ শ্যামলীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন— আর মা। যেদিন প্রতিগৃহে তোমার মত পুণ্যবতী জননীর আবির্ভাব দেখিব, সেইদিন এই জীবধাত্রী ধরিত্রী সার্থক বলিয়া মনে করিব। আশীর্ব্বাদ কর মা! আমি যেন মায়ের গৌরব রক্ষা করিয়া খোদার রাজ্যে চলিয়া যাইতে পারি। এই বলিয়া মোরাদ সদলবলে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রঘুপতি হাসিয়া কহিলেন—শ্যামলী! রাজধানীতে দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে। মন্ত্রী কি সত্য সত্যই চলিয়া গিয়াছেন?

শ্যামলী কহিলেন—হাঁ, তিনি আমার নিষেধ শুনিলেন না; আত্মসমর্পণ করিতে একেবারে মহারাজের নিকট গিয়াছেন।

রঘুপতি সজল-নেত্রে যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া কহিলেন :—

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা॥

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

দরবার-গৃহে

কোলাহলমুখরিত গড় মহাস্থানে আর সেরূপ আনন্দভাব নাই। রাজধানীতে একটা বিষাদের স্রোত বহিয়া গিয়াছে। সেনাপতি মীর্জ্জা মোরাদ সেনা সংগ্রহে মনোযোগী হইয়া এক নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন। ভীল, মাল্লাই, ধীবর, সাঁওতাল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্য হইতে সাহসী এবং বলিষ্ঠ লোক বাছিয়া সৈন্যদল-

ভুক্ত করিতে লাগিলেন। এই উপায়ে বহু নূতন সৈন্য সংগৃহীত হইল। বীরাঙ্গনা শীলাদেবী স্বয়ং সৈন্য-চালনার ভার গ্রহণ করিলেন।

খালতার নবীন ভূপতি বিজয় সিংহ যুদ্ধার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া সসৈন্যে রাজধানীতে শুভাগমন করিয়াছেন। মহারাজ পরশুরাম ও সেনাপতি মোরাদ রাজোচিত সম্মানে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। নিমন্ত্রিত সামন্ত রাজগণ সকলেই রাজার সাহায্যার্থ স্ব স্ব সৈন্যবল সহ রাজধানীতে আগমন করিয়াছেন। আসেন নাই, কেবল সামন্তশ্রেষ্ঠ মাধব; তৎপরিবর্তে কুমার হরপালকে পাঠাইয়াছেন। রাজকীয় আদেশ-লিপির প্রত্যুত্তরে রাজার এ-বিপদে তিনি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

অদ্য হাজার-দুয়ারী সভাগৃহে মহাসভার অধিবেশন হইবে। নানাদিগ্‌দেশাগত সামন্ত রাজগণ এবং অমাত্যবর্গের সহিত পরমমাহেশ্বর মহারাজাধিরাজ পরশুরাম সমরসম্বন্ধী পরামর্শ করিবেন।

দরবার-গৃহ যথোপযুক্তরূপে সজ্জিত হইয়াছে। উপরে স্বর্ণ-রৌপ্য-মণিমুক্তাদি খচিত কারুকার্যময় বিচিত্র চন্দ্রাতপ। চতুর্দ্দিকে স্বর্ণ ও রৌপ্য মণ্ডিত বিচিত্র আসনাবলী সারি সারি সজ্জিত। মধ্যভাগে সমুচ্চ রৌপ্যবেদিকার উপর সমুজ্জ্বল হৈমসিংহাসন - তারকারাজির মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্যমান। রাজসিংহাসনের উভয় পার্শ্বে মন্ত্রীর ও সেনাপতির ঈষন্নিম্ন দুই খানি বিচিত্র আসন। গৃহতল বহুমূল্য সুদৃশ্য গালিচায় আবৃত। বেলা দ্বিতীয় ঘটিকার পরে সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

প্রথম ঘটিকা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই নহবত বাজিল। রাজন্যবর্গ এবং রাজ-অমাত্যগণ একে একে দরবার-গৃহে সমাগত হইলেন। সকলেই যে-যাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। দ্বিতীয় ঘটিকা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে দামামা বাজিল, নকীব ফুকারিয়া রাজ-আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া চলিয়া গেল। অতঃপর দেহ-রক্ষিগণপরিবৃত মহারাজ পরশুরাম দরবার গৃহে শুভাগমন করিলেন। অমনি দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়া

সহস্রকণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিল। সভাস্থ সকলেই সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন। মহারাজ সিংহাসনে উপবেশন করিলে, সকলেই আসন গ্রহণ করিলেন। সভাস্থল নীরব; একটী সূচী-পতন-শব্দও শ্রুতিগোচর হয়। সেই গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মহামন্ত্রী পুণ্ডরীক দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন :—

"বরণীয় রাজেন্দ্রবৃন্দ! মাননীয় উচ্চপদস্থ এবং সাধারণ রাজপুরুষগণ, অভিজাতবর্গ এবং বরেন্দ্রভূমির প্রধান-অপ্রধান প্রজা সাধারণ, সকলেই শ্রবণ করুন, মহারাজাধিরাজ কি জন্য অদ্য আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন :—

এতদিন সমগ্র পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের অধীশ্বর মহাস্থানরাজ, আপনাদের সহায়তায়, আপনাদেরই বাহুবলে বরেন্দ্রভূমির গৌরব ও স্বাধীনতারক্ষায় সমর্থ হইয়াছেন। মহাস্থানের গৌরব হিন্দুর জাতীয় গৌরব। ভাই সব! আজ রাজা একা বিপদগ্রস্ত নন্। এ-বিপদ রাজ্যবাসী রাজা, প্রজা, ধনী-নির্ধন সকলেরই সমান। আজ যদি নিজের গৌরব—জাতির গৌরব—স্বাধীনতার গৌরব ভুলিয়া নিজের গৌরবময় উন্নত শির সুলতান সাহের পদতলে লুণ্ঠিত কর, তবে জগতের ইতিহাসে স্বাধীনতার মানচিত্র হইতে বরেন্দ্রভূমির নাম মুছিয়া যাইবে। বীরগণ! আত্মবিরোধে এতদিন হৃদয়-মধ্যে যে দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়াছ, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত কর, শক্তি জাগ্রত কর। বরেন্দ্র-সন্তান! উঠ—দাঁড়াও! ঐ শোন চারিদিকে আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে। সুলতান গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করিতে করিতে বরেন্দ্রভূমির বক্ষের উপর দিয়া সগর্ব্বে পা ফেলিয়া আসিতেছে—পুণ্যভূমি মহাস্থানের সকল গৌরব, সকল স্বাধীনতা হরণ করিতে আসিতেছে। ভাই সব! তোমরা কি আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়াছ? ক্ষত্রিয় বীরগণ! তোমাদের বাহুতে কি বল নাই? জড়তা, অবসাদ কি বরেন্দ্রভূমিকে জরাগ্রস্ত করিয়াছে? আর নিশ্চেষ্ট থাকিয়ো না, দস্যুকে শাস্তি দিতে প্রস্তুত হও। জগৎকে অক্ষরে অক্ষরে বুঝাইয়া দাও—বরেন্দ্র-সন্তান কাপুরুষ নয়, তাহারা স্বীয় ভুজবলে রাজা এবং রাজ্যরক্ষায় সমর্থ।

সুলতান অগণ্য ইস্‌লাম সৈন্য লইয়া আত্রেয়ী পার হইয়া আসিতেছে। হায় বীর! তোমরা তবুও নীরব! আর কি দেখিতেছ, গৌরব-বৈভব সকলি লুণ্ঠিত হয়, সকলি ফুরায়। হায়! এই ঘুম-ঘোর কি ভাঙ্গিবে না?"

শত শত অসি কোষ হইতে ঝন্ ঝন্ শব্দে বহির্গত হইল।

মন্ত্রিবর পুনরায় কহিলেন—"রাজন্যগণ! আপনারা বিংশতি জন একত্র সমবেত হইলে দুর্গা অপেক্ষাও তেজীয়ান্ হইবেন। আপনাদের তেজে শত্রু-সেনা মুহূর্ত্ত-মধ্যেই অনল-মধ্যগত পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হইবে। মৃগেন্দ্র দর্শনে অজকুল যেমন সভয়ে পলায়ন করে, এই বিদ্রোহিগণও আপনাদিগের পরাক্রমে সেইরূপ পলায়ন করিবে। আপনারা যে রাজার সাহায্যার্থ স্ব স্ব বাহিনী সহ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন ইহাতে মহারাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মহারাজ আশা করেন, বরেন্দ্রভূমির যশঃ-গৌরব আপনারাই রক্ষা করিবেন। অতএব সকলেই পরস্পর গৃহ-বিবাদ ভুলিয়া মহাস্থানের জন্য আত্মদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হউন, ইহাই মহারাজাধিরাজের একমাত্র কামনা।"

এইরূপ সুদীর্ঘ বক্তৃতা সমাপনান্তে মন্ত্রী উপবিষ্ট হইলেন। তখন সামন্ত নৃপতিগণের মধ্য হইতে বৃদ্ধ রাজা রাঘবেন্দ্র দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন— পরম মাননীয় পরম মাহেশ্বর মহারাজ! গত সকল সমরেই আমরা মহারাজকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া আসিয়াছি। বর্ত্তমান যুদ্ধ তদপেক্ষাও ভীষণ। একবার দুর্দ্দান্ত মাহ্‌মুদের আক্রমণে সমগ্র হিন্দুরাজ্যের অঙ্গে যে-আঘাত লাগিয়াছে, সে-ক্ষত অদ্যাপি শুষ্ক হয় নাই। তার পর তার সেনাপতি মসাউদ গাজীর প্রভাবে দলে দলে মুসলমান হিন্দুরাজ্যে প্রবেশ করিতেছে। সকল হিন্দুরাজ্যেই হিন্দুঅধিবাসীর ধন-প্রাণ আর নিরাপদ নয়। কিন্তু আত্মবিবাদপরায়ণ হিন্দুরাজগণ সেদিকে দৃষ্টিহীন। গৃহ-বিবাদে আত্মশক্তির অপচয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। অপরের উপরি প্রভুত্ব বিস্তারের

প্রলোভনে আত্মহারা হইয়া বরেন্দ্রভূমির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। আমরা মহাস্থানের গৌরবরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াই আসিয়াছি। কিন্তু মহারাজ! জীবন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যৌবনের সেই রুদ্র তেজ স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে—এমন সময়ে এই শিথিলমুষ্টি অবসাদগ্রস্ত বৃদ্ধ আমি অপ্রতিহত মোস্‌লেম শক্তি প্রতিহত করিতে পারিবে কি?

সেনাপতি মোরাদ দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন—ছি! ছি! হিন্দুর মুখে এই কথা! রাজন্! আপনি বৃদ্ধ, শারীরিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কি আত্মবিশ্বাসও হারাইয়াছেন! কে বলিল শত্রু অজেয়?

রাজা রাঘব লজ্জিতভাবে কহিলেন—আমি সে-কথা বলিতেছি না। কিন্তু হিন্দুর কার্য্য দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হয়। যে হিন্দুজাতি একদিন আসমুদ্র-হিমাচল আপনার করতলগত করিয়াছিল, আজ তার সমুন্নত গৌরব-কিরীট আপনা হইতে খসিয়া যাইতেছে কেন? হিন্দু স্বাধীনতা-রক্ষায় বদ্ধপরিকর হয় না কেন? হিন্দুর জীবনে উদ্দীপনা নাই; গৌরব রক্ষার্থ হিন্দুর প্রাণে উৎসাহের শতধারা বয় না কেন? দেখুন, সিংহ বৃদ্ধ হইলেও পূর্ব্বের সাহস, বিক্রম একেবারে হারায় না। উষ্ণশোণিত-প্রবাহ দেখিলে বীর-হৃদয় আপনা হইতে নাচিয়া উঠে। জগতে বাক্য-বীর অনেক দেখা যায়, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃত বীরের সম্পূর্ণ অভাব। কে আছ বরেন্দ্র-সন্তান! কে আছ বীর! স্ব স্ব অসি স্পর্শ করিয়া শপথ কর, জীবন থাকিতে কেহ সমর-ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে না।

সকলেই কোষমুক্ত অসি স্পর্শ করিয়া শপথ করিল।

খাল্‌তাপতি বিজয় দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন—শোন বীরগণ! আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি, সামান্য সম্বল যাহা কিছু আছে, মহাস্থানের মঙ্গলার্থ, মা খাল্‌তেশ্বরীর নামে মহারাজাধিরাজের পদে অর্পণ করিলাম। আর ধমণীর শেষ রক্ত সঞ্চালন পর্য্যন্ত শত্রু-সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিব, এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

তার পর প্রথামত সমাগত রাজন্যবৃন্দ, সৈনিক পুরুষগণ যথারীতি প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। রাজ্যবাসী আপামর সাধারণ সকলেই সমর-সাহায্য-স্বরূপ উপঢৌকন রাজাধিরাজের সিংহাসনতলে রক্ষা করিলেন। মহারাজ পরশুরাম পদ-মর্য্যাদা অনুসারে কর-গ্রহণ করিয়া সকলকে সম্মানিত করিলেন। সৈনিকগণ এক একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইল। অতঃপর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। মহারাজ বৃদ্ধরাজা রাঘবেন্দ্রকে কহিলেন—এ-রাজ্যে আর বিচক্ষণ বহুদর্শী কেহই নাই। বৃদ্ধ বলিতে রাঘব আর আমি; নানা চিন্তাভারে আমি প্রপীড়িত। রাঘব। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তুমিই স্থির কর। আমি মহাপ্রাণ মীর্জ্জা মোরাদকে সেনানায়কের পদে বরণ করিয়াছি।

রাঘবেন্দ্র কহিলেন—মহারাজ! এই বরেন্দ্রভূমিতে বিজয় সিংহ আর মীর্জ্জা মোরাদের নাম কে না জানে? বয়সে প্রবীণ না হইলেও মোরাদ অদ্বিতীয় শক্তিশালী ও সমরবিদ্যায় বিচক্ষণ। ঐ বীরবাহুর পরিচয় অনেকেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। যাহারা বীর, তাহারা কাপুরুষের অধীনে কার্য্য করিতে চাহে না, বীরপুরুষকে সাদরে মস্তকে ধারণ করে। আমি আশা করি, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই মহারাজের এ-প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিবেন।

সকলেই এ-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মহারাজ কহিলেন - বৎস মোরাদ! আজ সমগ্র বরেন্দ্রভূমি তোমাকে সেনানায়কের পদে অভিষিক্ত করিল।

মোরাদ কহিলেন—মহারাজাধিরাজ! সমাগত মাননীয় রাজন্যবৃন্দ এবং জনসাধারণ! সকলেই আমার সেলাম গ্রহণ করুন। আশীর্ব্বাদ করুন, খোদার মর্জ্জিতে আমি যেন স্বপদের গৌরব রক্ষা করিয়া তাঁহার রাজ্যে চলিয়া যাইতে পারি।

রাজা পরশুরাম কহিলেন—সেনাপতি! তুমিই স্থির কর, তোমার

অধীন এই বীরগণ কে কোন্ কার্য্যে ব্রতী হইবে—কি প্রণালী অবলম্বন করিলে বিজয়লক্ষ্মী মহাস্থানের করতলগত হইবেন।

মোরাদ কহিলেন—মহারাজ ; আমি সমাগত বীরেন্দ্রগণের পরিচয় সম্যক্ অবগত নহি। রাজা রাঘব আমা অপেক্ষাও অনেক বিচক্ষণ ও বহুদর্শী। তিনিই স্থির করুন কি-ভাবে এই মহাসমর পরিচালিত হইবে। বীরগণ! ভবিষ্যতের এই গৌরবময় সাফল্য তোমাদের বীরত্ব এবং কর্ম্ম দক্ষতার উপরেই নির্ভর করিতেছে।

রাজা রাঘব কহিলে[illegible] [illegible]র্জা সাহেব! এই হিন্দুজাতি স্বর্গ-সুখের আশায় সম্মুখ সমরেই মরিতে চায়। সে-মৃত্যু পাইলে তাহারা বিজয় লাভকেও তুচ্ছ করে। কিন্তু আমার ধারণা অন্যরূপ। আমি বিবেচনা করি, শত্রু-সৈন্যের আগমনে বাধা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। করতোয়ার সুনীল বারিরাশি শত্রু-শোণিতে রঞ্জিত করাই আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা।

রাজা মহেন্দ্র পাল রাঘবেন্দ্রের বাক্য সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া কহিলেন, হাঁ, এ অতি সৎপরামর্শ। পরিখাবেষ্টিত গড়। লোভে এইখানে আসিয়া পড়িলে সুলতান ও ইব্রাহিম পিঞ্জরমধ্যস্থ ব্যাঘ্রের দশা প্রাপ্ত হইবে।

সেনাপতি কহিলেন এ পরামর্শ মন্দ নয়, তবে যদি কেহ বিশ্বাস-ঘাতকতা না করে।

রাজা রাঘব বলিলেন—সে কি? মহাস্থান-রাজপুরীতে এখনও বিশ্বাসঘাতক আছে নাকি?

এ বঙ্গদেশে বিশ্বাসঘাতকের অসদ্ভাব নাই, রাজন্! সে-কথা যাক্, আপনার পরামর্শ মন্দ নয়। এখন সেনা-সংস্থাপনের ব্যবস্থা করুন।

—প্রসিদ্ধ তোরণ তাম্রদ্বাররক্ষার্থ কে নিযুক্ত হইবে?

—তোরণ দ্বারে আপনি থাকিলেই যেন ভাল হয়।

—এই বৃদ্ধকে তোরণ রক্ষায় নিযুক্ত করিবে?

—বৃদ্ধের বাহুতে পূর্ব্বের সেই সিংহবিক্রম এখনও অটুট বলিয়া আমার বিশ্বাস, তাই তাঁহাকে তোরণ রক্ষায় নিযুক্ত করিতেছি।

—আচ্ছা, আমি এ-দিকের ভার গ্রহণ করিলাম। তার পর স্বর্ণদ্বার ?

—বারাণসীখালের বাঁধ আগ্‌লাইয়া আমি সসৈন্যে স্বয়ং ঐদিকে অবস্থান করিব।

—কেন ? সেনাপতি কি অগ্রগমন করিবেন না ?

—না, আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়াই এই দিক রক্ষার ভার গ্রহণ করিতেছি।

—উত্তম, শত্রু-সেনার সম্মুখীন হইবে কে ?

—বিজয় সিংহ তাঁহার নবগঠিত সৈন্যদল লইয়া অগ্রগমন করিবেন। সমগ্র মহাস্থানসেনা কয়েক দলে বিভক্ত হইবে এবং গড়ের চতুর্দ্দিক্ ঘেরিয়া অবস্থান করিবে। সমাগত রাজন্যগণ স্ব স্ব বাহিনী লইয়া দলে দলে বিজয় সিংহের পার্শ্ব রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইবেন।

মহারাজ কহিলেন—বৎস মোরাদ! অতঃ পরামর্শের শেষ কর, কেন না শত্রু অদূরে।

মোরাদ কহিলেন—খোদার ইচ্ছায় অদ্যই আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইব। কুমার হরপাল ও রাজা মহেন্দ্র সসৈন্যে গড়ের মধ্যভাগে অবস্থান করিবেন।

বিজয় সিংহ কহিলেন—মহাস্থান সেনাপতি! শত্রুসেনা এখন কোথায় ?

মোরাদ কহিলেন—সাঁতাহারের প্রান্তরে সুলতান শিবির সংস্থাপন করিয়াছে।

বিজয় সিংহ বীরদর্পে কহিলেন—আমরাও প্রস্তুত হইতেছি। বরেন্দ্র বিজয়াশায় উন্মত্ত সুলতান, মহাস্থান ভূমিতেই উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিবে। করতোয়ার অগাধ বারিরাশিই তার শেষ কবর স্থির করিয়া রাখিলাম।

সমস্ত পরামর্শ স্থির হইল। বরেন্দ্রকুল-তিলক মহারাজাধিরাজ পরশুরাম কহিলেন—বীরগণ! এতদিন যে যুদ্ধ করিয়াছ, তাহা আত্ম-কলহেরই নামান্তর। সেই গৃহবিবাদে আমাদের সকলেরই সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়াছে। এইবার প্রকৃত যুদ্ধ। এই যুদ্ধক্ষেত্রে বরেন্দ্র-সন্তান-গণের ভাগ্যপরীক্ষা। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে ইতিহাসে তোমাদের গৌরব-গাথা স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন আলিখিত থাকিবে। সম্মুখ সমরে মৃত্যু হইলে অক্ষয় স্বর্গ। অগণ্য সেনা সঙ্গে লইয়া সুলতান বরেন্দ্রভূমির বক্ষে সগর্ব্বে পা ফেলিয়া আসিতেছে। বরেন্দ্র সন্তান! আর একবার বীরত্ব দেখাও। তোমার শৈশবের ক্রীড়াভূমি—যার ধূলি তোমার অক্ষয় স্বর্গ, যার শস্য তোমার বক্ষের বল—তোমরা সেই স্বর্ণভূমি বরেন্দ্রভূমিকে রক্ষা কর। ইহার জন্য মৃত্যুকে ভয় করিয়ো না। মৃত্যু মরণের পরেও নূতন জীবন আনয়ন করিবে; কিন্তু গৌরব ফিরিবে না। তোমরা পবিত্র মাতৃস্বরূপিণী বরেন্দ্রভূমির গৌরব রক্ষা কর। যুদ্ধে মৃত্যু, মৃত্যু নয়—বীরের গৌরবময় বিশ্রাম। এস ভাই! এক সুরে সুর মিলাইয়া, জীবন-বীণায় এক মহা ঝঙ্কার উঠাও। অলসতা পরিত্যাগ কর, শত্রুর কর্ণকুহর প্রতিধ্বনিত করিয়া গাও—জয় বরেন্দ্রভূমির জয়!!

মহারাজ পরশুরাম এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা সমাপনান্তে গাত্রোত্থান করিলেন। অমনি সাগর-কল্লোলের মত সহস্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল।

"জয়-বরেন্দ্রভূমির জয়,"

"জয় ধর্ম্মরাজ পরশুরাম কি জয়।"

মহারাজ সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। সকলেই ক্রমে ক্রমে দরবার-গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

শীলাদেবী

দ্বিতীয় খণ্ড

শীলাদেবী

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

লুণ্ঠন

আত্রেয়ী নদীর পূর্ব্বতীরে অগণিত ইস্লাম-সেনা শিবির সংস্থাপন করিয়াছে। এই অগণ্য সৈন্যদল সহ, সাহ সুলতান ও বল্খের যুবরাজ ইব্রাহিম আদ্‌হাম দক্ষিণাঞ্চলবাসী হিন্দু অধিবাসিগণকে মথিত ও নিষ্পেষিত করিতে করিতে বরেন্দ্রভূমির বক্ষের উপর আসিয়া পড়িয়াছেন।

আত্রেয়ী-তীরে জয়নগর গ্রাম। এই গ্রামে নানাজাতীয় হিন্দু অধিবাসীর বাস। জয়নগর গ্রামের সকলেরই উন্নত অবস্থা, সকলেই ব্যবসায়ী। এই গ্রামে তৈলিক এবং বণিক্ জাতির সংখ্যাই অধিক। পরমানন্দ রায় নামে জনৈক অসিজীবী ব্রাহ্মণ কয়েকখানি গ্রামের ভূম্যধিকারী। পরমানন্দ মহাস্থান-রাজ পরশুরামের বাল্যবন্ধু; সেই সূত্রে তিনি কয়েকখানি গ্রাম নিষ্কর স্বরূপ ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। জয়নগর গ্রামে তিনি স্থায়ী বাসস্থান অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। শারীরিক শক্তির জন্য সমগ্র বরেন্দ্রভূমিতে তাঁহার খ্যাতি ছিল। এজন্য এ-প্রদেশের প্রায় সকলেই তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিয়া চলিত। তাঁহার দুই পুত্র; উভয়েই অসিবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। জ্যেষ্ঠ ভীম মগধরাজ

হেমন্তসেনের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ; তিনি মগধেই অবস্থান করেন। কনিষ্ঠ জয়ানন্দ বাড়ীতে থাকিয়া বিষয়কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করেন। পরমানন্দ গৃহে নাই—তিনি তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছেন। পুত্র জয়ানন্দ সম্প্রতি একাকী বাড়ীতে আছেন।

জয়ানন্দ প্রাতঃকৃত্য ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে চণ্ডীমণ্ডপের আঙ্গিনায় কুশাসনে উপবেশন করিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে পশ্চিম পাড়ার তাঁহার পুরাতন প্রজা হরি পোদ্দার ও গোকুল মালী ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইল।

জয়ানন্দ কহিলেন—কে মালী মশায়! হরি দাদা! তোমরা এত সকালে যে?

হরি পোদ্দার কহিল—না আসিয়া কি করি, দাদাঠাকুর! দায়ে না ঠেকিলে আর তোমার পায়ের তলায় আশ্রয় লইতে কে আসে বল?

জয়ানন্দ কহিলেন—ভোর বেলায় আবার তোমাদের কি হইল?

হরি পোদ্দার কহিল—কি আর হবে দাদাঠাকুর। যা হবার নয়, তাই হইতে বসিয়াছে। কোথাকার ধানভানুনীর ছেলে সুলতান সাহেব হইয়া আসিয়াছে; তাহার অত্যাচারে গ্রামে টেঁকা দায় হইল। ঝি-বৌ আর জল আনিতে ঘরের বাহির হইতে পারে না। কোন্ এক ব্যাটা বামুন মুসলমান হইয়াছে, সেই ব্যাটা মহম্মদ খাঁ ঠিক দুষ্মনের মত চেহারা, যেখানে যাহাকে পায় অমান বেদম মার্! রক্ষা কর, দাদাঠাকুর! তুমি যদি না দেখ, আমাদের দেশ-ছাড়া হইতে হয়। গাঁয়ের লোক সব পোঁটলা বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। এ হইল কি? সোনার জয় সহর যে খাঁ খাঁ করিতেছে, দাদা ঠাকুর!

গোকুল মালী কহিল—শুধু তাই কি শুনিয়াছ, পোদ্দার মশায়। ও-পাড়ার রঘুর ছেলের বৌকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। আর শুনিতেছি, গ্রামের ঘরে ঘরে আগুন দিয়া পোড়াইয়া মারিবে।

জয়ানন্দ কহিলেন- হরিদা ! আমি একা—তাহারা অসংখ্য । আমি একা কি করিব, কেমন করিয়া রক্ষা করিব ?

হরি পোদ্দার কহিল না পার, আমাদের বিদায় দাও । এত নির্যাতন আর সহ্য করিতে পারি না। দেশের মায়া করিয়া আর কি করিব, দাদাঠাকুর ! দেশে থাকিলে কাহারও মান-ইজ্জত থাকিবে না । তোমাকেই বা আর কি বলিব । তবে যদি হুকুম কর আমরা তোমার হুকুমে মরিতে পারি ।

জয়ানন্দ কহিলেন—হরিদা ! মরিতে পার ? মরিতে শিখিয়াছ ? তবে এস ভাই । সকলে মিলিয়া একবার প্রাণপণে চেষ্টা করি । যে-মাটিতে জন্মিয়াছি সেই জয়সহরের মাটির মানরক্ষা করিয়া যেন মরিতে পারি। তোমরা জান না, আমি রঘুর বৌয়ের জন্য সুলতানের আস্তানায় গিয়াছিলাম । সুলতান নাই ; সে সদাশয়ী ফকির, তাহার প্রাণে দয়া আছে —কিন্তু তাহার অনুপস্থিতিতে ফকিরের আস্তানা এখন একটা পিশাচের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত , পৈশাচিক বীভৎস আমোদে আস্তানা কলুষিত, পিশাচ মহম্মদ—না, আর বলিতে পারি না, হরিদা ! রঘুর বৌকে—

জয়ানন্দ আর বলিতে পারিলেন না ; আকুল আবেগে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন । এমন সময় হরি পোদ্দার পূর্ব দিকে আগুনের ঝলক দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল দাদাঠাকুর ! দাদাঠাকুর ! ঐ দেখ দাদাঠাকুর ! ও-পাড়ায় আগুন লাগিয়াছে, আর বিলম্ব করিতে পারি না ; আমরা চলিলাম—তুমি আইস । এই বলিয়া হরি পোদ্দার ও গোকুল মালী দ্রুতপদে সেই স্থান ত্যাগ করিল ।

এমন সময়ে এক ষোড়শী দেবী-মূর্ত্তি ত্বরিত পদে জয়ানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—ঠাকুরপো ! তুমি না বীর ! তোমরা না পুরুষ !

জয়ানন্দ কহিলেন—আজ একথা কেন বলিতেছেন বৌদি !

রমণী কহিলেন—আমি সব শুনিয়াছি। তুমি এখনও চুপ করিয়া আছ। প্রজার মান-সম্ভ্রম আর কে রক্ষা করিবে? হায়! হায়! আজ যদি পূজনীয় পিতৃদেব গৃহে থাকিতেন তাহা হইলে তিনি তোমার মত এমন নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতেন না। ঐ দেখ সমস্ত গ্রাম পুড়িয়া ছারখার হইল—তথাপি তুমি ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছ! আমি স্ত্রীলোক—আমারই যে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করিতেছে।

জয়ানন্দ কহিলেন—বৌদি! গ্রামের চারিদিক্ সুলতান সাহের সৈন্যগণ অবরোধ করিয়া আছে। তোমার জন্যই যে আমার বেশী বিপদ্; তোমাকে কার ভরসায় রাখিয়া যাই!

রমণী বজ্রকণ্ঠে কহিলেন—আমার জন্য তুমি বাহির হইতে পারিতেছ না? ছি ঠাকুরপো! জান না আমি কাহার পুত্রবধূ? আমার শ্বশুরের নামে—আমার স্বামীর নামে বাঙ্গালা দেশ থর-থর কাঁপিত। আমি নিজের মান নিজে রাখিতে পারিব না! যখন দেখিব আর নিস্তার নাই—তখন ঐ অন্দরের পুষ্করিণীতে ঝম্প প্রদান করিয়া শ্বশুর-কুলের মুখ রক্ষা করিব। দেবর! অস্ত্র লইয়া নিশ্চিন্তমনে গমন কর। আমি আমার শেষ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া বসিয়া আছি। এই বলিয়া সেই দেবী-মূর্ত্তি ত্বরিতপদে গৃহ-মধ্য হইতে তীক্ষ্ণধার অসি বাহির করিয়া কহিলেন—লও ভাই! তোমার দাদার অসিখানি লও—তাঁহার নাম রক্ষা কর।

জয়ানন্দ আর কিছু বলিতে না পারিয়া সম্ভ্রমের সহিত সেই দেবী-প্রতিমার চরণ-ধূলি লইয়া দেবীপ্রদত্ত অসি হস্তে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন।

জয়ানন্দ চলিয়া গেলে রমণী বক্ষভরা উদ্বেগ লইয়া একদৃষ্টে সেই অগ্নি-রাশির দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে সহসা কাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন! কে যেন ডাকিল—দিদিমণি!

পান চিবাইতে চিবাইতে রামী নাপ্তিনী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রামীর বয়স চত্বারিংশ অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু সুগোল নিটোল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যৌবনের স্মৃতিচিহ্ন এখনও স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ও-পাড়ায় ঘরে ঘরে আগুন, রামীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই; সে হাসিতে হাসিতে সেই দেবীমূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া ডাকিল—দিদিমণি!

এই পূর্ণাবয়বসম্পন্না যুবতী পরমানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ—নাম নবদুর্গা। শ্বশুর, স্বামী কেহই বাড়ীতে নাই। দেবর জয়ানন্দ বিপন্ন প্রজাগণের রক্ষার্থ এখনই গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। এখন অন্তঃপুরে নবদুর্গা দেবী একাকিনী। নবদুর্গা সান্দগ্ধ ও বিস্মিতভাবে বলিলেন—এ কি লো! তুই এ-সময়ে যে?

রামী নাপ্তিনী কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিল—ও-পাড়ায় আগুন লাগিয়াছে, দিদিমণি!

নবদুর্গা কহিলেন—তাই ত, উপায় কি বোন্! যে অবস্থা, তাহাতে সকলেরই এখন গাঁ ছাড়িয়া পলাইতে হইবে।

রামী কহিল—তোমার কাছে সেই পরামর্শটাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

নবদুর্গা অন্যমনস্কভাবে কহিলেন—কিসের পরামর্শ?

রামী কহিল—ঐ না তুমি কি বলিতেছিলে?

নবদুর্গা কহিলেন—হাঁ, তা দেখ্—তোরা গরীব, মুসলমানে গাঁ ঘিরিয়াছে; এই বেলা কোনও হিন্দুরাজার আশ্রয় লওয়াই সঙ্গত।

রামী নিতান্ত অসহায় ভাবে কহিল—তা, তোমরাও ত রাজা মানুষ।

নবদুর্গা কহিলেন—আমার স্বামী যদি গৃহে থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি একাকী দুইশত লোককে তাড়াইয়া দিতেন। দেবর ছেলে মানুষ, সে কি আর অত লোকের মহড়া লইতে পারিবে। হায়! আগে না বুঝিয়া কেন তাহাকে আগুনের মুখে পাঠাইলাম!

রামী কহিল—ব্যস্ত হও কেন, বৌ-ঠাকৃরুণ? গাঁয়ের সব লোক তার পিছনে, ভয় কি?

নবদুর্গা কহিলেন—রামা! ঐ শোন্, স্ত্রীলোকের ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ। আর বুঝি পরিত্রাণ নাই।

নেপথ্যের দিক্ হইতে ভয়ানক চীৎকার-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। দ্বারে ঘন ঘন পদাঘাতের শব্দ হইল। রামী যেন সভয়ে নবদুর্গাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিল। নবদুর্গা সাহসে বুক বাঁধিলেন। সবলে তাহাকে দশ হাত দূরে ঠেলিয়া দিয়া ত্বরিত পদে খিড়কী-দ্বার মুক্ত করিয়া বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। ইত্যবসরে শত শত মুসলমান-সৈন্য মশাল হস্তে বাটীর মধ্যে গমন করিল তাহাদের "আল্লা হো আকবর" রবে কর্ণ-কুহর বধির হইতেছিল। কয়েকজন সৈন্য রামীকে ধরিতে গেল। সে বলিল, আমায় ধোরোনা, বাবা! আমার আর কেউ নাই, বাবা! এই বাড়ীর দিদিমণি এই পথে পলায়ন করিয়াছে। সৈন্যগণ সেই দিকে গেল। খিড়কীর দ্বার খুলিলেই সন্মুখে অতি গভীর অন্দরের পুষ্করিণী। সৈন্যগণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। দেখিল, কোথাও কেহ নাই। তখন তাহারা রামীর কেশাকর্ষণ করিয়া বাহিরে লইয়া গেল। পরমানন্দ রায়ের সমস্ত গৃহজাত দ্রব্য লুণ্ঠিত হইল। দেবমূর্ত্তি চূর্ণীকৃত হইল। গৃহে গৃহে দাউ দাউ করিয়া অনল জ্বলিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরামর্শ

সারি সারি অসংখ্য বস্ত্রাবাস। সাতাহারের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সুলতান, তাহার নাম সুলতানপুর রাখিয়াছেন এবং তথায় এক বৃহৎ দীর্ঘিকার তীরে সদলবলে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন।

এই সুলতানপুরের শিবিরে এক বৃহৎ পট-মণ্ডপের মধ্যে কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া তিন ব্যক্তি কথোপকথন করিতেছিল। এই তিন ব্যক্তি অপর কেহই নয়। পরাক্রান্ত দরবেশ সাহ সুলতান, যুবরাজ ইব্রাহিম ও সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ খাঁ।

সুলতান মহম্মদকে কহিলেন—এ-সব কি মহম্মদ!

—কি বলিতে চান্?

—দরিদ্র পল্লীবাসিগণের হাহাকারে আমার কর্ণকুহর বধির হইয়া উঠিল—ইহার কারণ কি? আমি সংসারত্যাগী। ধর্মই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। আমি কি দস্যুর মত এই দেশটা লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছি? আমার নামে জনসাধারণের মনে একটা মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছ কেন? আমাকে দেখিলেই লোকে সভয়ে পলায়ন করে, ইহারই বা কারণ কি?

—সুলতান! ইহার কারণ কি, তাই শুনিতে চান? ইহার কারণ হিন্দু-বিদ্বেষ নয়—প্রতিহিংসা! হিন্দুর মিত্রের অবমাননার দারুণ প্রতিশোধ হিন্দুর বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া প্রতিহিংসার নিবৃত্তি করিতেছি।

সুলতান সাহ রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন—মহম্মদ!

—হজরৎ!

—শান্ত হও ভাই! আমি তোমাকে আশ্রয় দিয়াছি—আমার নাম কলঙ্কিত করিয়ো না। খোদার কার্য্য সাধন করিতে আসিয়া রাজ্যময় অশান্তির দাবানল প্রজ্বলিত করিতেছ কেন? খোদার প্রেমের অপূর্ব্ব গৌরবে সমস্ত পৃথিবীতে ইস্লামের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইবে। অকারণে নিরীহ মানবসন্তানের শোণিতে ইস্লাম ধর্ম্ম কলঙ্কিত করিয়ো না।

—আমার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। জনাব! প্রাণে আঘাত করিয়া

পুরাতন ধর্ম্মকে জাগ্রত করিব। হিন্দু তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে! আর নবীন সজীব সচল ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ভুলিয়া, ভাই বলিয়া তাহার সহিত প্রাণের বিনিময় করিবে। বলিতে পার কি হজরৎ! কতযুগ পরে জগতে আবার মানবধর্ম্ম স্থাপিত হইবে?

—মহম্মদ! ভুল বুঝিয়াছ। উৎপীড়নে মিলনের স্রোত রুদ্ধ হয়। যে বিষবীজ বপন করিতেছ, তাহার ফলে মানবজাতির সমস্ত আশা সমূলে বিনষ্ট হইবে।

—হজরৎ! আঘাতের পর আঘাত করিব। শত কুঠারাঘাতে হিন্দুর হৃদয় বিদ্ধ করিব। দেখি সে-মর্ম্মে বেদনা লাগে কি না! জড়দেহে চেতনা ফিরে কি না!

—উন্মাদ! আমার আশা-পাদপের মূলদেশে কুঠারাঘাত করিয়ো না। উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যগণকে সংযত কর। বরেন্দ্র-ভূমির অগণিত ধনরত্নের লোভে ইহারা মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ধন, রত্ন জগতেই বহুমূল্য। খোদার রাজ্যে তাহার মূল্য কিছুই নাই। আমি যে রত্নলাভের আশায় বরেন্দ্র ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছি তাহার মূল্য পৃথিবীতে নাই।

যুবরাজ ইব্রাহিম কহিলেন—হজরৎ! গজনীর সুলতান মাহমুদ সাহ ভবিষ্যৎ ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছেন। আমি সেরূপ করিতে চাহি না। তবে মহাস্থান গড় অধিকার করিতে চাহিতেছি, এই জন্য, মহাস্থান বরেন্দ্র-ভূমির মস্তকস্বরূপ। এই মস্তকে তোমার চিরস্থায়ী আস্তানার প্রতিষ্ঠা করিব—মহারাজ পরশুরামের অতীত গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে তোমার নাম জগতে চিরস্মরণীয় করিব।

সুলতান কহিলেন—মহম্মদ! আমার আদেশে জয়সহরের বন্দী-দিগকে মুক্তি দান কর। অত্যাচার করিয়ো না—সম্মুখসমরে ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কর।

মহম্মদ কহিল—যো হুকুম, জনাব! আপনার আদেশে জয়ানন্দ

রায়কে ও আর আর বন্দীদিগকে এখনি মুক্ত করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া মহম্মদ প্রস্থান করিল।

যুবরাজ কহিলেন—হজরৎ! বেইমানকে বিশ্বাস করিবেন না। জগতে যে ক্রূরকর্ম্মী সয়তান আছে, এখন বুঝিলাম মানবজাতিই সেই সয়তানের জন্মদাতা। এই প্রভুদ্রোহী সয়তান কর্ত্তৃক হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে—বরেন্দ্র-ভূমি স্বাধীনতা হারাইয়া ইস্‌লামের অধীনতা-পাশে বদ্ধ হইবে। এই দুরাত্মা, স্বজাতির গৌরব, বিভব, ইস্‌লামের পদতলে অর্পণ করিতে শরণাগত হইয়াছে। আশা, মহাস্থান-সিংহাসন। বেইমানকে দেখিলে আমার মনে দারুণ ঘৃণার উদ্রেক হয়। সুযোগ পাইলে হতভাগা পিশাচ একদিন আমাদিগেরও সর্ব্বনাশ করিতে পারে। ইহার হৃদয় কি পঙ্কিল! কি কালিমাময়! আমার বোধ হয় মুসলমান ধর্ম্মেও উহার আস্থা নাই।

—ধর্ম্মে বিশ্বাসহীন, স্বার্থই দুরাত্মার একমাত্র মূলমন্ত্র। আমি জানিয়া শুনিয়াও কেবল কার্য্যোদ্ধারের আশায় আশ্রয় দিয়াছি মাত্র। জয়সহরের নিদারুণ অত্যাচারের পর হইতে, কি বলিব যুবরাজ,! পাষণ্ডের মুখ দেখিতেও আমার ইচ্ছা হয় না। তবে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কয়েকটা দিন মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া রাখিব।

—আজ কয়েকজন রাজার সাক্ষাৎ করিতে আসিবার কথা।

—খুব সম্ভব অদ্যই আসিবে। যে তিন জন আসিবে, অদ্যই তাহাদের সঙ্গে আমাকে মাধবপুরে যাইতে হইবে। সামন্ত রাজাদিগের মধ্যে মাধব পালের নামই এতদ্দেশে বিখ্যাত।

—কে কে আসিবে, শুনিয়াছেন কি?

—মাধবপাল-নন্দন হরপাল আসিবে। আর কে কে আসিবে বলিতে পারি না।

উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে মহম্মদ দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইল।

সুলতান কহিলেন—এ কি? এত ব্যস্ত যে?

মহম্মদ কহিল—তাঁহারা আসিয়াছেন।

—যথাযোগ্য অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করিয়াছ ত? আর এ ফকিরের আস্তানা অভ্যর্থনাই বা কি?

—অভ্যর্থনার বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। যে দুইজন আসিয়াছে—তাহারা আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ। শ্যামল তৃণরাজির সুকোমল আসনে তাহাদের অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করিয়াছি।

সুলতান সহাস্যে কহিলেন—অতি উত্তম বন্দোবস্ত। ঐরূপ আসনে হজরৎ নবী তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন।

অতঃপর সকলেই পটমণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া সমাগত রাজন্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে গমন করিলেন।

প্রান্তরের এক প্রান্তে বিস্তীর্ণ তৃণ-ক্ষেত্রের উপর দুইজন যোদ্ধৃ-বেশধারী যুবক উপবেশন করিয়া আছে। সুলতান ও যুবরাজ ইব্রাহিম সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে মহম্মদ তথায় উপস্থিত হইয়াছিল।

যুবকদ্বয় গাত্রোত্থান করিল এবং মুসলমানী কায়দায় সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া তিনবার কুর্ণিস করিল।

যুবরাজ ইব্রাহিম প্রত্যভিবাদন করিয়া কহিলেন—অদ্য সুপ্রভাত। আপনাদের আগমনে এ দীন ফকিরের আস্তানা পবিত্র হইল। আমরা সংসারত্যাগী ফকির, আপনাদিগের সম্যক্ অভ্যর্থনা করিব এরূপ সঙ্গতি নাই।

মহম্মদ হরপালকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—বন্ধু! ইনি যুবরাজ ইব্রাহিম।

হরপাল কহিল—যুবরাজ! আপনার বিনয়গর্ভ বচনে পরিতুষ্ট হইলাম। আপনার গুণগ্রাম এবং বীরত্বকাহিনী শ্রবণ করিয়া উৎপীড়িত নিরীহ

রাজগণ এতদিন আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এতদিনে মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে—এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছি, আমরা দুর্ব্বলপীড়ক নরসিংহের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিব। বরেন্দ্র-ভূমিতে আবার স্বাধীনতার দীপ্ত সূর্য্যের উদয় হইবে।

যুবরাজ ইব্রাহিম গম্ভীর বদনে বলিলেন—আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—এ যে অতি অসম্ভব। আমি বিধর্ম্মী—আর আপনারা হিন্দু—হিন্দু হইয়া হিন্দু-রাজত্বের উচ্ছেদ কামনা করেন?

হরপাল কহিল না জনাব! আমরা হিন্দু নই—বৌদ্ধ। হিন্দু-জাতির চক্ষে আপনারা যেরূপ ঘৃণার পাত্র, আমরাও ঠিক তদ্রূপ। হিন্দুরা সদ্ধর্ম্মিগণকেও বিধর্ম্মী বৌদ্ধ বলিয়া সম্ভাষণ করে—অবজ্ঞার চক্ষে দেখে। আপনার সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করুন, হিন্দুরাজত্বে বৌদ্ধদিগের অবস্থা কিরূপ শোচনীয়। যুবরাজ! বড় দুঃখে, বড় লাঞ্ছনায়—আজ বৌদ্ধ রাজগণ আপনার চরণে শরণাগত। আপনি কি শরণাগতকে আশ্রয় দিয়া বীরধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন না?

ইব্রাহিম কহিলেন—যুবরাজ! আপনি জানেন না—হজরৎ সুলতান সাহকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কি? ধন রত্ন লোষ্ট্রখণ্ডের মত দূরে নিক্ষেপ করিয়া খোদার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। এই নাস্তিকপ্রধান ভূমিতে পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্ম সংস্থাপনই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। খোদার কার্য্য ভিন্ন কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে যাইতে আমার বিশেষ স্পৃহা নাই। তবে আপনাদের ইচ্ছা হইলে আমি আপনাদিগকে সাহায্য করিতে পারি এই মাত্র। হজরৎ! রাজগণের আবেদন শ্রবণ করিয়া আপনিই যাহা হয় উত্তর দান করুন।

সুলতান কহিলেন—রাজন্! গড় মহাস্থান প্রাচীর-পরিখাদি বেষ্টিত। আরও শুনিয়াছি, গড় মানবের দুর্ভেদ্য। তবে যদি আপনারা

সমবেত হইয়া চেষ্টা করেন, আমরা আপনাদের কার্য্যে সহায়তা করিতে পারি। সফলকাম হওয়া-না-হওয়া খোদার ইচ্ছা!

মহম্মদ কহিল—হজরৎ। মহাস্থান গড় সুদৃঢ় প্রাচীর এবং পরিখাবেষ্টিত সত্য, কিন্তু দুর্ভেদ্য নয়। যদিও বহিঃশত্রুর আক্রমণে গড় বিধ্বস্ত হওয়া অসম্ভব, কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি ভিতর হইতে কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আমি অতি অল্পায়াসে গড় অধিকার করিতে পারি।

যুবরাজ কহিলেন—আপনার সাহসেই আমরা এরূপ অসম সাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেছি।

মহম্মদ সহাস্যে বলিল—যুবরাজ। আমার প্রতি নির্ভর করুন। রাজা নরসিংহ সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কি করিবে। আমি যে তাহার পশ্চাতে ধ্বংসের কি বিপুল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি, তাহা ত সে জানে না। আপনি উপলক্ষমাত্র থাকিবেন। যাহা করিতে হয় সমস্ত আমরাই সম্পন্ন করিব। কেবল আপনার নিকট সেনা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কার্য্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল- ব্যয় ভার কে বহন করিবে?

—কেন আমি?

-তুমি? তুমি ত কপর্দ্দকবিহীন

—কে বলে আমি কপর্দ্দকবিহীন বরেন্দ্র-ভূমির অমূল্য রত্নরাশি আমার করতলগত। প্রয়োজন হইলে অর্থের অপ্রতুল হইবে না।

সুলতান সাহ মহম্মদকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—মহম্মদ। ভাই! তোমার বাক্যে বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। জানিয়া রাখ এ-কার্য্য তোমার, তোমার কার্য্য তোমাকেই সম্পন্ন করিতে হইবে।

এইরূপে আরও অনেকক্ষণ কথোপকথন চলিল। বাহুল্য ভয়ে এইখানেই তাহার উপসংহার করিলাম।

গৌরি! গৌরি! 'তুমি গৌর'! না-না-স্বপ্ন! ....১৭১ পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণে

সূর্য্য পাটে বসিয়াছে। দীর্ঘিকার বাঁধা ঘাটের উপর বসিয়া ইস্লাম-সেনাপতি মহম্মদ খাঁ গণ্ডদেশে হস্ত স্থাপন করিয়া ঘোর চিন্তামগ্ন। অকস্মাৎ মস্তকোত্তলন করিয়া চাহিয়া দেখিল, এক অপরিচিত ব্যক্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান। মহম্মদ বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কে? কি প্রয়োজনে আসিয়াছ?

—গুরুতর প্রয়োজনের অনুরোধেই আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।

আকারে, পোষাক পরিচ্ছদে তোমাকে বস্ত্রব্যবসায়ী হিন্দু-সন্তান বলিয়া বোধ হইতেছে। এই ইস্লাম-শিবিরে কোন্ সাহসে আমার নিকটে আসিয়াছ, বালক?

আগন্তুক ব্যক্তি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। মহম্মদ দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল—বল্ কে তুই?

—আমায় চিনিতে পার নাই? আচ্ছা দেখ আমি কে?

আগন্তুক ছদ্ম বেশ পরিত্যাগ করিল। এ কি! গৈরিকবেশধারিণী রমণী-মূর্ত্তি মহম্মদের সম্মুখে আবির্ভূত হইল।

মহম্মদ সে মূর্ত্তি চিনিয়া কহিল—এ কি! এ যে আমাদের সেই কমলা। এত পরিবর্ত্তন! তুমি এখানে কেন?

—দাদা! তুমি ভুল বুঝিয়াছ। আমি কমলা নই, গৌরী—তোমার ভগিনী।

—গৌরি! গৌরি! তুমি গৌরী! না—না স্বপ্ন। আমার

স্নেহময়ী ভগিনী পৃথিবীতে নাই। তুমি নর্ত্তকী কমলা—আমি তোমায় বেশ চিনি।

—কমলা আমার অবস্থার যোগ্য নাম মাত্র। দাদা! আমি তোমার সহোদরা।

—না, তুই গৌরী ন'স্। কলঙ্কিনি, আমার কাছে প্রতারণা? আমার স্নেহের ভগিনী গৌরী জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

—আমি অতি মন্দভাগিনী! লজ্জায় এত কাল তোমার কাছে আত্মপ্রকাশ করি নাই। আমি জানিতাম, তুমি মহাস্থানের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির পদ লাভ করিয়াছ। দিনে দিনে সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে উঠিতেছ; আমি তোমার পদোন্নতিতে মনে মনে কত আনন্দ অনুভব করিতাম। তোমা হইতে সতত দূরে সরিয়া থাকিতাম। তোমার কাছে সত্য পরিচয় দিবার আমার মুখ ছিল না।

—তাহা যদি সত্য হয় তবে কেন জীবনের সায়াহ্নে কালী-মাখা মুখ লইয়া আমার কাছে পরিচয় দিতে আসিয়াছিস্? তোর মৃত্যু হইল না কেন? রাক্ষসী! করতোয়ার গর্ভ হইতে কেন তুই বাঁচিয়া উঠিলি?

—মরণ হ'ল না দাদা! মনে ভাবি, তখনই মরিলাম না কেন? তাহা হইলে সব ফুরাইত—সব জ্বালা জুড়াইত। জানি না, আর কত দিন এই কলঙ্কিত উদ্দেশ্যহীন জীবনের বোঝা বহিয়া বেড়াইব! রমণীর একমাত্র অবলম্বন, স্বামী। যে রমণী স্বামিসেবায় বঞ্চিতা, তাহার জীবন ধারণে কি ফল? কপাল-দোষে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইলাম। স্বামীর সেবা করিয়া আমার নারীজন্ম সার্থক করিতে পারিলাম না।

—গৌরি! প্রাণের ভগিনি! আর তোকে মর্ম্ম-পীড়া দিব না। হতভাগিনি! এ-জগতে কোথাও জুড়াবার স্থান পাস্ নাই। অদৃষ্টের কি নিদারুণ অভিশাপ! যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই—অন্ধ-বিশ্বাসী চিহ্লনের

সম্মুখে এ কি সত্য দেখাইতেছ, জগদীশ! গৌরি! তুই বাঁচিয়া আছিস্? কে তোকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিল?

—কে উদ্ধার করিবে দাদা। দৈব আমার মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। দারুণ দুরদৃষ্ট দৈত্যের মত হুঙ্কার করিয়া যখন আমাদের নৌকাখানি ঘূর্ণীদহের মাঝখানে লইয়া গেল, তখন ঘোর অন্ধকারে আর তোমাকে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। কখন্ যে নৌকা ডুবিল, বুঝিতে পারিলাম না।

—তার পর—তার পর?

—আর কি শুনিবে দাদা! তার পর সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। সংজ্ঞালাভ হইলে দেখিলাম, আমি বহুমূল্য পর্য্যঙ্কে বিচিত্র শয্যায় শয়ন করিয়া আছি। যার অদৃষ্টে সুখ না থাকে তার বুঝি মৃত্যুও হয় না। কে আমাকে উদ্ধার করিল বুঝিতে পারিলাম না। বাল্যকালাবধি কুটীরে বাস করা অভ্যাস, তেমন গগনচুম্বিত সৌধ কখনও দর্শন করি নাই। আমি বিস্মিত ভাবে গৃহের বহুমূল্য আসবাব-পত্র দেখিতে লাগিলাম। সহসা কি দেখিলাম? সে-কথা তোমার কাছে বলিতে লজ্জা করিব না। দেখিলাম, এক দেবমূর্ত্তি আমার শিয়র দেশে বসিয়া নির্ণিমেষ নয়নে আমার মুখের পানে চাহিয়া আছেন। সেই দেবমূর্ত্তি আমার অবিন্যস্ত চুলগুলি তাহার চম্পক-কলিকার মত অঙ্গুলি দিয়া আস্তে আস্তে সরাইয়া দিতেছেন। সেই একদিনের দৃষ্টি আমি আর ভুলিতে পারিলাম না। তাহার যত্নে, তাহার সেবায় অল্প দিনের মধ্যেই বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলাম। তোমার কথা আমার মনে পড়িল। কিন্তু তুমি খুনের দায়ে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছ, ভয়ে কাহাকেও কিছু বলিতে সাহস করিলাম না। তিনি আমায় বড় যত্ন, বড় ভালবাসা দেখাইতে লাগিলেন। মন দিনে দিনে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। একদিন তিনি আমার মুখে শুনিলেন আমি

ব্রাহ্মণ-কুমারী। ইহার কিছুদিন পরেই শুভক্ষণে, শুভলগ্নে আমার বিবাহ হইয়া গেল। তাঁহার সহিত বিবাহে আমি আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিলাম শুনিলাম, তিনি মহাস্থানের মন্ত্রিপুত্র পুণ্ডরীক।

—এঁ্যা, পুণ্ডরীক তোমার স্বামী। মহাস্থানের মন্ত্রী আমার ভগিনীপতি। ভগবান্! আশ্চর্য্য তোমার লীলা। তার পর?

—তার পর, মনে পড়ে কি দাদা! একদিন রাজপথ হইতে পরিচারিকা দ্বারা অন্তঃপুরে আমার শয়ন-কক্ষে তোমাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলাম।

—হাঁ, মনে পড়ে। তখনও তোমাকে দীর্ঘদিনের পরে ভগিনী বলিয়া চিনিতে পারি নাই। আমি মন্ত্রী পুণ্ডরীককে আসিতে দেখিয়া দ্রুত বেগে প্রস্থান করিলাম।

—সেই যাওয়াই আমার কাল হইল। তিনি আমার চরিত্রে সন্দেহ করিলেন এবং কোন কথা না শুনিয়াই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তার পর নৃত্যকলাই আমার জীবনের বৃত্তি হইল। আমি নাম গোপন করিয়া কমলা নামে বিখ্যাত হইলাম। একবার ভাবিলাম, এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাই। কিন্তু চলিয়া গেলে আর তাঁহার দর্শন পাইব না—এজন্য আমার যাওয়া হইল না। আমি মহাস্থান নগরীতেই রহিয়া গেলাম। ঈশ্বর জানেন, স্বামীর চরণ চিন্তা ভিন্ন আমার মনে অন্য চিন্তা নাই। হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আজও আমার মনে পাপ স্পর্শ করে নাই।

চিহ্লন হু-হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মরুভূমিতে সমবেদনার তটিনী ছুটিল। অনুতাপের শত বৃশ্চিক তাহার হৃদয়ে দংশন করিতে লাগিল। চিহ্লন আকুল আবেগে বলিল—গৌরি! প্রাণের ভগিনী আমার! কর্ম্ম-স্রোত আমাদের দুই ভ্রাতা-ভগিনীকে বিপরীত দিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। কালের বিচিত্র গতিতে যদি ফিরিলে তবে আর একটু আগে কেন আসিলে না? তাহা হইলে আজ আমার এ অবস্থা হইত না।

দুরাশায় মত্ত আমি পতঙ্গের মত দগ্ধ হইতে বসিয়াছি। শান্তিলাভের একমাত্র পথ মৃত্যু। এ জীবনের সমস্ত আশা, সমস্ত বাসনা ফুরাইয়া গিয়াছে। আমি মৃত্যুর দ্বারে অতিথি, মৃত্যু আমাকে প্রতিনিয়ত আহ্বান করিতেছে।

--কেন দাদা! এ যাতনা সহ্য করিতেছ? কেন একটা রাজ্যের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছ? তুমি যদি এমন না হইতে, তাহা হইলে কি মহারাজ নরসিংহের পুণ্যরাজত্ব এমন শোচনায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়?

---অদৃষ্টের গতি কে রুদ্ধ করিবে ভগিনী। মরণের মুখ হইতে কেন বাঁচিয়া উঠিলাম? অভাবের কশাঘাতে নিষ্পেষিত যুবককে কে রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ সম্মান দান করিল। আশা আমার কানে কানে মোহন বাঁশরী বাজাইতেছে। মন আরও অত্যধিক উন্নতির প্রয়াসী। তাই রাজ-পক্ষ পরিত্যাগ করিলাম—সুলতানকে বরেন্দ্র-ভূমির সর্ব্বনাশের জন্য আমন্ত্রণ করিয়া আনিলাম। এইবার রাজা নরসিংহের ও আমার অদৃষ্ট-পরীক্ষা।

—কাজ নাই দাদা! ফিরিয়া আইস। কেন অকারণে প্রভুদ্রোহিতা পাপে লিপ্ত হইবে?

—ভগিনি! আমার বোধ হয় সংসারে পাপ-পুণ্যের বিচারকর্ত্তা নাই। পাপ-পুণ্য একটা মনোবিকার—একটা বিলাসিকামাত্র। আমি সম্মুখে অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্র ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না।

—দাদা! নিয়ত পাপে লিপ্ত থাকায় তোমার মস্তিষ্কবিকার ঘটিয়াছে। পাপের পথ আপাত কুসুমাস্তৃত বোধ হইলেও পরিণাম বড়ই ভয়ানক। এই সব কথা শুনিবার জন্যই কি আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম?

—আর আসিয়ো না গৌরি! এই শেষ সাক্ষাৎ। মনে কর, তোমার দাদা মরিয়া গিয়াছে। হয়ত আর কিছুদিন পরে আর এক

মূর্ত্তিতে তোমার দাদাকে দেখিতে পাইবে, তখন বিধর্ম্মী বলিয়া তুমিও ঘৃণা করিবে।

—আর শুনাইয়ো না—আর শুনিতে চাই না। ভুলিয়া যাও! এখনও ফিরিয়া আইস। মহারাজ পরশুরাম এখনও তোমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন—তোমার পদ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

—না গৌরি। আর জীবনের বাকী কয়টা দিন অন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জগতের সকল মানবের চক্ষেই ঘৃণার্হ হইয়া থাকিতে চাহি না। এখন যদি সুলতানের পক্ষ পরিত্যাগ করি, হিন্দু সন্তান আমাকে বিশ্বাস করিবে কেন? শেষে দুকূল হারাইব?

—আমায় বলিয়া দাও—আমার কর্ত্তব্য কি?

—সে-কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? হিন্দু-নারীর কর্ত্তব্য কি তুমি জান না? সাধ্বী! হিন্দুর সব যাইবে—হিন্দুর কীর্ত্তিরাশি প্রস্তর-খণ্ড অথবা ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইবে। কিন্তু হিন্দু-নারীর গৌরব কথা ভবিষ্যৎ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে আলিখিত থাকিবে। হিন্দু নারী! তোমরা হিন্দুজাতিকে কালের চক্ষে অমর করিয়া রাখ। জাগ হিন্দুললনা! পতিব্রতায়, দয়ায়, কর্ত্তব্যে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার কর; সুষুপ্ত হিন্দুসন্তান—যাহাদের মুখ চাহিয়া বৃদ্ধ মহাস্থানরাজ নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন, অঙ্গুলি হেলনে তাহাদিগকে জাগ্রত কর। কর্ম্মক্ষেত্রে অন্ধ হিন্দুজাতিকে পথ দেখাইয়া দাও। কাতারে কাতারে শত্রু-সেনা এই রজনীর গাঢ় অন্ধকারে গা ঢাকিয়া মহাস্থান আক্রমণ করিতে উদ্যত। আমি হিন্দুর বক্ষে করাল ছুরিকা বিদ্ধ করিতে ছুটিয়া যাইতেছি। যাও, যাও ভগিনি। যাও সাধ্বি! হিন্দু-কুলাঙ্গার চিহ্লন হিন্দুর সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য মুসলমানের কাছে আত্মবিক্রয় করিয়াছে। সমস্ত সৈন্য আমার অপেক্ষা করিতেছে। আমি চলিলাম।

চিহ্লন প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে গৌরী তাহার পথরোধ করিয়া

দণ্ডায়মান হইল। পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল—দাদা! এই মহাযুদ্ধের পরে যদি বাঁচিয়া থাক, গোবিন্দ-মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে তুলসী-বেদিকামূলে যোগিনী গৌরীর অন্বেষণ করিয়ো—এই বলিয়া গৌরী আর অপেক্ষা করিল না। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে কোন্ দিকে মিশিয়া গেল।

চিহ্লন যুক্তকরে বলিতে লাগিল—হে করুণাময়! হে জগদীশ! হৃদয়ে শত বৃশ্চিক-দংশন-যাতনা দেওয়া অপেক্ষা আমায় মৃত্যু দাও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পুনর্মিলন

তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল। বিহঙ্গের কাকলীতে গৃহবাসী জাগ্রত হইয়া উঠিল। কমলার দুগ্ধধবল মর্ম্মর প্রাসাদের সেই কক্ষে—যে সুসজ্জিত কক্ষ হইতে একদিন মহাস্থান-অমাত্যপুত্র পুণ্ডরীক বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, বহু বর্ষ পরে সেই কক্ষে সহসা মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইল। সেই বিচিত্র সৌধাবলী সংস্কারের অভাবে শ্রীহীন হইয়াছিল। প্রাচীর-গাত্রে দুই একটী অশ্বত্থবৃক্ষ গজাইয়া উঠিয়াছে। উপবনবিহারিণী দেবলোকবাসিনী অপ্সরার মত যে কমলা এই সুরম্য ভবন আলো করিয়া রহিত, সেই কমলার অন্তর্ধানে সেই প্রাসাদের আর সে শোভা নাই। প্রাঙ্গণ নানাজাতীয় আগাছায় পরিপূর্ণ। গৃহের নানা স্থান, পেচক চামচিকা প্রভৃতি রাত্রিচর বিহঙ্গকুলের আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছে। লোকে এই নির্জ্জন প্রাসাদে দিনের বেলায় আসিতেই ভয় পাইত। এহেন ভয়াবহ স্থানে কে রাত্রিযাপন করিল?

এ কি?—এ যে সেই কমলা! আজ বহু বর্ষ পরে সে তাহার পরিত্যক্ত আলয়ে প্রবেশ করিল কেন? অস্তগমনোন্মুখচন্দ্রের মত মুখ খানিতে সে

আর যৌবনের অপরূপ সুষমার সঞ্চার নাই। সে অপ্সরাকণ্ঠের সুর-তানলয়যুক্ত সুধাধারা আর মানবমন বিমোহিত করে না। এ কি বেশ! সর্ব্বাঙ্গে গৈরিক বসন আবৃত, কণ্ঠে বাহুমূলে রুদ্রাক্ষ-মালা। যোগিনী-বেশধারিণী কমলা ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে কাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছে?

এ কি? মন্ত্রী পুণ্ডরীক! এতদিনে হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছ? যে রত্নহার একদিন কালসর্প বোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, জীবনের অপরাহ্ণে আবার তাহা বক্ষে ধারণ করিয়াছ?

কমলা ও পুণ্ডরীক উভয়ে এক সুপ্রশস্ত ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসনে উপবিষ্ট। শারদ-চন্দ্রমার মত নির্ম্মলসুন্দর আননে পুণ্ডরীক কহিলেন—গৌরি! যোগিনি! ধর্ম্মপত্নী আমার। এতদিনে আমায় দেখা দিলে? সতীর গৌরব লইয়া এতদিনে ফিরিয়া আসিলে? প্রিয়তমে! এ যে জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ। অমানিশার গাঢ় অন্ধকারের পরে ক্ষণিক আলো—এ যে মুহূর্ত্তের জন্য প্রাণেশ্বরি। জীবনের সব সাধ, সব সুখ অপূর্ণ রাখিয়াই যে আমরা জগৎ হইতে বিদায় লইব।

যোগিনীবেশধারিণী কমলা পুণ্ডরীকের কোমল হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে লইয়া কহিল—এই আমার সুখ—এই আমার সৌভাগ্য। আমার কপালে যে এত সুখ ছিল, ইহা পূর্ব্বে ভাবি নাই। দাসী বলিয়া চরণে স্থান দিলে এই আমার সৌভাগ্য—দাসী অন্য সুখ চায় না।

পুণ্ডরীক কহিলেন—এই বেশে তোমাকে অনেক জায়গায় অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু চিনিতে পারি নাই। তেমন স্বর্ণকান্তি কোথায় যেন লুকাইয়া গিয়াছে। অনঙ্গদেবের পুষ্পচাপের মত সেই ভ্রূ, কুরঙ্গিণীর মত সেই সরলতাপূর্ণ চক্ষু, বসন্ত-বল্লরীর মত ভুজলতা, স্থিরা সৌদামিনীর মত অঙ্গশোভা আজ কোথায় প্রিয়তমে! তোমার এই অসম্ভাবিত পরিবর্ত্তনে কেহই তোমাকে চিনিতে পারিবে না। তোমার

যে কণ্ঠস্বর আমার মনে বিপ্লব বাধাইত, তোমার সেই কোকিল-গঞ্জিত কণ্ঠস্বর কোথায় প্রাণেশ্বরি!

যোগিনী কহিলেন—আমি হতভাগিনী—তোমার চরণে শত অপরাধে অপরাধিনী; তাহা না হইলে কাছে আসিয়াও আত্মগোপন করিব কেন? এ-হেন পুণ্যতীর্থ হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছিলাম কেন? তুচ্ছ অভিমানের বশে হৃদয়কে মরুভূমি করিয়া তুলিলাম! দিনান্তে তোমাকে একটি বার দেখিব এই সুখ লইয়া থাকিতে পারিলাম না কেন? বিধাতা আমার পোড়া অদৃষ্টে সে-সুখও লিখিলেন না। ভোগ-বিলাস তুচ্ছ করিলাম, তোমায় ভুলিতে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিলাম। শেষে দেখি, হৃদয়-সিংহাসনে অন্য দেবতার স্থান নাই। শ্মশানে, গ্রামে, প্রান্তরে, অরণ্যে, যেদিকেই নয়ন ফিরাই—সেই দিকেই তুমি। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জ্বলন্ত চিতার সম্মুখে তোমারই মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াছি। আমার শান্ত দেবতা! তোমার পায়ে আমার তৃষিত প্রাণের বোঝা নামাইয়া কবে নিশ্চিন্ত হইব বলিতে পার কি?

পুণ্ডরীক কহিলেন গৌরি! তোমার অদর্শনে যে যাতনা ভোগ করিতেছি—অহরহ যে জ্বালায় দগ্ধ হইতেছি, তাহা বিধাতা জানেন। এক এক বার মনে হইত, করতোয়ায় ঝাঁপ দিয়া এই উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন জীবনের অবসান করি। কিন্তু কর্ত্তব্য আসিয়া বাধা দিত। শেষে কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া শেষ দিনের প্রতীক্ষা করিতে-ছিলাম। কে জানিত, জীবনের সায়াহ্নে আবার তোমার সহিত মিলিত হইব।

যোগিনী কহিলেন—বিধাতার বিচিত্র বিধান! কর্ম্মস্রোত কখন্ কোন্ পথে ধাবিত হয় তাহা যে মানবের অপরিজ্ঞাত নাথ! সেই লীলাময় নিয়তির বল্গা ধারণ করিয়া যে-পথে মানুষকে চালান, মানুষ দ্বিধা বোধ না করিয়া সেই পথেই চলিতে বাধ্য হয়। কর্ম্মবশে দেখ আমি কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এ অবস্থায় আমি বেশ আছি।

পুণ্ডরীক কহিলেন—তুমি বেশ আছ—ধর্ম্মপত্নী ? ধর্ম্মপথে আমাকেও তোমার পার্শ্বে টানিয়া লও। আর কিসের সংসার। আমাদের উভয়ের সংসারের আসক্তির বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে। এখন আমাদের এই দায়িত্বপূর্ণ জীবনে এক মুহূর্ত্তেরও বিশ্রাম নাই। এখন এমন সময় আসিয়াছে, নিশ্চিন্ত হইয়া নিশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ নাই।

যোগিনী কহিলেন—কেন প্রিয়তম এ-কথা বলিতেছ ? কর্ম্মভূমিতে তুমি এমন কি আঘাত পাইয়া মর্ম্মবেদনা ভোগ করিতেছ ?

পুণ্ডরীক কহিলেন—তুমি কি জান না গোপি ! কি গুরুতর দোষের বোঝা আমার মস্তকে চাপিয়াছিল।

—আমি সবই জানি। সে তোমার দোষ নয়, দোষ আমার দাদার। আমার দাদা লোভে রাক্ষস হইয়াছে। দানবের মত তাহার ক্ষুধা। নিজের দোষে দাদা আমার অচিরাৎ ধ্বংস হইবে।

—তোমার দাদা চিহ্লন মিশ্রের সঙ্গে আর তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি ?

—আর সাক্ষাৎ করিয়া কোনই ফল নাই। আমার দাদা ব্রাহ্মণ-কুলে কালী দিয়াছে। শুনিলাম, গুলাঙ্গার ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

—কি ঘৃণিত অধঃপতন। স্বধর্ম্মে বিশ্বাসহীন ব্রাহ্মণ বরেন্দ্রভূমির সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর। আজ চিহ্লন মিশ্রের নাম মুখে আনিতেও মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়।

—শুধু একা আমার দাদা নয়, বিশ্বাসঘাতক বরেন্দ্র-সন্তান দলে দলে সুলতানের পদানত হইতেছে। হিন্দু-সন্তান আপন পদে আপনি কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত—অন্যের দোষ কি ?

—সত্য-সনাতন হিন্দুধর্ম্ম চিরকালই ধরাতলে বর্ত্তমান থাকিবে। কত ধর্ম্ম মস্তক উন্নত করিয়া হঠাৎ সগর্ব্বে উত্থিত হইয়াছিল, কিন্তু কোথায় সে ধর্ম্ম ! কালের প্রহারে তাহা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শত আঘাত

সহ্য করিয়া আজিও হিন্দু হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়াছে। যতই দগ্ধ কর অক্ষয় বট বৃক্ষের মত আবার তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইবে—আবার তাহা সতেজ বৃক্ষে পরিণত হইবে। শত আঘাত সহ্য করিয়াও হিন্দু জাতির অস্তিত্ব ধরাতলে বর্ত্তমান থাকিবে। কোনও নূতন ধর্ম্মই তাহাকে সমূলে নষ্ট করিতে পারিবে না।

—বরেন্দ্রভূমি হিন্দুর গৌরব ; বরেন্দ্রদেশ-বাসী হিন্দুসন্তান নিজের গৌরবময় মস্তকে পদাঘাত করিতেছে। তবে হিন্দুজাতির গৌরব কে রক্ষা করিবে ?

—দেখ গৌরি। অগ্নিপরীক্ষায় দগ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই জানকী-সতীকুলের শীর্ষস্থানীয়া। কাঞ্চন দগ্ধ না হইলে কখনো উজ্জ্বল হয় না, হিন্দুজাতি শত অত্যাচার ও নানা বিপ্লবের দ্বারা উৎপীড়িত না হইলে তাহার উজ্জ্বলশ্রী জগতের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে না।

—আমার সহোদর সুলতানের শরণাগত। কিসের আশায় তাহা জান কি ? এবং তাহার বর্ত্তমান অবস্থা কি তোমার পরিজ্ঞাত ?

—জানি, স্বার্থপর চঞ্চল মহাস্থান-সিংহাসনের আশায় মহম্মদ খাঁ নাম গ্রহণ করিয়া সুলতানের পাদুকালেহী ভৃত্যরূপে পরিণত হইয়াছে।

—দুরাশাই মানবকে দানবত্বে পরিণত করে। সুলতান অদ্য সসৈন্যে এই পারে উপস্থিত হইবে, তাহা শুনিয়াছ ত ?

—শুনিয়াছি। আর এখানে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য হইবে কি ?

—না। আমি এখনই গুপ্তস্থান হইতে আমার লুক্কায়িত অর্থরাশি লইয়া এখান হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিব।

—সংসারত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর আর অর্থের প্রয়োজন কি ?

—আজ আমার সমস্ত ধন সঞ্চয় সার্থক করিব। আমি আমার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ বিপন্ন মহারাজকে দান করিব।

—উত্তম সকল্প প্রাণাধিকে! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ তুমি করিলে! তোমার এই মহনীয় অবদান মৃত্যুর পরেও আমাকে সুখের স্বর্গ দেখাইয়া দিবে। প্রাণাধিকে, জীবনসঙ্গিনি! যে দারুণ লোকাপবাদে আমি অহর্নিশ দগ্ধ হইয়াছি আজ তাহাতে তোমার কল্যাণ হস্তের শান্তিজল পতিত হইল!

যোগিনী গৌরী গুপ্ত গৃহ হইতে এক পেটিকা বাহির করিলেন এবং বলিলেন—অদ্য হইতে এই বাটীর সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলাম। আর বিলম্ব করিব না; কি জানি, কখন যবনসেনা তীর অবরোধ করিবে বলা যায় না। শীঘ্র শীঘ্র পারে যাইতে হইবে।

উভয়ে উঠিলেন এবং ত্রস্তপদে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মিলন

আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে। করতোয়ার স্থির বারিরাশির উপর চন্দ্র-কিরণ পড়িয়া চিকমিক করিতেছে। যোগিনী করতোয়ার নীল বারিরাশির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন—দেখ দেখি আজ কেমন শোভা! মার মুখে আজ কেমন মধুর হাস। পাগলা মা আমার আহ্লাদে আত্মহারা; দশ দিক্ হাসাইয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে। সংসারীরা মায়ের এ আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিতে জানে না; তাই মাকে আমার ভীমা, ভয়ঙ্করী দানবদলনী মূর্ত্তিতে গড়িয়া তোলে। ধরার মানুষ হিংস্র জন্তুর মত আপনার রক্ত আপনি পান করে—তাই মা ছিন্নমস্তা। মানুষের রক্তে কত নদী-নালা ভরিয়া ওঠে! হায়রে মানুষ!

শীলাদেবী যোগিনীর পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া কহিলেন—আপনা আপনি কি বলিতেছ মা!

যোগিনী করতোয়ার সুনীল বারিরাশির দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—কি আর বলিব দেবী! এমন কাচের মত নির্ম্মল জল, হিন্দু-মুসলমানের শোণিতে লাল হইয়া যাইবে। বিশ্বনাশী কালের প্রভাবে স্রষ্টার সৃষ্টি এইরূপেই বুঝি চূর্ণ হয়।

শীলাদেবী কহিলেন—মহাকালীর যদি ধ্বংস করাই বাসনা হয় তবে কে তাঁহার ইচ্ছা রোধ করিবে। গুরুদেব বলিয়াছেন, সংসারে দানবত্বের প্রতিষ্ঠা না হইলে দেবত্বের মহিমা ফুটিয়া উঠে না।

যোগিনী কহিলেন—বিশ্বাসঘাতক হিন্দুসন্তান নিজের হৃদয়-শোণিতে আত্মপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে এবং বরেন্দ্রভূমিতে আর এক মানব-সমাজের চিরপ্রতিষ্ঠা হইবে—বোধ হয় ইহাই বিধিলিপি।

শীলাদেবী কহিলেন—মা! বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। একান্ত বরেন্দ্র-সন্তান, পবিত্র মহাস্থান-ভূমিতে বীরকীর্ত্তি রাখিয়া অনন্তধামে চলিয়া যাউক।

যোগিনী কহিলেন—হাঁ দেবী! সকলেই বিশ্বাসঘাতক ছিলেন নয়। রাজার জন্য, রাজ্যের জন্য মরিতে পারে এমন সন্তান অনেক আছে।

শীলাদেবী কহিলেন মা! আমি তোমার দাসী, আশীর্ব্বাদ কর, যেন ক্ষত্রিয়-নারীর গৌরব রক্ষা করিয়া অনন্তধামে চলিয়া যাইতে পারি।

যোগিনী সমাদরে শীলাদেবীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন—তোরা যে আমার সন্তান। সন্তানকে ফেলিয়া মা কি নিশ্চিন্ত থাকে? বরেন্দ্রভূমি আমার অঙ্গ। দুর্দ্দান্ত দস্যু আমার অঙ্গে আঘাত করিতে আসিতেছে, এমন সময়ে আমি আমার সন্তানগণকে ক্রোড়ে লইয়া

বিপদের সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়াইব।—এই বলিয়া যোগিনী মাতা শীলাদেবীর মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে বিজয় সিংহকে সেই স্থানে আসিতে দেখিয়া কহিলেন—ঐ যে পুত্র বিজয় সিংহ আসিতেছে। আয় বাবা! দুদিন তোকে দেখি নাই।

বিজয় সিংহ ধীরে ধীরে সেইখানে উপস্থিত হইলেন এবং যোগিনীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন—হিন্দুর সৌভাগ্য-রবি চির-অস্তমিত হইতে বসিয়াছে। আশীর্ব্বাদ কর মা! শক্তিময়ী মা আমার! করজোড়ে রাঙ্গাপায়ে শক্তি ভিক্ষা করি। শত শত শত্রু মহাস্থানকে ঘিরিয়াছে। ও-পারে সুলতানের সিংহনাদে কাপুরুষ বরেন্দ্র-সন্তান যেন এখনই পলায়ন করিতে উদ্যত। বল্,মা শক্তিরূপিণি! এই দুর্দ্দিনে মহাস্থানকে কে রক্ষা করিবে?

—আমার তুমি আছ—আমি তোমার মত সন্তানের মুখের পানে চাহিয়াই নিশ্চিন্ত মনে আছি। বাপ! হৃদয়ে হৃদয়ে আমার মাতৃমূর্ত্তি জাগ্রত কর। বক্ষ-শোণিতে আমার পূজা কর। এতদিন হৃদয়ের শত স্নেহধারায় যাহাদিগকে পালন করিয়াছি, আজ পুত্রের গৌরব লইয়া তাহারা মায়ের বুকে ফিরিয়া আসুক।

—মা! রাজার আহ্বানেও হিন্দুবীরের প্রাণে তেমন উৎসাহের ধারা বহিতেছে না কেন? সামন্ত রাজগণ রাজার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করে না কেন? চতুর্দ্দিকে কেবল পাপ ষড়যন্ত্র—আর নারকীয় অট্টহাসি।

যোগিনী অন্যমনস্ক ভাবে কহিলেন—ঐশ্বর্য্যের দম্ভ, ধনের অহঙ্কার ক'দিনের জন্য? রাজার গৌরবময় রাজমুকুট, ধূলায় লুণ্ঠিত কেন? এই আছে—এই নাই। গুরুদেব! এ তোমার মিথ্যা কথা—দুর্ব্বলতার প্রলাপ। আছে বৈকি? যাহা চিরস্থায়ী, স্মৃতি তাহার গৌরব চিরজাগ্রত রাখে; " কিসের ষড়যন্ত্র—মৃত্যুর? মৃত্যু কোথায়? বরেন্দ্রসন্তান!

"বৎস বিজয়! এই অমূল্য রত্নহার তোমার কাছে অর্পণ করিলাম

....১৮৫ পৃষ্ঠা

মায়ের মন্ত্রপূত আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। আমার আশীর্ব্বাদে তুমি অমর। বিজয়!

—মা!

—বৎস! আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। এই মুক্ত আকাশতলে, এই চন্দ্রালোকসমুজ্জ্বল রজনীতে পবিত্র কর তোমার তীরভূমিতে দাঁড়াও। আমি তোমার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব শক্তির সন্নিবেশ করি। বরেন্দ্রকুমার! তুমিও এস, তোমার হৃদয়-সিংহাসনে এক পবিত্র দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হোক্।

যোগিনী, শীলাদেবী ও বিজয় সিংহের কর একত্র করিয়া কহিলেন—বৎস বিজয়! এই অমূল্য রত্নহার তোমার কণ্ঠে অর্পণ করিলাম। বরেন্দ্র-ভূমির সমস্ত যশঃগৌরব আহরণ করিয়া এ-রত্নের গৌরব রক্ষা কর। আর তুমিও দেবি! স্থির, সৌম্য এই দেবমূর্ত্তি হৃদয়-সিংহাসনে চিরপ্রতিষ্ঠ কর—বিপজ্জালে বেষ্টিত মহাস্থান গড় শত্রুশূন্য কর। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিলাম। ঘনকৃষ্ণমেঘে গগন আবৃত, কখন্ না জানি প্রলয়-তাণ্ডবে ঝটিকা উঠিবে। দম্পতিযুগল! ঘোর অন্ধকারে তোমাদের উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটিয়া উঠুক। আমার আশীর্ব্বাদে তোমরা উভয়ে চির অমরত্ব লাভ কর। এই বলিয়া যোগিনী দ্রুত পদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিজয় শীলাদেবীর কর ধারণ করিয়া কহিলেন-শীলা! দেবি! তুমি আমার মায়ের দান; আমার অন্ধকার হৃদয়ের ধ্রুবতারা। আমি কি এ রত্নহারের গৌরব রক্ষা করিতে পারিব?

শীলাদেবী কহিলেন—স্বপ্ন কি সত্য হয়? আমি আজ স্বপ্নে দেখিলাম, অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতেছি। আর তুমি দেবতা, আমার হাত ধরিয়া আমায় প্রাণের কাছে টানিয়া লইতেছ। আমি আমার যা-কিছু তোমার পায়ে ডালি দিয়া আমার সকল সাধ পূর্ণ

করিলাম। কিন্তু মহাস্থানের এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমরা যে এই মিলনের আনন্দ অনুভব করিব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

—শীলাদেবি! তুমি মহাস্থানের উজ্জ্বল রত্ন। আমি তোমার অযোগ্য। তুমি যে আমায় ভালবাসিয়াছ, ইহা আমার জীবনের অপূর্ব্ব গৌরব। আমি আমার মনপ্রাণ অনেক দিন তোমার চরণে অর্পণ করিয়াছি। মনে পড়ে শীলা, সেই বনভূমির মধ্যে সেই দ্বৈত-যুদ্ধ— আমি তোমার চরণে মর্ম্মের শোণিত ঢালিয়া দিয়া তোমার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলাম!

—আমি সেই দিন আমার সমস্ত মনপ্রাণ তোমার চরণে অর্পণ করিয়াছিলাম। আমার ভালবাসার অভিজ্ঞান হীরকাঙ্গুরীয়ক তোমার করে পরাইয়া দিয়াছিলাম। রাজসভায় সর্ব্বসমক্ষে আমার কণ্ঠহার তোমার গলদেশে অর্পণ করিয়াছিলাম। আমাদের এ ভালবাসা জগতে চিরগুপ্ত থাকিত। কিন্তু সর্ব্বান্তর্যামিনী দেবী উভয়ের হৃদয়ভাব অবগত হইয়া আমাদের উভয়ের কর একত্র করিয়া দিলেন।

—দেবি! বিজয় সিংহ মহাস্থানের চিরকিঙ্কর। হৃদয়ের শেষ শোণিতধারা ঢালিয়াও যদি গড় রক্ষা করিতে পারি, তাহাও আমার পরম গৌরব। কিন্তু মহাস্থান-সেনার ব্যবহারে বড়ই দুঃখিত হইয়াছি।

—কেন?

—তাহারা চিল্লনের অনুগত। যেরূপ অবস্থা তাহাতে তাহাদের উপর নির্ভর করিলে বোধ হয় বিনা যুদ্ধেই দুর্গ সুলতানের করে অর্পণ করিবে।

—বীর বিজয় সিংহ কি তাঁহার সাহসী সৈন্যবল লইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইতে সাহসী হইতেছেন না?

—শীলাদেবি! তুমি যার পত্নী, সে কি মৃত্যুভয়ে ভীত হয়? তুমি যদি আমার কাছে থাক আমি একাকী সিংহের সম্মুখীন হইতে পারি।

—আমি পরমানন্দ রায়ের শিষ্যা, তোমার পত্নী। আমি পার্শ্বে

থাকিয়া তোমার ধর্ম্ম—তোমার গৌরবরক্ষা করিব। স্বামিন্! ইহ পরকালে আমি যে তোমার জীবনসঙ্গিনী।

তুমি আমার সাধনা তুমি আমার গৌরব, যখন গুরুশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িব তখন তোমার ঐ হাসিমাখা মুখখানি আমার প্রাণে উৎসাহের শত ধারা প্রবাহিত করিবে: তুমি যদি আমার কাছে থাক, আমার এই বাহু মত্ত হস্তীর বল ধারণ করিবে। আমি শত্রুকুল মথিত করিয়া অটল অচল ভাবে সংগ্রাম করিব।

—সুলতান নীরবে আছে কেন?

—ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ। তা হউক, মহাস্থান সেনাও আর নিদ্রিত নয়।

—সম্পূর্ণ নিদ্রিত না হইলেও আধ নিদ্রাজড়িত তন্দ্রাযুক্ত।

—দেবি! তুমি যদি জাগ্রত হও, বরেন্দ্র-সন্তানের এ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে। তুমি যদি উঠিয়া দাঁড়াও, কে এমন কাপুরুষ আছে, নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিবে। জাগো নারী! জাগো দেবী! অলস নিদ্রিতগণকে জাগরণের কম্বু কোলাহল শুনাইয়া দাও।

সহসা সেই জ্যোৎস্নাবিহ্বল রজনীর শান্ত বায়ুতরঙ্গের মধ্য দিয়া কি এক সুরলহরী শীলাদেবীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল! শীলাদেবী আজ মিলন-মহোৎসবের মধুর সঙ্গীতে আত্মহারা। নন্দনের সুখ-স্বপ্নে বিভোরা! এমন অবস্থায় দূরাগত সেই স্বরলহরী শীলাদেবীকে কোন্ অনির্দ্দেশ্য স্বর্গ-লোকের মোহন সঙ্গীত শুনাইয়া যেন তন্ময় করিয়া ফেলিল। শীলাদেবী বুঝিতে পারিলেন ভৈরবনন্দিনী বালিকা শ্যামা কোকিলকণ্ঠে গান গাহিতেছে।

শীলাদেবী কহিলেন—ঐ শোন বীর! বালিকা শ্যামার আজ কি আকুল আহ্বান।

বিজয় সিংহ একমনে সেই গান শুনিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে কহিলেন—সখা ভৈরবের নয়নপুত্তলী শ্যামার কণ্ঠস্বর কি মধুর!

শীলাদেবী ও বিজয় পাশাপাশি দাঁড়াইয়া শ্যামার গান শুনিতে লাগিলেন। শ্যামা ভাবে গদ্‌গদ্ হইয়া গাহিতেছে :—

মম, সকল শূন্য করিতে পূর্ণ
জাগিলে হৃদয়-গগনে,
এস চির-নির্ভর সুন্দর ওগো
এস মম হৃদি-আসনে।
নিত্য তোমারে চাহি গো পূজিতে
চিত্ত-কমল রক্ত শোণিতে,
ভক্ত-হৃদয়-অম্বর মাঝে
উঠ প্রিয় শুভ লগনে।
এস গো প্রাণেশ আঁখির আলোতে,
ছড়ায়ে কিরণ মনের কালোতে,
চির মঙ্গল বেশে এস এস প্রিয়,
অনাথ-হৃদয়-ভবনে।

শীলাদেবী কহিলেন—নাথ! বালিকা শ্যামার আকুল আহ্বান—

মম, সকল শূন্য করিতে পূর্ণ
জাগিলে হৃদয়-গগনে,—

কি সুন্দর সময়োচিত!

বিজয় সিংহ প্রেমভরে কহিলেন—প্রিয়ভাষিণি! এযে প্রেমময় বিধাতারই বিচিত্র বিধান।

যোগিনী সহসা সেই স্থানে সমাগত হইয়া কহিলেন—বিজয়! শত্রুসেনা করতোয়ার তীরভূমিতে উপস্থিত। সত্বর তোমার কর্ত্তব্য পালন কর।

বিজয় সিংহ যোগিনীর চরণধূলি লইয়া ত্বরিতপদে প্রস্থান করিলেন।

যোগিনী শীলাদেবীকে কহিলেন—চল্ মা! এই রণরঙ্গপূর্ণ মহাস্থানের শূন্যভূমিতে তোদের বাসর-শয্যা সাজাইগে চল্!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নৈশ সমর

ঘোর কালিমাময়ী রজনী। সমস্ত আকাশ মেঘাবৃত। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিত হইতেছে। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। রজনীর গাঢ় অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া অগণিত ইস্‌লাম-সৈন্য কমলাভবনের সম্মুখে নদীতটে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। মহাস্থান-সেনা কি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে? তাম্রদ্বারের সম্মুখেই যে শত্রু। কে আছ দেবতা। কে আছ করুণাময়! সুষুপ্ত মহাস্থানকে জাগ্রত কর। ঐ যে পিপীলিকা শ্রেণীর মত ইস্‌লাম-সেনা দেখিতে দেখিতে হাঁটু জল পর্য্যন্ত নামিল। বিশ্বস্ত সেনাপতি মার্জ্জা মোরাদ, বীরবর বিজয় সিংহ ইহাদিগকে বাধা দিতে প্রস্তুত হইতেছেন না কেন?

"গুড়ুম্ গুড়ুম্"

তোপ গর্জ্জিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে গড় মহাস্থান নগরী আলোকোদ্ভাসিত হইল। নদীতটে সহস্র সহস্র মশাল প্রজ্বলিত হইল। ইস্‌লাম-সেনাপতি মহম্মদ খাঁর সকল কৌশল ব্যর্থ হইল। বিজয় সিংহ নৈশ সমরের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিলেন।

মহম্মদ সৈন্যদল সহ কয়েক পদ পশ্চাতে হটিল। তীর হইতে কিয়দ্দূরে সরিয়া গিয়া সৈন্যদল কয়েক ভাগে বিভক্ত করিল এবং পরে যাত্রার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। সন্তরণে নদী পার হওয়া এক প্রকার অসম্ভব; করতোয়া ঝটিকা-বেগে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তাহার অত্যুগ্র জলোচ্ছ্বাসে কানে তালা লাগিয়া যাইতেছে। মহম্মদের একজন

ইচ্ছা সত্ত্বেও যুবরাজ ইব্রাহিম সৈন্যগণকে নদী-বক্ষে ঝম্প প্রদান করিবার অনুমতি দিতে সাহস করিলেন না। মহম্মদ রোষকষায়িত নেত্রে ইব্রাহিমের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার সৈন্যগণ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য;—এই কাপুরুষগণকে লইয়া মহাস্থানগড় জয় করিতে আসিয়াছেন? আমাকে আদেশ করুন, আমি আমার সৈন্যগণকে লইয়া সন্তরণে নদী পার হই।

—বল কি? তুমি মানুষ—না সয়তান? মানুষের সাধ্য কি, এই ঝড় জলের মধ্যে করতোয়ার উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া পারে যাইতে পারে।

—তবে খাড়া দাঁড়াইয়া মরুন। ঐ দেখুন শত্রুগণ আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কামান দাগিতেছে। ইহা অপেক্ষা সকলে আমার পশ্চাদ্ধাবন করুন।

মহম্মদ আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই সসৈন্যে নদী-বক্ষে ঝম্প প্রদান করিল। ইব্রাহিম কি করিবেন—উপায়ান্তর না দেখিয়া সৈন্যদল লইয়া নিকটস্থ আম্রবনের অন্তরালে লুক্কায়িত হইলেন।

তাম্রদ্বারের সম্মুখে নদীতীর পর্য্যন্ত মহাস্থান-সেনা সার সারি দণ্ডায়মান। শীলাদেবী স্বয়ং উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে সৈন্যদলের পরিচালনা করিতেছেন। বিজয় সিংহ গোলন্দাজ সেনাগণকে লইয়া পরপারস্থিত সৈন্যদলকে লক্ষ্য করিয়া অনলবর্ষণ করিতেছেন। কামানের ঘন ঘোরনাদে কর্ণকুহর বধির হইতেছে।

শীলাদেবী বিজয় সিংহের নিকটে আসিয়া কহিলেন—শত্রু-সৈন্য কি পলায়ন করিল? কই, আর ত দেখা যায় না।

বিজয় সিংহ কহিলেন—না, মহম্মদ সহজ শত্রু নয়! এত সহজে সে পলায়ন করিবে না। আমার বোধ হয় শত্রু-সেনা সন্তরণে নদী পার হইতেছে।

বিজয় সিংহ বংশীধ্বনি করিলেন। তীরন্দাজ সৈন্যের অধিনায়ক ভৈরব তাঁহার সম্মুখীন হইয়া অভিবাদন করিল। বিজয় সিংহ কহিলেন,—ভৈরব!

—প্রভু!

—ভৈরব! এইবার বীরত্ব দেখাও। আজ তোমার প্রভুভক্তির পরীক্ষা। শত্রু-সেনা সাঁতার দিয়া নদী পার হইতেছে। তোমার শিক্ষিত সেনাগণকে লইয়া একশত ছিপ্ খুলিয়া দাও। অব্যর্থ শরসন্ধানে সন্তরণপটু শত্রুদলের বক্ষদেশ বিদীর্ণ কর।

ভৈরব বিজয় সিংহের পদধূলি গ্রহণ করিয়া ত্বরিত পদে প্রস্থান করিল।

বিজয় সিংহ এক হস্তে ললাটের ঘর্ম্মরাশি মুছিলেন। শীলাদেবী তাঁহার আরও নিকটে আসিয়া কহিলেন—বীরবর! আপনি কিয়ৎকাল বিশ্রাম করুন, বোধ হয় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন।

বিজয় সিংহ কহিলেন—শক্তিময়ী দেবি! তুমি কাছে থাকিলে বিজয় সিংহ শক্তি হারাইবে না।

—এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া সুলতান শাহ সসৈন্যে নদী পার হইতে সাহস করিয়াছে?

—সুলতান সাহস না করিতে পারে। কিন্তু পাপিষ্ঠ চিহ্নুন—বিশ্বাসঘাতক হিন্দু-সেনাগণ এই বৃষ্টিধারা মস্তকে করিয়া, করতোয়ার উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া পার হইতে পারে। ঐ শুন দেবি! ঐ আম্রকানন মধ্যে মুমূর্ষু হতাহতের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ। আমি ঐ বন লক্ষ্য করিয়া তোপ দাগিতেছি, এতক্ষণে সুফল ফলিয়াছে। আমার নিক্ষিপ্ত গোলা—আম্রকানন ভেদ করিয়া শত্রুদল মন্থন করিতেছে। ভাই সব! একবার আকাশ-পাতাল কম্পিত করিয়া মহাস্থান-অধীশ্বরী জয়দুর্গার জয় ঘোষণা কর।

অমনি সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে আকাশ-পাতাল কম্পিত করিয়া শব্দ হইল—জয় দুর্গা মায়ী কি জয়—জয় রাজাধিরাজ পরশুরাম কি জয়।

কিয়ৎকাল এইরূপেই যুদ্ধ চলিল। ভৈরব সিক্তবসনে ছিপ্ হইতে নামিল এবং বিজয় সিংহের নিকটস্থ হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

বিজয় সিংহ ভৈরবের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিলেন—ভৈরব! বন্ধু! তোমার বীরত্বে আজ মহাস্থান-ভূমির গৌরব রক্ষা হইল। সংবাদ কি?

ভৈরব নতমস্তকে কহিল—প্রভু! সত্য সত্যই মরণ পণ করিয়া, ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বহু সৈন্য বাবমতী পার হইতেছিল। আমি তাহাদের এ প্রথম উদ্যম ব্যর্থ করিয়াছি। আমাদের নিক্ষিপ্ত শরে, আর পাথরের আঘাতে শত্রু-সৈন্য করতোয়ার বারিরাশির মধ্যে চিরদিনের মত লুকাইয়াছে—আর উঠিয়া আসিবে না। কিন্তু রাজন্! এ কি দেখিলাম?

বিজয় সিংহ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—কি দেখিলে ভৈরব?

—দেখিলাম, শত শত হিন্দুসন্তান প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া সন্তরণে নদী পার হইতেছে। বড়ই দুঃখের কথা, প্রভু! জীবনের প্রথম সমর-যাত্রায় হিন্দুসন্তান হইয়া শাণিত শরে শত শত হিন্দুর বক্ষ বিদ্ধ করিলাম! হিন্দুর শোণিতে করতোয়ার বারিরাশি লাল হইয়া গেল। কিন্তু একজন মুসলমানকেও দেখিলাম না। বুঝিলাম না, রাজা! হিন্দু কেন প্রাণ তুচ্ছ বোধ করিয়া নিজের গৌরবময় মস্তকে পদাঘাত করিতেছে —মহাস্থানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।

—বীর! বিশ্বাসঘাতকে বরেন্দ্রভূমি ভরিয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে গড় মহাস্থান আক্রমণ করিতে সুলতানের সাহস হইত কি?

—বন্দীদিগের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিব?

—অন্ধকারময় কারাকক্ষে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখ। বন্দীদিগের মধ্যে চিন্তনকে দেখিতে পাইয়াছিলে কি?

—ঘোর অন্ধকার, কাহাকেও চিনিতে পারি নাই। যেসব সৈন্য পলায়ন করিয়াছে, চিহ্লন তাহাদের মধ্যে থাকিতে পারে।

শীলাদেবী কহিলেন—না ভৈরব! তাহার মৃত্যু এত সহজে হইবে না। আমি তাহার রক্তে ধরিত্রীর শোণিত-পিপাসার শান্তি করিব।

ভৈরব প্রস্থান করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে পরপারে শত শত মশাল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

বিজয় সিংহ সবিস্ময়ে কহিলেন—শত্রুগণ আবার প্রস্তুত হইতেছে।

রাজকুমারী তূর্য্যধ্বনি করিলেন। পদাতিক এবং গোলন্দাজ সৈন্যগণ পুনর্ব্বার প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। বিজয় সিংহ পুনরায় তোপধ্বনি করিতে লাগিলেন; শত শত ছিপ আবার করতোয়ার বক্ষে ভাসিল।

শত্রু-সেনা এইবার কামান দাগিল। করতোয়ার উভয় তীর হইতে সমভাবে অনল বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল।

"জয় কালী মায়ী কি জয়"—"আল্লা হো আকবর" শব্দে আকাশ-পাতাল কম্পিত হইল। উভয় তীর হইতেই রণ-হুঙ্কার ও হতাহতের আর্ত্তনাদে শ্রবণকুহর বধির হইয়া উঠিল। মধ্যে করতোয়া তেমনই বহিয়া যাইতেছে। তাহার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। আধ-মেঘাবৃত ম্লান চন্দ্র মলিন মুখে গগনভালে উদিত হইয়াছে। কেহ কাহারও মানা শুনে না··· কেহ কাহারও মুখ চাহিতেছে না—কেবল মার মার শব্দে ধরিত্রীকে কম্পিত করিতেছে।

একপারে সসৈন্যে ইব্রাহিম, অপর পারে বিজয় সিংহ। মধ্যে করতোয়ার অগাধ জলরাশিমাত্র ব্যবধান! কিন্তু সমর চলিতেছে। অকস্মাৎ একটি তীর আসিয়া রাজকুমারীর বক্ষদেশে পতিত হইল। তীর বর্ম্ম ভেদ করিল না। বর্ম্মে লাগিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। রাজকুমারী সেই তীর তুলিয়া লইয়া ধনুকে যোজনা করিলেন এবং শত্রুসৈন্য লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন।

দৈবের লীলা অখণ্ডনীয়। সহসা সেই শর যুবরাজ ইব্রাহিমের বাহুমূলে বিদ্ধ হইল। দরদরধারে শোণিত-প্রবাহ ছুটিল। মহম্মদ সিক্ত দেহে তাঁহার সমীপস্থ হইল। যুবরাজকে তদবস্থ দেখিয়া, তাঁহাকে লইয়া নিকটস্থ বেতসীবনের অন্তরালে লুকায়িত হইল।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু সমভাবেই যুদ্ধ চলিতেছিল। রাজা পরশুরাম ত্রিতল প্রাসাদকক্ষ হইতে সমর দর্শন করিতেছেন। সে প্রকোষ্ঠে আর কেহই নাই। অকস্মাৎ দ্বার ঠেলিয়া যোগিনী সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন—সন্তানকে পদছায়া দাও, মা! সমস্ত জীবন বিপদের সঙ্গেই যুদ্ধ করিয়াছি। কেশ শুক্ল, দন্ত পতিত, মৃত্যুর দ্বারে অতিথি আমি; আজও কি মা, বিপদ দিয়া সন্তানকে পরীক্ষা করিতে আছে? মা! আমি আর কিছু চাই না—আমার চিরজীবনের সাধনা, আমার গৌরব মহাস্থান-ভূমির সম্মান রক্ষা কর।

যোগিনী কহিলেন—কীর্ত্তিমান্ মহারাজ! যুগযুগান্তর লোকে তোমার কীর্ত্তিগাথা গান করিবে। তুমি প্রজার হৃদয়-রাজ্য জয় করিয়াছ শত সুলতানের সাধ্য কি, তোমার রাজ্য—তোমার গৌরব অপহরণ করে। মার পায়ে জবা-বিল্বদল দিলাম, তাঁহার হাসি মুখ দেখিলাম, তুমি তবে বিষন্ন কেন, নরনাথ!

রাজা পরশুরাম কহিলেন—মা! মরি তায় ক্ষতি নাই! আমার শেষ বয়সের সন্তান দুধের শিশুকে তোর পায়-পদ্মে অঞ্জলি দিতেছি। আমার সব নে মা। আমার প্রাণ—আমার স্বর্গ মহাস্থানকে ফিরে দে।

যোগিনী কহিলেন—ভুল ভাব কেন, মহারাজ! সাক্ষাৎ জগজ্জননী বোধ হয় তোমার তনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ঐ দেখ—চাহিয়া দেখ রাজা! শীলাদেবী কেমন নাচিয়া নাচিয়া দৈত্যদলনীর মত শত্রু সংহার করিতেছে।

—কি দেখালি মা। এ কি মূর্ত্তি দেখিলাম, জননী! মা যেন আমার বিশ্বসংহারে উদ্যত! এলোকেশে উলঙ্গ কৃপাণ করে মা আজ বিশ্বসংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। মহাস্থান! এই জড়, নিশ্চেষ্ট দাসকে ক্ষমা কর! আমিও রক্তজবার মত হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া তোমার মহাপূজা সাঙ্গ করিব। দাও মা। দাসের করে শাণিত কৃপাণ তুলিয়া দাও!

—মহারাজ। সার্থক তনয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলে! শীলাদেবী তোমার পুত্রের গৌরব রক্ষা করিল।

—ও কি? ও কিসের শব্দ?

—ওপার হইতে শত্রু-সেনা কামান দাগিল। মহাস্থান-সৈন্য অনল বর্ষণ করিতেছে। করতোয়ার দুই কূল ধূম্রাচ্ছন্ন। রক্তবর্ণ অগ্নিগোলক ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতেছে না, মহারাজ।

—আবার ও কিসের কোলাহল?

—শত্রু-সৈন্যের আনন্দোল্লাস! তাহারা "আল্লা হো আকবর" শব্দে আকাশ-পাতাল কম্পিত করিতেছে। মহারাজ! পরপারে অসংখ্য ছিপ্! সুলতান এত ছিপ্ সংগ্রহ করিল কি প্রকারে? শত্রু-সেনা এইবার ছিপ্ অবলম্বনে নদীপার হইতেছে।

—দেবি। যেন কোন্ অনিশ্চিত অদৃষ্ট তাহাদিগের সহায়তা করিতেছে।

—ধন্য--ধন্য বিজয়! ঐ গেল—শত্রু-সেনাপরিপূর্ণ একখানি ছিপ্ করতোয়ার অতলজলে ডুবিয়া গেল।

—বিশ্বাসঘাতক চিহ্লন পথ দেখাইয়া সুলতানকে মহাস্থান গড়ে আনিতেছে। হয়ত অর্দ্ধেক সৈন্যের মায়া বিসর্জ্জন দিয়াও সুলতান গড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। কি হইবে, মা! আমি নিতান্তই হতভাগ্য। আজ নরসিংহকে দুর্ব্বল মনে করিয়া সামন্ত নৃপতিগণ পূর্ব্ব-কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হইয়াছে।

—মহারাজ! বিংশতি রাজশক্তি মহাস্থানে সমবেত। এই সম্মিলিত রাজশক্তি যদি প্রাণপণে বাধা দেয়, সুলতানের সাধ্য কি এক পদ ভূমি অগ্রসর হয়। কিন্তু হিন্দুকুলাঙ্গারগণ এখনই যুদ্ধে শিথিলভাব অবলম্বন করিয়াছে।

—আর বৃথা চেষ্টা। তাহা হইলে মা! সত্যসত্যই মহাস্থানের ধ্বংসকাল উপস্থিত! তাহাই যদি হয়—বরেন্দ্র-সন্তান যদি নিজের গৌরব ভুলিয়া সুলতানের পদানত হয়, তবে আর কেন, আমি আমার শেষ শোণিত-ধারা মহাস্থানের পবিত্র ভূমিতে ঢালিয়া দিয়া অনন্ত ধামে চলিয়া যাই—মায়ের চরণে আমার শেষ শোণিত অঞ্জলি প্রদান করিয়া জন্মের মত বিদায় হই। বিশ্বাসঘাতক বরেন্দ্রসন্তান। আমার অভিশাপ গ্রহণ কর! আজ যেমন পবিত্র বরেন্দ্রভূমির স্বাধীনতা, সুলতান সাহের চরণে অর্পণ করিয়া দাসত্বব্রত গ্রহণ করিলে, পুরুষানুক্রমে যুগযুগান্তর এই দাসত্বের ভার বহন করিয়ো। মা ধরত্রী! আমি তোর কুসন্তান, তোর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলাম না—চিরকলঙ্কের কালী ললাটে লেপন করিয়া বিদায় লইতেছি। আমায় ক্ষমা কর! দেবি! চল মায়ের মন্দিরে যাই। মহাস্থান-অধিষ্ঠাত্রী দেবী অম্বিকার পূজা সাঙ্গ করি।

—এস মহারাজ! সর্ব্বমঙ্গলার প্রসাদ, নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিবে এস।

যোগিনী এবং রাজা পরশুরাম সেই বিশাল সৌধের সর্ব্বোচ্চ তল হইতে ভূতলে অবতরণ করিয়া মহাকালীর মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কালীমন্দিরে

নৈশযুদ্ধে মহাস্থান-সেনা জয়লাভ করিয়াছে। ইব্রাহিম ও মহম্মদ সসৈন্যে করতোয়ার তীরভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

মহাস্থান-সেনাপতি মীর্জ্জা মোরাদ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হন নাই। চতুর্দ্দিকে যথোপযুক্ত সেনা সংস্থাপন করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। বিজয় সিংহ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, শত্রু-সেনা অন্য পথে গড় আক্রমণ করিতে পারে। হইলও তাহাই। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইতে না হইতে হাজার দুয়ারী সভাগৃহের সম্মুখস্থ পথে বিজয় সিংহ সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। বীরেন্দ্র পাল ও রাঘবেন্দ্র সসৈন্যে তাঁহার সাহায্যার্থ পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিলেন। সামরিক দূত সংবাদ দিল, ইব্রাহিম ও মহম্মদ অন্য পথে নদী পার হইয়াছে এবং সসৈন্যে ঐ পথে গড় আক্রমণ করিতে আসিতেছে।

রাজকুমারী শীলাদেবী ভৈরব অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া সেনাদিগের সহিত যোগদান করিলেন। ঝটিকার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকৃতির মত মহাস্থান-সেনা স্থিরভাব ধারণ করিল।

এদিকে মহাকালী-মন্দিরে মাঙ্গলিক অর্চনা হইতেছে। মহারাজ পরশুরাম যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত হইয়াছেন। তিনি মায়ের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ গমন করিবেন। মহারাজ গললগ্নীকৃত বাসে মায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বিপুল উদ্যমে ঢাক, ঢোল, নহবত বাজিতেছে। এমন সময় নরেন্দ্র, মহেন্দ্র ও হরপাল সুসজ্জিত হইয়া রাজসকাশে উপস্থিত হইল। মহারাজ সকলকেই মিষ্টবাক্যে সময়োচিত উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। মহেন্দ্র ও হরপাল সেনাপতির নির্দ্দেশ অনুসারে অস্ত্রাগার রক্ষায় নিয়োজিত হইল। মন্ত্রী পুণ্ডরীক যোদ্ধৃবেশে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা ইঙ্গিতে তাঁহাকে সেইখানে তাঁহার পার্শ্বে বসিতে বলিলেন। মন্ত্রী উপবেশন করিলেন। যোগিনী মাতা, মহাকালী-মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া মন্ত্রীর পদধূলি গ্রহণ করতঃ মন্দিরপ্রাঙ্গণে ব্যাঘ্র চর্ম্মাসনে উপবেশন করিলেন। মহারাজ ভক্তিভাবে মন্ত্রীর ও যোগিনী মাতার

পদধূলি গ্রহণ করিলেন। যোগিনী পুণ্ডরীকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—এ কি মূর্ত্তি নারায়ণ!

পুণ্ডরীক কহিলেন—কেন দেবি!

যোগিনী কহিলেন—সামান্য শত্রু-দলনের জন্য তোমার এ সংহার-মূর্ত্তি কেন, প্রভু? বিশ্বনাথ! কোটী বিশ্ব তোমার পদ-নখরে, সামান্য বরেন্দ্রভূমিরক্ষার্থ তোমার অস্ত্র ধারণ কেন? ভক্তের রোদনে স্থির থাকিতে পার নাই, তাই আজ এ বেশ? একবার ভীষ্ম-নিধনে রথচক্র ধারণ করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছ, আবার আজ অস্ত্র ধারণ কেন প্রভু! সামান্য মানবশিশুদলনের জন্য? তোমার এ রুদ্র মূর্ত্তি সংহর সংহর দেব। আমি তোমার এ-মূর্ত্তি দেখিতে পারিব না।

যোগিনী নয়নপল্লব মুদ্রিত করিলেন। মন্ত্রী কহিলেন—মহারাজ! এমন গুণবতী সাধ্বী—এমন ঐকান্তিকী নিষ্ঠা কুত্রাপি দেখি নাই। নরে নারায়ণজ্ঞান, সর্ব্বজীবে সমভাব—আবার অন্য দিকে অত্যাচারীর দলনে দৈত্যদলনা ভীমা। অদ্ভুত এ রমণী!

রাজা কহিলেন—দেব! জননী সত্যই বলিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার এ-বেশ কেন প্রভু। দাস নরসিংহ আপনার চরণে শত অপরাধী, আর তাহাকে অপরাধী করিবেন না। একবিন্দু ব্রহ্ম-শোণিত-পাতে মঙ্গল দূরে থাক, গড় মহাস্থান ভস্মীভূত হইবে।

মন্ত্রী কহিলেন—মহারাজ! আমার শিক্ষা ব্যর্থ করিবেন না। ব্রাহ্মণের পদরেণু-পূত বরেন্দ্রভূমির রক্ষার্থ আমি হৃদয়ের রক্ত দান করিব। কেহ আমাকে বাধা দিতে পারিবে না। এতদিন পুত্র-স্নেহে পালন করিয়াছ। মহারাজ! এই দেহ তোমার অন্নে পালিত সুতরাং, এই দেহ তোমার। আজ তোমার বিপদে, বরেন্দ্রসন্তান আমি, তুচ্ছ ব্রহ্মণ্যের অহঙ্কারে নীরবে বসিয়া থাকিব?

মহারাজ পরশুরাম কহিলেন—প্রভু! দোষ গ্রহণ করিবেন না

নরসিংহ আপনার চরণে পতিত। মহাস্থানপতি নারায়ণ! তোমার মহাস্থান, তুমি রক্ষা কর। ঐ রামরাজা আসিতেছে। এস বৎস। রাজ্যের একনিষ্ঠ ভক্ত! আমি অনুতপ্ত, একদিনের অবহেলা মার্জ্জনা কর, বাপ।

রামরাজা মহারাজের চরণে পতিত হইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—মহারাজ! পিতা! আপনি আমায় মার্জ্জনা করুন।

রাজা পরশুরাম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন—শিষ্য! পুত্র! আজ পুত্রের কাজ কর—পিতার শেষ আদেশ পালন কর। ভোজ গৌড় বংশধর শিশু রাজকুমারকে লইয়া সুদূর দেশে চলিয়া যাও। কি জানি এই কাল যুদ্ধের পরিণাম কি! যদি এই বৃদ্ধ বয়সে পরশুরাম মহাস্থান-সিংহাসন হারায়, তাহা হইলে বৎস! একদিন-না-একদিন আমার বংশধরকর্তৃক এ-রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে। প্রাণ হইতেও সুবিশ্বাসী তুমি, কুমার রাজেন্দ্রকে বক্ষে লইয়া সময় থাকিতে চলিয়া যাও।

রামরাজা অঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া বলিল—মহারাজ। বিশ্বাস-ঘাতক সামন্তদিগের চক্ষু এড়াইয়া, কুমারকে লইয়া কোন্ দেশে যাইব? কিরূপে কুমারকে রক্ষা করিব? কুমারের অপরূপ রূপলাবণ্য, কেমন করিয়া গোপন রাখিব, নাথ?

যোগিনী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন—কপালিনার মুখে করাল ছায়া! প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছে। যাও, ভাই—যাও! অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ভস্মের আবরণে আপন জ্যোতি আবৃত করে। সময়ে আপনি জ্বলিয়া উঠিবে। যাও, কুমারকে লইয়া পলায়ন কর। চিল্লন সদ্যোজাত শিশুর প্রাণসংহার করিতেও কাতর নয়।

রামরাজা সরোদনে কহিল—যাই মা! এ পিশাচের রাজ্য ছাড়িয়া দেবকুমারকে বক্ষে লইয়া লোকালয় ছাড়িয়া যাই।

রামরাজা, রাজা ও যোগিনীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া কুমার রাজেন্দ্রকে বক্ষে লইয়া প্রস্থান করিল।

মহারাজ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—মা! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ক্রন্দন অতি অশুভ চিহ্ন। ক্ষত্রিয়ের বুক পাষাণ। নচেৎ কালসমরে পুত্রকে বিদায় দিয়া মাতা অনশ্রু নয়নে রহে কেন? কুরুক্ষেত্র মহাসমরে প্রাণের প্রাণ অভিমন্যুকে বিদায় দিয়া ধর্ম্মরাজের প্রাণ কত কাতর হইয়াছিল, কেহ বলিতে পারে কি? আমার শেষ বয়সের সন্তান—পরশুরামের অন্ধকার হৃদয়ের একটিমাত্র ক্ষীণ আশার আলো—যে-মুখে শত চুম্বনেও তৃপ্ত হই নাই, সেই শতচন্দ্রবিনিন্দিত পুত্র-মুখ,—হা হতভাগ্য আমি! ও হোঃ হোঃ—ক্ষত্রিয়! কি নির্ম্মম—কি কঠোর তুমি! অদৃষ্ট! কি তীব্র তোমার অভিশাপ! ঐ আবার কোলাহল আবার বুঝি সুলতান গড় আক্রমণ করিল। ঐ রণ-দামামার শব্দ! কিন্তু পশ্চাদ্দিকে কেন? স্বর্ণদ্বারে সেনাপতি—তবে কি সেদিকেও গড় আক্রান্ত হইল!

কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। পুণ্ডরীক কহিলেন—ঐ শুন দেবি! শত্রু-সেনার আনন্দোল্লাস, পশ্চাদ্দিকেও গড় আক্রান্ত। ঐ—ঐ—রক্তবর্ণ অগ্নিগোলক আকাশ-পথে উল্কারাজির মত ছুটিয়াছে।

মহারাজ পরশুরাম ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—আবার ওদিকে ও কি! তবে কি সম্মুখ দিকেও যুদ্ধ বাধিল।

মহারাজ পরশুরাম নিতান্ত অসহায় ভাবে কহিলেন—আর কেন? একেবারে চারিদিক হইতে আক্রমণ। গড় বিশ্বাসঘাতকে পরিপূর্ণ—আর পরিত্রাণ নাই। মা জগদম্বে! তোর মনে কি এই ছিল, মা! আমি চিরদিন তোর পায়ে জবা-বিল্বদল দিয়া আসিয়াছি। শেষে কি এই ফল হইল, মা! ইচ্ছাময়ি! তোর ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তোর মুখ চাহিয়া তোর পায়ে আমার সব ডালি দিলাম। পাষাণি!

তবু তোর পাষাণ প্রাণে বিন্দুমাত্র দয়া হইল না? আবার, দেবতার দোষ কি? সমস্ত দোষ আমার। আমি বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছি। আমি দেবভোগ্য সুধা পিশাচের করে অর্পণ করিয়াছিলাম—দুগ্ধদানে কালসর্প পুষিয়াছিলাম; এখন তাহার দংশন-জ্বালায় দগ্ধ হইতেছি। সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, মন্ত্রী নির্বিরোধ ব্রাহ্মণ, আর আমি বৃদ্ধ রাজা। তবে কোন্ শক্তিবলে প্রবল প্রতাপ গৌড়েশ্বরের অবমাননা করিয়া স্বাধীন একচ্ছত্র সম্রাট্ হইবার বাসনা করিয়াছিলাম! রাজ্ঞী! তুমি আজ স্বর্গে—আজ মনে পড়ে তোমার উপদেশবাণী! ঘরে, বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে চারিদিকে শত্রু! সম্মুখে কপালিনী. রাঙা রাঙা চোখ দুটি, লক্-লক্ জিহ্বা, হস্তে শাণিত কৃপাণ; মা! তোরও আজ শত্রু-বেশ। অট্ট অট্ট হাসিস্ কেন? সব গ্রাস করিবি? নে, পরশুরামের দেহ গ্রাস কর, মা! কি বলিতে কি বলি—অপরাধ নিস্‌নে মা! আমি তোর চরণে শত অপরাধী। যাতনায় হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। এখন হতভাগ্যের শেষ পূজা গ্রহণ কর। শিরায়, শিরায় যে শোণিত প্রবাহিত, ভোজবংশের সেই শোণিত-ধারায় তোর পিপাসার শান্তি করি পূজা সাঙ্গ হউক। নরসিংহের পরশুরাম নাম সার্থক হউক। মা! কে তুই মা! চিনিতে পারি না যে? চারিদিক হইতে শত্রুর সিংহনাদে আমার শ্রবণ বধির হইয়াছে।

যোগিনী মাতা কহিলেন—মহারাজ পরশুরাম! নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছ? ক্ষত্রিয়-সন্তান! শত্রুর সিংহনাদে ভীত হইয়াছ? অসি ধারণ কর—বিশ্বাসঘাতকগণের শোণিতে মায়ের প্রাঙ্গণ রঞ্জিত কর।

রাজা আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন—সত্যই বলিয়াছি জননী! হায়! আমি কি কাপুরুষ? অসি, চর্ম্ম, অঙ্গত্রাণে সজ্জিত হইয়া বসিয়া আছি কেন? দুর্গরক্ষী সৈন্যগণ! এস ভাই! মাতৃমন্দির রক্ষা করি। প্রাণ থাকিতে যেন সুলতান মায়ের মন্দির স্পর্শ করিতে না পারে।

সৈন্যগণ দেবমন্দিররক্ষার্থ সমবেত হইয়া দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল। মহারাজ পরশুরাম সশস্ত্র হইয়া মন্দিররক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইলেন।

যোগিনী কহিলেন—মহারাজ! এখন তবে আসি।

—কোথায় যাবি, মা! এই শত্রু-ব্যূহমধ্যে সন্তানকে একাকী রাখিয়া কোথায় যাবি, মা?

—যাই—আবার আসিব। যুগে যুগেই ত আসিয়াছিলাম। কেহ ত আমায় চেনে নাই—কেহ ত আমায় যত্ন করে নাই। আমি আপন মনেই আসি—আবার আপন মনেই চলিয়া যাই। আবার ফিরিয়া আসি। যে কাঁদে, আবার তাহার মুখেই হাসি ফুটাই। আসি তবে মহারাজ!

—তুইও চলিলি? যা মা, চলিয়া যা। হতভাগ্য নরসিংহের ভাগ্য বিরূপ, তোরা থাকিবি কেন, মা!

—পোড়া চোখে জল আসে কেন?—এই বলিয়া যোগিনী চক্ষু মুছিলেন।

মহারাজ কহিলেন—কেঁদেছিস্? পাষাণী! কেঁদেছিস্? আর কাঁদিতে হইবে না? যা, চলিয়া যা। নরসিংহ আর কাহাকেও চায় না। বীর্য্য—পুরুষকার! না—কেউ নাই। চর্ম্ম শিথিল, ললাট কুঞ্চিত—সব কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তবে মহাস্থানপতি—বরেন্দ্রভূমির একচ্ছত্রী অধীশ্বর মহারাজ পরশুরামের আছে কে?

যোগিনী চলিয়া গেলেন। রক্তাপ্লুত দেহ, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত শীলাদেবী নিষ্কোষিত অসিহস্তে রাজসম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—পিতা! আমি আছি—আমাকে চিনিতে পার কি?

মহারাজ পরশুরাম উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে কহিলেন—কে তুই রাক্ষসী!

রাক্ষসী নই—দানবী নই—তোমার দুহিতা। আমি বাঁচিয়া আছি। শত শত শত্রু নিধন করিয়া মহাস্থানভূমি রক্ষা করিয়াছি—রণক্লান্ত হইয়া তোমার পদধূলি লইতে আসিয়াছি। দাও পিতা! পদধূলি দাও।

বিশ্বাসঘাতক বরেন্দ্রসন্তান বীরনামে কলঙ্ক আরোপ করিয়া সুলতানের পক্ষে যোগ দিতেছে—আমি চলিলাম।—এই বলিয়া শীলাদেবী পিতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

রাজা আপন মনে কহিলেন—মা! তুমি আমার কন্যা নও—মূর্তিমতী কীর্তি। চিরদিন তুমি জাগ্রত, আজও তুমি জাগ্রত আছ। পরশুরামের গৌরব এতদিন তুমিই রক্ষা করিয়াছ—আজও কর। ও আবার কিসের শব্দ। না, আর চিন্তা করিব না। প্রাণপণে মায়ের মন্দির রক্ষা করি। যখন সমরে ক্লান্ত হইব, তখন ঐ পাপহরা অম্বুস্রোতে ঝম্প প্রদান করিয়া চির অমরত্ব লাভ করিব।

মহারাজ পরশুরাম ঈদৃশ চিন্তা করিতেছেন। বাহিরে চতুর্দিক্ হইতে রণ-কোলাহল ও হতাহতের আর্তনাদ ভিন্ন অন্য কিছুই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। রাজা উন্মত্তের ন্যায় দেবমন্দিরের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন। জনৈক সামরিক দূত রাজসম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিল। রাজা শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি দূত! সংবাদ কি?

—মহারাজ! রাজা মাধব সসৈন্যে গড়ের দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত।

—কে? মাধব? আমার বাল্যবন্ধু মাধব আসিয়াছে? দূত! তবে দক্ষিণ প্রান্তের জন্য নিশ্চিন্ত।

—সে কি মহারাজ! মাধব পাল সসৈন্যে গড়ের দক্ষিণ দিক অবরোধ করিয়াছে।

—এঁা, মাধব শত্রুভাবে—সুলতানের সাহায্যার্থ আসিয়াছে? হা বরেন্দ্রভূমি! এমনই সন্তান প্রসব করিয়াছিলে—তাহারা সকলে মিলিয়া তোমার হস্তপদ শৃঙ্খলিত করিল। জগজ্জননি! আর কিসের চেষ্টা? তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। যাও দূত! ফিরিয়া যাও। সেনাপতিকে বল, বিনাযুদ্ধে গড় সুলতানের হস্তে অর্পণ করুক।—এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—না, তাহা—

হইবে না। প্রাণপণে যুদ্ধ কর। বীরগণ! যুদ্ধে মৃত্যু—বীরের গৌরবময় বিশ্রাম। ভবানী যখন মৃত্যু অনিবার্য্য, তখন মহাস্থানের ধূলিতে পরশুরামের শেষ শয্যা পাতিয়া দাও। ভীষ্মদেবের মত কোটী শর আমার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ হউক—আমি শর-শয্যা গ্রহণ করি। কে আছ?

চারিজন সশস্ত্র সৈনিক রাজসকাশে উপস্থিত হইল এবং করজোড়ে রাজাদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মহারাজ কহিলেন—বীরগণ! আজ তোমাদের রাজার শেষ আদেশ গ্রহণ কর। আমি জীবিত থাকিতে শত্রুসেনা যেন মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারে।

রক্ষী সৈন্যগণ সকলেই সমবেত হইয়া দেবমন্দির ঘিরিয়া রহিল।

রাজা কহিলেন—হায়! আমি কি মূর্খ! বিশ্বাসঘাতকগণের হস্তে বুঝি মন্দিররক্ষার ভার অর্পণ করিলাম। কাহাকে বিশ্বাস করিব! এইমাত্র শুনিলাম, সেনাপতি মোরাদ প্রাণপণে স্বর্ণদ্বার রক্ষা করিতেছে—সে আবার বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না ত? কি জানি, মন আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চাহে না। তাম্রদ্বারের সংবাদ অনেকক্ষণ পাই নাই। তবে কি সেখানকারও দীপ নিভিয়া গিয়াছে? মা! আমি বাঁচিয়া থাকিতে তেমন সংবাদ দিসনে, মা! তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের গৌরব লইয়া যে মরিতে পারিব না। চতুর্দ্দিক অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার। পরশুরাম! তোমার ভাগ্যাকাশে আজ অমানিশা। একটি উল্কার ক্ষীণ জ্যোতিও আর দেখিতে পাইবে না।

সহসা আকাশ-পাতাল কম্পিত করিয়া, শত মেঘগর্জ্জন তুচ্ছ করিয়া বিশাল শব্দে সমগ্র গড় মহাস্থান থর-থর কম্পিত হইল।

মহারাজ পরশুরাম চীৎকার করিয়া কহিলেন—উঃ, কর্ণপটহ বিদীর্ণ হইল! এ কি ভীষণ গর্জ্জন! ওকি? প্রজ্জ্বলিত অগ্নি লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়াছে! কিসের আগুন? অস্ত্রাগারে অগ্নি!

বারুদ জ্বলিয়া উঠিয়াছে! শত শত জীব দগ্ধ হইল! উঃ, কি ভীষণ পরিণাম! যন্ত্রণাময় মৃত্যু। শত শত বরেন্দ্রসন্তান এক নিমেষে দগ্ধ হইয়া গেল। পরশুরাম! পশুর মত মৃত্যুই বুঝি তোর ভাগ্য-লিপি। অগ্নিদেবের ঐ গগনব্যাপী লোল জিহ্বা গড় মহাস্থান কেন—আজ সমগ্র বঙ্গ গ্রাস করিতে উদ্যত। প্রস্তর ইষ্টকখণ্ড অগ্নির আকার ধারণ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। উঃ, তাহা যেন গলিত সীসক হইতেও ভয়ঙ্কর! ভীষণ শব্দ করিয়া এক একটি প্রাসাদ পতিত হইতেছে। হা মহাপাপী নরসিংহ! আজ তোর পাপে কত জীব ধ্বংস হইল। এই কি যুদ্ধ না—না, অগ্নিদাহে অপমৃত্যু। আর কেন? সব ফুরাইল—সব ধ্বংস হইল! ঐ যে আগুন এদিকেও ছুটিয়া আসিতেছে? কোথায় যাই, এস্থান ছাড়িয়া পালাই—না, পালাব না—মা! তোর চরণ-ছাড়া হইব না। এইখানে, তোর চরণ-ছায়ায় শেষ শয্যা রচনা করি।

জ্ঞানহারা মহারাজ পরশুরাম সেই দেবমন্দির-প্রাঙ্গণে ধূলি-শয্যায় শয়ন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রণাঙ্গনে

হাজার-দুয়ারী সভাগৃহের সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এই প্রান্তরে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। একদিকে সসৈন্যে ইব্রাহিম ও মহম্মদ, অন্যদিকে সমস্ত হিন্দু রাজগণ সসৈন্যে সমবেত। তখন যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। হিন্দু রাজগণ যুদ্ধে শিথিলভাব অবলম্বন করায় মহাস্থান-গড়ে হিন্দুর সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইল—মহাস্থান-রাজের সমস্ত আশা-ভরসার শেষ হইয়া আসিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া ইব্রাহিম

এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছেন। সেনাপতি মহম্মদ সৈন্য পরিচালনা করিতেছে। তাহার প্রবল আক্রমণে অবশিষ্ট হিন্দু-সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতেছে।

"হর হর মহাদেও!"

জীমূত মন্দ্রে শব্দ হইল—হর হর মহাদেও। মুষ্টিমেয় হিন্দুসেনা আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। কে ঐ যুবক শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া, একাকী অকুতোভয়ে সমর-সাগরে ঝম্প প্রদান করিল? অগণ্য ইস্‌লাম-সেনা, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। যুবক একাকী অসি হস্তে কয়েকজন রক্ষী সহচর মাত্র সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইতেছে। হঠাৎ শত্রুসৈন্য কদলী বৃক্ষের মত তাহার চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। মৃত্যু তাহার চতুর্দ্দিকে করাল বদন বিস্তার করিয়াছে। যুবকের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। পরাজয়-স্থির জানিয়াও মরণ পণ করিয়াও অগ্রসর হইতেছে যেস্থানে মহম্মদ অবস্থান করিতেছে, যুবকের লক্ষ্য সেই দিকে; যুবক যেন মরিয়া হইয়া সেইস্থানে যাইতে চাহে। ফিরিয়া আইস, ভাই! সকলেই পলায়ন করিল, তুমি কেন এ অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিবার কল্পনা করিয়াছ?

বিজয় সিংহের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। রণোন্মত্ত বিজয় সহচর ভৈরবের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—ঐ যে,—ঐ সেই বীরকুলগ্লানি চিহ্লন। ভৈরব! সখা! প্রাণপণে অশ্ব ছুটাও।

—আর কিসের ভয়, মহারাজ!

—ভৈরব! গড় মহাস্থান গিয়াছে—যাক্। কলঙ্ক লইয়া ফিরিব? না ভাই! জগতে বীরকীর্ত্তি রাখিয়া রণ-ক্ষেত্রে দেহ রক্ষা করিব। মরণে অক্ষয় স্বর্গ। জয় মা ধরিত্রী! ঐ—ঐ পিশাচ, ভৈরব! দ্রুত—আরও দ্রুত অশ্ব চালাও। আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়াছে। পিশাচের রক্ত দেখিয়া আমায় শান্তিতে মরিতে দাও।

শত্রু-সেনা বিধ্বস্ত করিয়া অশ্ব আরও দ্রুত বেগে ধাবিত হইল। ইস্‌লাম-সেনা প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁহাদের এ উদ্দাম গতি রোধ করিতে পারিল না!

অকস্মাৎ আকাশ-পাতাল কম্পিত করিয়া শব্দ হইল, "হর হর মহাদেও।"

বিজয় সিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!—সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুতা, শাণিতকৃপাণকরা, জগন্মোহিনী ষোড়শী বামা হাস্য মুখে অশ্বারোহণে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। অবশিষ্ট হিন্দুসেনা বামার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া অপূর্ব্ব বূহ রচনা করিয়া বিজয় সিংহের অনুসরণ করিতেছে। বিজয় সিংহের বাহু আবার মত্তহস্তীর বল ধারণ করিল। প্রলয়ান্ধকারে ক্ষণপ্রভার মত হৃদয়ে আবার শক্তির আবির্ভাব হইল।

বিজয় সিংহের অশ্ব মহম্মদের সমীপবর্ত্তী হইল। আবার জীমূত মন্দ্রে শব্দ হইল—"হর হর মহাদেও।"

ইস্‌লাম-সৈন্যও "আল্লা হো আক্‌বর" রবে আকাশ-পাতাল কম্পিত করিল।

সরদার ইব্রাহিমের ইঙ্গিতেই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক মুসলমান-সৈন্য মহম্মদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল না। লম্ফে লম্ফে বিজয় সিংহ সসৈন্যে মহম্মদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

মহম্মদ কয়েক পদ পশ্চাৎ হটিয়া কহিল—উন্মাদ! কি সাহসে আমার সম্মুখে আসিয়াছ?

বিজয় সিংহ নীরবে অসি উত্তোলন করিলেন, এবং মহম্মদের মস্তক লক্ষ্য করিলেন। মহম্মদ সবেগে অসি চালনা করিয়া সে আঘাত ব্যর্থ করিল।

"হর হর মহাদেও—"

এক নিমেষে শীলাদেবীর অশ্ব মহম্মদের পশ্চাদ্ভাগে লম্ফ দিয়া পড়িল।

সম্মুখে বিজয়—পশ্চাতে শীলাদেবী। মহম্মদ প্রমাদ গণিল। আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে আহ্বান করিল! কিন্তু হায়! এই মরণের মুখে ইস্‌লাম সৈন্য কেহই তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল না। দুই দিকে তাহার মস্তকের উপর করাল কৃপাণ উদ্যত। মহম্মদ সবেগে বিজয় সিংহের আঘাত ব্যর্থ করিল। কিন্তু শীলাদেবীর তীক্ষ্ণ ছুরিকা তাহার পৃষ্ঠদেশে আমূল বিদ্ধ হইল।

আর কি—সব শেষ। বিশ্বাসঘাতক চিহ্লনের পাপের এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত হইল। সে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলশায়ী হইল।

"সয়তানাকো পাকড়ো—পাকড়ো।"

দীন দীন রবে ইস্‌লাম-সেনা, বিজয় সিংহ ও শীলাদেবীকে ধরিতে ছুটিয়া আসিল।

শীলাদেবী অস্নাহত বিজয় সিংহের পতনোন্মুখ দেহ আপন অশ্বে উঠাইয়া অশ্ব ছুটাইল। সুশিক্ষিত অশ্বিনী মৈনাক লম্ফে লম্ফে শত্রু-সেনা পদদলিত করিয়া ছুটিল, কেহই তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। সম্মুখে গুপ্ত বৃন্দারণ্য। শীলাদেবী পরিচিত পথে নিবিড় অন্ধকারে সেই শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইস্‌লাম-সেনা অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া পথের সন্ধান করিতে পারিল না। সকলেই ফিরিয়া গেল।

* * * *

যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। বিজয়ী ইস্‌লাম-সেনা সেই স্থানেই রাত্রি যাপন করিতে লাগিল। অশ্বত্থবৃক্ষতলে সুলতান ও যুবরাজের বাসোপযোগী বস্ত্রমণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। উভয়ে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে একজন রক্ষী সৈন্য মশাল হস্তে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে কহিল—হজরৎ!

—বন্দী দুইজনকে তেঁতুল গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছি।

—বেশ অলি ! তুই নিজে সতর্ক হইয়া পাহারা দিবি। খবরদার যেন পলায়ন না করে।

—যো হুকুম।

অলি ধীরে ধীরে তেঁতুল গাছের কাছে গেল। দেখিল, সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রাহত এক যুবক এবং এক বালিকা বৃক্ষের সহিত দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ। অলি বন্দিদ্বয়ের বন্ধন মোচন করিয়া দিল এবং অস্ত্রাহত যুবকের কানে কানে কহিল—জনাব। ক্ষিপ্রপদে এই অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করুন।

—তার পর তোমার উপায় ?

—আমার উপায় আমি স্থির করিয়াছি।

—না বলিলে আমি এখান হইতে এক পাও নড়িব না।

—আমার নাম দিলবর খাঁ। আমাকে কেহ প্রাণে মারিতে পারিবে না। আপনি সত্বর এখান হইতে প্রস্থান করুন। আমি এখানকার কার্য্য শেষ করিয়া যথাসময়ে আপনার নিকট হাজির হইব।

—কি করিবে ?

—মা যাহা আদেশ করিয়াছেন।

—মা কি আদেশ করিয়াছেন ?

—চিঙ্গলের দেহ বহন করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া যাইব।

—সে দেহে কি প্রাণ আছে ?

—জানি না, কিন্তু মায়ের আদেশ।

—উত্তম, মায়ের আদেশ পালন কর।

দিলবর কহিল—আপনি এই পথে হামাগুড়ি দিয়া প্রস্থান করুন।

বন্দিদ্বয় হামাগুড়ি দিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইল। তৎপরে সেই ভীষণ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল।

পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না—এই অস্ত্রাহত যুবক মীর্জ্জা মোরাদ আর বালিকা ভৈরবের নয়নপুত্তলী শ্যামা।

দিলবর খাঁ তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং প্রজ্বলিত মশাল হস্তে লইয়া পতিত শবরাশির মধ্যে কাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একস্থানে দেখিল, একব্যক্তি যাতনাব্যঞ্জক আর্ত্তনাদ করিতেছে। দিলবর তাহার মুখের কাছে মশাল ধরিল। মশালের আলোকে দিলবর খাঁ সে-মূর্ত্তি চিনিল। মশাল নির্ব্বাপিত করিয়া সেই মরণোন্মুখ দেহ স্কন্ধে লইয়া দিলবর খাঁ মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারে কোন্ দিকে মিশিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

গুপ্ত বৃন্দাবনে

ভীষণ অরণ্য। এই অরণ্যের প্রান্তদেশে ছোট পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড মৃত্তিকাস্তূপ। চতুর্দ্দিক বেতসী কণ্টকে আবৃত। পূর্ব্বে এই স্থানে প্রকাণ্ড দেব-মন্দির বিদ্যমান ছিল। বল্মীক এমন ভাবে সেই মন্দির ঢাকিয়া ফেলিয়াছে যে, দূর হইতে দেখিলে কেহই মন্দিরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। উপরে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ গজাইয়া উঠিয়াছে: বেতসী বনের মধ্য দিয়া উত্তর পার্শ্বে গেলে স্তূপের গাত্রে একটি নাতিপ্রশস্ত গহ্বর পরিদৃষ্ট হয়, ইহাই মন্দির দ্বার। লোক-চক্ষুর অন্তরালে এই দেব-মন্দির বিদ্যমান ; কেহই এ-মন্দিরের বিষয় অবগত নহে।

আজ বহুবর্ষ পরে এই পুরাতন দেব-মন্দিরে মনুষ্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইতেছে। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কৃত ও মার্জ্জিত। অদূরে প্রাচীর-গাত্রে রত্ন-বেদিকার উপরে রাধা-কৃষ্ণের ধাতু-প্রতিমা। কক্ষ মধ্যে মিট্ মিট্ করিয়া দীপ জ্বলিতেছে। সেই আলোকে গহ্বর আলোকিত হইয়াছে। মন্দির-দ্বারে এক মনুষ্য-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান।

দূর হইতে কে মৃদুস্বরে বলিল—আসিয়াছ ?

—হাঁ।

—বিজয় সিংহের অবস্থা বড় ভাল নয়। ভিতরে আইস।

—শীলাদেবী সুস্থ হইয়াছেন ত?

—এখন আব তাঁহার শরীরে কোনও অসুখ নাই। কিন্তু বিজয় সিংহের অবস্থা অতি শোচনীয়। সুতরাং শীলাদেবী বড়ই অধীরা হইয়া উঠিয়াছেন। চিহ্লন রক্ষা পাইয়াছে?

—হাঁ, এ-যাত্রা সে রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু আমার বোধ হয় তাহার মস্তিষ্কের কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে; ভৈরব ফিরিয়াছে কি?

—হাঁ, তুমি ভিতরে আইস।

সেই অপরিচিত মনুষ্য-মূর্ত্তি গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিল। আগন্তুক স্ত্রীলোক—সে-ও তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল

বিজয় সিংহের সেই চেতনা-হীন দেহ গৃহতলে লম্বমান। শীলাদেবী ও ভৈরব রাজার দুই পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আছে। যোগিনী মাতা ও পুণ্ডরীক সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ভৈরব ছল-ছল চক্ষে কহিল—মা! রাজদেহে আর বুঝি প্রাণ নাই!

যোগিনী মাতা বিজয় সিংহের অচেতন দেহের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—পুত্র! বিজয়ের দেহ এখনও প্রাণশূন্য হয় নাই। ঐ দেবতার পার্শ্বস্থিত কমণ্ডলু হইতে জল আনয়ন কর। বৎস! উহা সামান্য জল নহে—গুরুদেবের মন্ত্রপূত পবিত্র করতোয়া বারি।

ভৈরব কমণ্ডলু হইতে দুই বিন্দু করতোয়ার পবিত্র বারি বিজয় সিংহের মুখে ঢালিয়া দিল।

শীলাদেবী জ্ঞানশূন্যভাবে নির্ণিমেষ নয়নে হতচেতন বিজয় সিংহের মুখের পানে চাহিয়া আছেন।

যোগিনী মাতা শীলাদেবীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন—মা! শোক

বৃথা। বিধাতার অভিশাপে কালের করাল ছুরিকা রাজার দেহে বিদ্ধ। নিয়তি কে খণ্ডন করিবে, মা!

শীলাদেবী অধীর হইয়া কহিলেন—মা গো! ঘোর অন্ধকার—সব শূন্য! আমি এ কোথায় আসিলাম। মহাস্থান কোথায়? আমার পিতা কোথায়? সব কি ঐ অনন্ত আকাশে মিশিয়া গিয়াছে? এখানে কি কিছুই নাই? কেবল নরক—কেবল যন্ত্রণা? প্রতিনিয়ত মৃত্যুর বিভীষিকা? প্রিয়তম বিজয় সিংহ! সুধাময়, শান্তিময় দেশে চলিয়া যাইতেছ—তোমার অভাগিনী শীলা কি কেবল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য এই ধরাধামে বিদ্যমান থাকিবে? বিজয়! প্রাণাধিক! উঠ, মহাস্থান গড় শত্রুশূন্য কর, উঠিবে না? দাসী যে পদতলে, একবার কি ফিরিয়া চাহিবে না?

ভৈরব কহিল—মা! মা! তুই যদি অধীর হ'স—আমরা তবে কার কাছে দাঁড়াব, মা!

শীলাদেবী উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—কার কাছে দাঁড়াবে? এ সংসারে কে আছে? হায় ভৈরব! সংসারে মানুষ নাই। সংসার ঘোর অন্ধকার—প্রেতপুরী—চিহ্লনের প্রতিষ্ঠিত মহানরক। চল—চল, এ নরক হইতে দূরে চলিয়া যাই।

শীলাদেবী উন্মাদিনীর মত উঠিয়া দাঁড়াইলেন পুণ্ডরীক দেবীর হস্তধারণ করিয়া কহিলেন—এ কি কর মা! স্থির হও, শোকে অধীর হইয়ো না। এখনও আমরা শত্রুর দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হই নাই।

শীলাদেবী কহিলেন—ভয়? কিসের ভয়? কার জন্য ভয়? মৃত্যু? প্রতিনিয়ত মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছি,—কই? মৃত্যুও যে আমার ভয়ে ছুটিয়া পলায়। মরণ! এস, এস, আজ তোমায় বরণ করি। ভৈরব! তোমার সখাকে ডাক, তাঁর গলায় মালা পরাইয়া দিই।

শীলাদেবী গলদেশ হইতে রত্নহার উন্মোচন করিয়া মুমূর্ষু বিজয় সিংহের

গলদেশে পরাইয়া দিয়া উন্মাদিনীর মত হাসিয়া কহিলেন—এই ত আমাদের বিয়ে হ'ল—এর জন্য এত! বাজাও মঙ্গল-বাদ্য বাজাও। সাক্ষী তুমি নারায়ণ! এ মিলনের সাক্ষী তুমি। সখা! প্রাণাধিক! উঠ। এমনি ভাবে কি রাগ করিতে আছে? আজ যে আমাদের বিয়ে!

শীলাদেবী দেবতার পদতলস্থ শুষ্ক ফুলরাশি কুড়াইয়া লইয়া কহিলেন ফুল শুকাইয়া গিয়াছে—বাতাসে গন্ধ মিশিয়া গিয়াছে আর কিছু নাই। শুষ্ক মরুভূমির মত পোড়া প্রাণ—তাই লও—তাই লও প্রভু! ইহা দিয়াই তোমার মনোমত করিয়া সাজাই। নাথ! প্রিয়তম! আমাদের এই মিলন তুমি দেখিতে পাইলে না—এই আমার মনে বড় দুঃখ। তুমি কেমন দেবতা! দেবতা কি কখনো নিষ্ঠুর হয়? একবার কথা কও! তার পর চল, উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া ঐ পথে চলিয়া যাই। সেখানে জরা নাই—মৃত্যু নাই—দ্বেষ নাই—হিংসা নাই, আছে কেবল শান্তি। সেখানে করতোয়ার ক্ষীরধারা—মহাস্থান স্বর্গ, মহাস্থানবাসী দেবতা জান না বিজয়! মহাস্থান এই অগ্নি-পরীক্ষায় পবিত্র হইল। এস প্রাণাধিক! আমরাও দু'জন সেই স্বর্গলোকের দিকে উধাও হইয়া চলিয়া যাই।

যোগিনী মাতা শীলাদেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—স্থির হও, মা! শক্তি হারাইয়ো না। ইহাই জগতের রীতি। যিনি মহাস্থানভূমি গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহারই ইচ্ছায় ইহার ধ্বংস হইল। যাহার ইচ্ছায় হিন্দুশক্তি এতকাল সগৌরবে মহাস্থানে রাজত্ব করিয়াছে, তাঁহারই ইচ্ছায় মহাস্থানভূমিতে হিন্দুরাজত্বের অবসান হইল। বিজয় সিংহ কে? তুমি আমি কে? সকলেই উপলক্ষ্য মাত্র। সুতরাং শোক করিয়ো না।

শীলাদেবী একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন—মা! বিজয় সিংহ নাই—আমার স্বামী নাই! সমস্ত সংসার শূন্য, আমি কি লইয়া কোন্ সুখের আশায় সংসারে বাঁচিয়া থাকিব?

যোগিনী মাতা লীলাদেবীর মস্তকে হস্ত রাখিয়া কহিলেন—জ্ঞানময়ি! জ্ঞান হারাইয়ো না। ভাবিয়া দেখ, তুমি কে? বৃথা শোকে অধীর হইতেছ কেন? এ-জগতে জন্মমৃত্যু নাই—প্রাচীনে নবীনতার আবির্ভাবই জন্ম-মৃত্যু। শক্তিময়ী মা! তুমিই মহাকালী-বেশে জগৎ ধ্বংস কর—আবার জগৎ হইতে দানববৃত্তি দূর করিয়া কোটী সন্তানের হৃদয়ে দেবতার আসন প্রতিষ্ঠিত কর। হে শক্তিময়ী দেবি। আমি তোমায় নমস্কার করি।

ভৈরব যোগিনী মাতার প্রদত্ত ঔষধ বিজয় সিংহের মুখে ঢালিয়া দিল। ঔষধের আশ্চর্য্য শক্তিতে প্রায় অর্দ্ধ প্রহর অতীত হইলে বিজয় চক্ষু মেলিলেন। চক্ষু মেলিতেই সম্মুখে যোগিনী মাতাকে দেখিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন—মা!

—পুত্র!

—মা! বড় যাতনা।

—কিসের যাতনা, বাবা! মা থালুতেশ্বরীকে ডাক।

—থালুতেশ্বরী কোথায়?

—বাবা! কোটীভক্তের হৃদয়-সিংহাসনে মা আমার চিরবিরাজিতা। বাবা! হৃদয় অন্বেষণ কর, অশ্রুজলে তাঁহার চরণযুগল ধৌত কর—পাষাণীর দেখা পাইবে।

—মা! আমি চলিলাম। আমি নূতন জগতের নূতন আহ্বান শুনিতেছি। ঊর্দ্ধে নূতন মহাস্থান দেখিতে পাইতেছি।

—যাও বৎস! এমন বীরপুত্র প্রসব করিয়া তোমার জননী বসুন্ধরাও ধন্যা।

এক রুগ্ন কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ ধীরে ধীরে সেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—আর দেবি! চিহ্লনও ধন্য; তাহার দানবত্বের বিকাশ না হইলে জগতে এ দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইত না।

বিজয় সিংহ ক্ষীণ অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন—ও কার কণ্ঠস্বর!

মা বড় যাতনা !

– আমি ভাই। মহাপাপী চিল্লন আজ তোমার পদপ্রান্তে উপস্থিত।

—আর কি শাস্তি দিবে ভাই! নিরাশ্রয়া রাজকুমারী তোমাদের ভয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে ধরা-জননীর শীতল গর্ভে আশ্রয় লইয়াছে। অস্ত্রাহত বিজয় সিংহ মৃত্যুমুখে। আর ত কেহ নাই— তবে আর কাহাকে শাস্তি দিবে?

—শাস্তি দিতে আসি নাই, বিজয়! শাস্তি লইতে আসিয়াছি। উঠ ভাই। আমায় শাস্তি দাও; যত পার আমার বক্ষে অস্ত্রাঘাত কর— জননীর কুসন্তান দূর হউক।

—কেন ভাই। এমন করিলে? কেন ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এমন কলঙ্কের কালী মাখাইয়া দিলে সোনার মহাস্থানকে শ্মশানে পরিণত করিলে?

—এই শ্মশানের শ্মশান চণ্ডাল আমি- অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিয়া জগতের সমক্ষে এই কালামুখ দেখাইব। রাজকুমারি। দেবি। অনুতাপের শতবৃশ্চিক আমার বক্ষে অনবরত দংশন করিতেছে। বড় জ্বালা জগতে জুড়াইবার স্থান নাই। করজোড়ে তোমার পায়ে মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। ব্রাহ্মণ-সন্তান আমি—জগতে বেশ কীর্ত্তি রাখিয়া গেলাম।

শীলাদেবী কহিলেন -চিল্লন! আমার স্বামী মুমূর্ষু। যদি তাঁহার জীবনান্ত হয় আমি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিব। তোমার নিকট আজ একটি ভিক্ষা চাই।

চিল্লন অনুতপ্ত হৃদয়ে কহিল—দেবি! চিরদিন তোমাদের অহিতাচরণ করিয়াছি; কিন্তু আর না। বেশ বুঝিয়াছি—পাপের পরিণাম বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আমার পৃষ্ঠদেশের গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখিয়াও কি বরেন্দ্র সন্তান শিক্ষালাভ করিবে না? শত্রুর পাদপীড়ন, নির্ম্মম কশাঘাত দেখিয়াও কি তাহাদের চৈতন্য হইবে না? তাহারা কি অনুতাপের অশ্রুজলে আপনাদের কলুষ-কালিমা ধৌত করিয়া তাহাদের অবলম্বিত

পাপ-পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে না? বল দেবি! এ-সময়েও যদি তোমাদের কিছু উপকার করিতে পারি!

শীলাদেবী রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন--আর কি উপকার করিবে ভাই! সব শেষ হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর আশা-প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। এই অধঃপতিত জাতির আর কি উত্থান হইবে? তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাই, যেন মহাস্থানের শেষ আশাটুকু নির্ম্মূল করিয়ো না।

চিহ্লন কহিল—দেবি! তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, যদি কখনও রাজকুমারের দেখা পাই, মহাস্থান গড় পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিব - এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

মুমূর্ষু বিজয় সিংহ ডাকিলেন—ভৈরব!

—প্রভু!

—এস বন্ধু! এস ভাই! এত দিন হৃদয় দিয়া ভালবাসিয়াছিলে—আজ তোমার কোলে মাথা রাখিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি। আমার মৃত্যুর পর তুমি শীঘ্র শীঘ্র থাল্‌তায় ফিরিয়া যাইয়ো, ভাই!

ভৈরব বিজয় সিংহের মস্তক কোলের উপর তুলিয়া লইয়া কহিল—আর কোন্ আশায় থাল্‌তায় ফিরিব, রাজা! তুমিও গেলে! আমার যে সব আশা ফুরাইল, নাথ!

বিজয় সিংহ ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন—ফুরাইবে কেন ভাই! তুমি মায়ের সেবক—এই ধবাধামে মায়ের পূজা প্রতিষ্ঠা কর। আজ হইতে তুমি থাল্‌তাপতি। মা! আমার মুকুট সখার মস্তকে পরাইয়া দাও।

যোগিনী মাতা বিজয় সিংহের মণিরত্নখচিত উষ্ণীষ ভৈরবের মস্তকে পরাইয়া দিলেন।

ভৈরব কহিল—একি মা! এ কাঁটার মুকুট মূর্খ জেলের মাথায় কেন? রাজা! আমি চিরদিন তোমার দাস—এই আমার শ্রেষ্ঠ গৌরব। এই শোকদগ্ধ হতভাগ্যকে এ শাস্তি কেন দিলে

প্রভু! যেখানে তুমি নাই, সেখানে যে আমার সব শূন্য। তোমাকে হারাইয়া আমি কোন্ সুখের আশায় থাল্‌তায় ফিরিব, রাজা!

—না ভাই! মায়ের সেবক চাই। ভক্তিহীন বরেন্দ্র-সন্তান মায়ের পূজার মন্ত্র জানে না। আমি দস্যু—মার মহিমা কি বুঝিব! রক্তধারায় মার মন্দির অপবিত্র করিয়াছি! ভক্ত ভৈরব! হৃদয়ের অনাবিল প্রীতি-ভক্তি দিয়া অশ্রুধারায় মায়ের রাঙ্গাপা ধুইয়া দিস্। জীববলি দিস্‌নে ভাই! কলুষ-কালিমা গলি দিয়া স্বার্থ বিসর্জ্জন দিস।

ভৈরব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল—দাও রাজা! পায়ের ধূলো দাও চিরদিন তোমার আদেশ পালন করিয়াছি, আজিও তাহাই করিব। প্রাণপণে দেবীমন্দির রক্ষা করিব।

যোগিনী মাতা চিল্লনের দিকে চাহিয়া কহিলেন—দাদা!

—ভগিনি! দেবি তুমি স্বর্গের পারিজাত—দেব-চরণে তোমার স্থান। আর আমি মহানরকের কৃমিকীট। দেবি! আমি সারাজীবন অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ হইয়া আমার এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি! আমি বিদায় হইলাম! এই দেব-মন্দিরে আমার মত পিশাচের স্থান নাই!

—দাদা! চঞ্চলা কোথায়?

—আর কেন বোন লজ্জা দাও। সে পিশাচের সহচরী—সে শয়তানী! আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিব না। যেখানে যাইব, সে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে। আমি বরেন্দ্রভূমি দগ্ধ করিয়াছি, মার মন্দির চূর্ণ করিয়াছি। বরেন্দ্রভূমিতে আর আমার স্থান নাই। আমি এ দেশ ছাড়িয়া চলিলাম। গৌরি! দেবি! ভগিনী আমার! আর আমার নাম লইয়ো না; তোমাদের পবিত্র অন্তর হইতে এই দুরাত্মার স্মৃতি মুছিয়া ফেল।

চিল্লন ধীরে ধীরে সেই পবিত্র দেবমন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সেই মুহূর্ত্তে গুপ্ত-বৃন্দাবনে মহাস্থান-পতি নারায়ণের অঙ্গে বিজয় সিংহের পবিত্র আত্মা মিশিয়া গেল। লাদেবী কাঁদিয়া উঠিলেন।

যোগিনী সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন—কাঁদিয়ো না দেবি! আমার পুত্র পুত্রের গৌরব লইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে। জগতে এ-মৃত্যুর তুলনা নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

বনপথে

—শ্যামা! ভয় করিয়ো না, মা!

—ভয় আবার কিসের—আমরা যে বীরনারী।

—মা! তোমার বাবার জন্যে তুমি কি মনে কষ্ট পাইতেছ?

—বাবা ত আর বাঁচিয়া নাই, সেজন্য কষ্ট হ'লে কি হইবে, জনাব! তবে দুঃখ নাই। বাবা আমার বীরের গৌরব লইয়া মরিয়াছেন। হায়! আমি কেন মরিলাম না!

—মা! দুঃখ করিয়ো না। তোমার বাবা বাঁচিয়া আছেন। এস, আমার কোলে এস। এই বনপথে চলিতে তোমার বড়ই কষ্ট হইতেছে।

—না জনাব! আমাকে কি তোমার কোলে করিতে আছে? আমি ছোট লোক—গরীব জেলের মেয়ে!

—না, মা! তুমি বরেন্দ্র ভূমির স্বর্ণ-পারিজাত। এমন উজ্জ্বল রত্ন যদি ঘরে ঘরে ফুটিয়া উঠিত—না জানি কত শোভাই হইত। পাগলী মেয়ে! এস, আমার কোলে এস। চল, ঐ গাছের তলায় একটু বিশ্রাম করি।

মোরাদ বন্দী হইয়াছিল। মুক্তিলাভ করিয়া ভৈরব-নন্দিনী শ্যামাকে লইয়া নিবিড় অন্ধকারে গুপ্তবৃন্দাবনের গহন অরণ্য পথে চলিয়াছেন। রণশ্রান্ত দেহ, সুতরাং একটু বিশ্রাম করিবার জন্য মোরাদ শ্যামাকে লইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন।

শ্যামা কহিল—আঁধারটা একটু কাটিয়া গিয়াছে। আর একটু পরেই ভোর হইবে; সূর্য্য উঠিবে—না, জনাব?

—না মা! এ নিবিড় বন। সূর্য্যের আলো এখানে আসে না। এমনই আঁধার সারাদিন থাকে। তার পর রাত্রির গভীর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হয়। তখন কোলের মানুষ চেনা যায় না।

—এই বনে কি খরগোস পাওয়া যায়, জনাব!

—কেন মা!

—আমি খরগোসের সঙ্গে দৌড়িয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতে পারি।

—বেশ ত।

তোমার বড় কষ্ট হইতেছে। আহা! আজ তিনটি দিন কিছু খাও নাই—মুখ শুকাইয়া গিয়াছে।

—কিসের কষ্ট মা! অনাহারে অনিদ্রায় যে কষ্ট, তাহার অপেক্ষা বেশী কষ্ট আমি বন্ধু বিজয় সিংহের জন্য পাইতেছি। সমস্ত বন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। কই, কোথাও ত তাঁহার দেখা পাইলাম না। তবে কি বিজয় সিংহ এ সংসারে নাই? সুলতান! যদি বিজয় সিংহকে বন্দী করিয়া থাক, তাহা হইলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দাও। শতরক্ষি-বেষ্টিত হইলেও আমি তাহার উদ্ধার সাধন করিব। যদি তাঁহাকে হত্যা করিয়া থাক শতরক্ষিপরিবেষ্টিত হইলেও আমি তোমার প্রাণ সংহার করিব। কোথায়—কোথায় আছ তুমি, সখা! অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহ লইয়া তোমার অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। দেখা দাও—দেখা দাও, ভাই!

মোরাদের দুই চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। শ্যামা আপন অঞ্চলে সযত্নে মোরাদের অশ্রুধারা মুছাইয়া দিয়া কহিল—কাঁদিয়ো না জনাব, কাঁদিয়ো না! এ কি তোমার উরুদেশে আমূল-বিদ্ধ ছুরিকা! আহা রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে! এতক্ষণ দেখি নাই!

মোরাদ হাসিয়া কহিলেন—কি দেখিতেছ, মা! একটা কাঁটা ফুটিয়াছে মাত্র।

শ্যামা চমৎকৃত হইয়া কহিল—এই অসহ্য যাতনা লইয়া আমায় বুকে করিয়া পথ চলিতে, জনাব!

মোরাদ কহিলেন বীরের এ যাতনা, অতি লঘু যাতনা, মা!

শ্যামা ব্যথিতকণ্ঠে কহিল—এস জনাব! আমি তোমার কাঁটা তুলিয়া দিই।

মোরাদ হাসিয়া কহিলেন—এ-কাটা সামান্য কাঁটা, মা! আমার প্রাণের কাঁটা তুলিতে পার কি? হা বিজয়! হা নিষ্ঠুর! দেখা দিবে না? এস মা, অদূরে ঐ বেতসী বনের মধ্যে স্বল্পপরিসর পথে মনুষ্য-পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে—ঐ পথে যাই।

উভয়ে উঠিয়া দাড়াইবামাত্র ঐ স্বল্পপরিসর পথে এক মনুষ্য-মূর্ত্তি ধীরে ধীরে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বালিকা শ্যামা হর্ষোৎফুল্ল আননে কহিল—ঐ দেখ জনাব! বাবা আসিতেছে।

মোরাদ কহিলেন—মেহেরবান খোদা! তোমার অপার করুণা! এস ভাই! এই লও তোমার হারানিধি। সারাদিন বুকে করিয়া লইয়া আছি। ইহার জন্য আমি মরিতে পারি নাই। নিষ্ঠুর বিজয় এই মাতৃহারা বালিকাটি আমার হাতে সঁপিয়া দিয়া আমায় মরিতে দেয় নাই!

ভৈরব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল—সেনাপতি! আপনি জীবিত! আমার অভাগিনী কন্যাকেও বাঁচাইয়াছেন! বিধাতার দয়ায় সকলকেই ফিরিয়া পাইলাম। কিন্তু হায়!

মোরাদ ব্যগ্রস্বরে কহিলেন—কিন্তু কি ভৈরব! বিজয় সিংহ কোথায়? আমার সখা কোথায় আছে বল?

ভৈরব কাঁদিয়া উঠিল। কহিল—নাই, বীর! নাই! এ মরজগতে আর তোমার সখাকে খুঁজিয়া পাইবে না—চিহ্ললনের প্রতিষ্ঠিত এই শ্মশান-

ভূমিতে আর তাঁহার দেখা পাইবে না। সব জ্বালা সব যাতনা এড়াইয়া বিজয় সিংহ এখন শান্তিধামে।

মোরাদ কহিলেন—কি বলিলে, সখা নাই? বিজয় সিংহ নাই? সব ফুরাইয়াছে? হা হতভাগ্য মোরাদ! তুমি এখনো কেন বাঁচিয়া আছ? সমস্ত দিন অনাহারে, অনিদ্রায় কাহার অন্বেষণ করিতেছ? বিজয়! কোন্ অচেনা দেশে তুমি লুকাইলে ভাই? না, তুমি থাকিতে পারিবে না। বরেন্দ্রভূমির স্বর্ণ-পারিজাত অকালে যদি শুকাইয়া যায়, তবে এই দীন ভিখারী মুসলমানকে ভাই বলিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইলে কেন? আত্মহারা পাগল ভিখারীকে সে ভাগ্যের উচ্চ শিখরে তুলিয়া দিলে কেন? খোদা! খোদা! বিজয় সিংহকে ফিরিয়া দাও। প্রাণ চাও—অকাতরে দিতেছি। এ অকিঞ্চিৎকর প্রাণের বিনিময়ে বিজয় সিংহের অমূল্য জীবন ফিরিয়া দাও। বন্ধু ভৈরব! মহাস্থান-রাজলক্ষ্মী লীলাদেবী কোথায়

ভৈরব কহিল—বীর! মহাস্থান-রাজলক্ষ্মীর অঙ্কে গুপ্ত দেবমন্দিরে হিন্দুর সৌভাগ্য-রবি চির অস্তমিত।

মোরাদ অবসন্ন প্রাণে কহিলেন—কোন্ কুসুমাস্তৃত পথে তুমি চলিয়া গেলে, সখা! এ-পৃথিবীতে সে-পথের সন্ধান কি কেহ জানে না? শোকে প্রাণ দগ্ধ হয়—চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়। যে যায়, সে আর ফিরিয়া আইসে না কেন?

ভৈরব কহিল—এখন আসি, জনাব!

মোরাদ কহিলেন—হাঁ, এস ভাই! তোমার গচ্ছিত রত্ন তোমার করে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আজ আমি মুক্ত।

ভৈরব শ্যামাকে বুকে লইয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

শোক-দগ্ধ মোরাদ আবার সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। আপন মনে বলিতে লাগিলেন—সব ফুরাইল—এ জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা সব শেষ হইল!

বেতসী বনের অন্তরাল হইতে ধীরে ধীরে এক দেবী-মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মোরাদ সবিস্ময়ে কহিলেন—মা! আসিয়াছ? বিজয় সিংহ কোথায়, মা?

—পুত্র! শ্মশানে, বনে, ভবনে কোথাও আর তাঁহার দেখা পাইবে না। শোক-সন্তপ্ত যুবক! ধৈর্য্য অবলম্বন কর। মহাপ্রাণ! পরহিত যার জীবনের ব্রত, জগতে তার অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্র।

—মা! প্রাণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই ভগ্নপ্রাণে, দারুণ হতাশায় দগ্ধচিত্ত আমি কোথায় দাঁড়াইব, মা?

—উঠ বাপ! শোকের সময় নাই। ঐ শোন কোলাহল; তোমার ভগিনীর—তোমার বন্ধু-পত্নীর মর্য্যাদা রক্ষা কর।

—শীলাদেবী কোথায়?

—করতোয়া-তটে তোমার বন্ধুর শব-দেহ বক্ষে লইয়া শীলাদেবী শ্মশান-ক্ষেত্রে রোদন করিতেছে! বাপ! সুলতান অগণ্য সৈন্য লইয়া মহাস্থান-রাজ-লক্ষ্মী তোমার বন্ধু-পত্নীকে ধরিতে আসিতেছে।

—মা! আমি একা—তাহারা অসংখ্য। হউক অসংখ্য—তথাপি আমি এই শুভ মুহূর্ত্তে ভগিনীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অনন্তধামে চলিয়া যাই। নিশ্চিন্ত হও মা! মোরাদ জীবিত থাকিতে কাহার সাধ্য সতীর কেশাগ্র স্পর্শ করে!

মোরাদ এক লম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উন্মুক্ত কৃপাণ করে লইয়া কহিলেন—মা! তুই থাকিতে—তোর পুত্র থাকিতে আমার ভগিনীর মর্য্যাদা নষ্ট হইবে কেন? পথ দেখাইয়া দাও, মা!

যোগিনী মাতা ও মীর্জ্জা মোরাদ দ্রুত পদে সেই বনভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরিসমাপ্তি

শীতের প্রভাত। চতুর্দ্দিক্ কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। নিবিড় অরণ্যের প্রান্তদেশে করতোয়া-তটে চিতানল প্রজ্জলিত। সেই প্রজ্জলিত চিতাকুণ্ডের এক পার্শ্বে যোগিনী শীলাদেবীর হস্তধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। অগণিত ইস্লাম-সেনা লইয়া সুলতান তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছেন। উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে মীর্জ্জা মোরাদ সুলতানের সম্মুখীন হইয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন - সরিয়া যাও, সুলতান! সরিয়া যাও।

—কে তুমি?

—আমি—আমি মুসলমান।

· তুমি মুসলমান?

—হাঁ আমি মুসলমান। ধর্ম্মোন্মত্ত সুলতান! আমার এ হিন্দু-প্রীতির অর্থ কি বুঝিবে? যদি হৃদয় দিতে—হৃদয় দিয়া ভালবাসিতে, তাহা হইলে বুঝিতে—শোকদগ্ধ-চিত্তে কেন আমি হিন্দু-ভ্রাতার পবিত্র শব-দেহের পার্শ্বে দাড়াইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছি—ভগিনীর মর্য্যাদা রক্ষার্থে তোমার অস্ত্রমুখে বুক পাতিয়া দিতেছি। আবার বলি সুলতান! তুমি বরেন্দ্র-ভূমিতে ইস্লাম-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা। এই রক্ত-স্রোতের উপর পবিত্র মহাস্থান-ভূমিতে উভয় ভ্রাতার মিলনের পথ প্রশস্ত-কর। যেন কোনও মহামিলনের যুগে এই পুণ্যভূমি মহাস্থান পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়।

মোরাদের বাক্যে সুলতান লজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে সসৈন্যে করতোয়ার তটভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

যোগিনী শীলাদেবীর হস্তধারণ করিয়া কহিলেন—এই সেই মহাযোগ। আজ করতোয়া ভাগীরথী হইতেও পুণ্যদায়িনী। পাপময়—জ্বালাময় সংসার এড়াইয়া শান্তিধামে গমন করিবার ইহাই মুক্তিপথ। মহাস্থানে অনন্ত পুণ্য—এখানে নর দেবত্ব প্রাপ্ত হয়।

শীলাদেবী আর কিছু বলিলেন না। যোগিনীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া নীরবে করতোয়ার অগাধ বারিরাশি মধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। *

মোরাদ দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখিলেন। অশ্রু ছল-ছল নেত্রে কহিলেন—যাও দেবি! শান্তিধামে যাও। তোমার এ আত্মত্যাগ বৃথা হইবে না। ভগিনি! শত যুগ পরেও বরেন্দ্র-সন্তান, এই পবিত্র করতোয়ার তটভূমিতে দাঁড়াইয়া, তোমার পবিত্র নাম-স্মৃতি স্মরণ করিয়া এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জন করিবে।

সমাপ্ত

* এই স্থান অদ্যাপি "শীলাদেবীর ঘাট" নামে প্রসিদ্ধ।